জনজাতির জীবন কাব্য

গোপালকৃষ্ণ রায়



প্রিটোনিয়া
পাবলিশার্স অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটরস্
১৪, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

৷ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯

● প্রকাশক
পিনাকী দত্ত
প্রিটোনিয়া পাবলিশার্স অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটরস্
১৪, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

● মুদ্রণ
ন্যাশানাল আর্ট প্রেসেস্
৭৭ আচার্য জগদীশচন্দ্রবসু রোড
কলকাতা - ৭০০০১৪

লেখকের নিবেদন

প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বলা হত মহাকান্তার। রামায়ণ ও মহাভারতে সেই মহাকান্তারকেই বলা হয়েছে ধর্মারণ্য। ধর্মারণ্যের পর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও কামরূপ পুরাণের পাতায় সমুজ্জ্বল।

মহাকান্তার ও ধর্মারণ্য শব্দ দু'টি অনেককাল আগেই অপ্রচলিত হ'য়ে গেলেও, উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে তাদের ছায়া এখনও মিলিয়ে যায়নি। এখনও পাহাড়, অরণ্য, নদ-নদী ও গিরিবর্ত্মের মধ্যে মহাকান্তার ও ধর্মারণ্য স্ব-মহিমায় বিরাজমান।

সেই যুগের মানুষ নেই সত্য, কিন্তু উত্তরাধিকার ও সংস্কৃতির পরম্পরা এখনও আছে। নাগরিক সভ্যতার অনুপ্রবেশেও সেই ঐতিহ্য পুরোপুরি পিষ্ট হয়নি।

বেশ কয়েক বছর আমার সাংবাদিক কর্মজীবন এই অঞ্চলে কেটেছে। কাজে ও কাজের বাইরে আমি এই অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সেই মহাকান্তারের মহানুভবতা ও ধর্মারণ্যের বৈভবের সন্ধান করার চেষ্টা করেছি। সেই সন্ধান যে সব সময় সার্থক হয়েছে, এ দাবি করার মত সৎ-সাহস আমার নেই। কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া, নাগরিক সভ্যতা ও প্রযুক্তি বিস্ফোরণের পাশাপাশি ধর্মারণ্যের বিনম্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির তুলনাহীন সহাবস্থানে বিস্ময়বোধ করেছি। প্রমত্ত প্রযুক্তি সেই উত্তরাধিকারকে উচ্ছিষ্ট করতে পারেনি। মহাকান্তার-ধর্মারণ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে আদৌ ক্ষীণ ও ক্ষণভঙ্গুর নয়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতির সন্তানেরা তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহাকান্তারের সারল্য, ধর্মারণ্যের সংস্কৃতি, পুরাণে বর্ণিত কামরূপের কর্তব্যপরায়ণতা ও ঐতিহাসিক ব্রহ্মপুত্র সভ্যতার প্রজ্ঞা এখনও উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতি মানুষকে উজ্জীবিত রেখেছে।

সেই উনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই এই অঞ্চলের আদি বা অবর ও উপজাতিদের নিয়ে মানব বিজ্ঞানীরা অনেক কাজ করেছেন। তাঁরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁরা যেমন আদি ও উপজাতিদের উৎস সন্ধান করেছেন, তেমনি তাদের ব্যবহারিক জীবনের বিবর্তনের কথাও শুনিয়েছেন। গুহা থেকে ঘরে উত্তরণের কথাও তাঁদের মূল্যবান সমীক্ষায় বিধৃত হয়ে আছে।

মানব বিজ্ঞানীদের সেই মূল্যবান দলিলগুলি উচ্চচেতনা সম্পন্ন বিদ্বজ্জনের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু আমজনতার ক্ষুৎ পিপাসা নিবৃত্তি করতে পেরেছে বলে মনে করার কোন হেতু নেই। আদি ও উপজাতিদের উজ্জ্বল অনুজ্জ্বল জীবন-চর্চার প্রতি আলোকপাত

করে তাঁরা নিঃসন্দেহে পথ-প্রদর্শক হয়ে আছেন। তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ সেই সব সমীক্ষা অবিশেষজ্ঞ সাধারণ মানুষের সঙ্গে উপজাতিদের প্রকৃতি-নির্ভর জীবন ও জীবিকার সেতুবন্ধন করতে পারেনি বলেই অনেকেই মনে করেন।

সাংবাদিকতার সূত্র ধরেই উপজাতিদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ঘটেছিল। মেলামেশার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল এক অবিমিশ্র বন্ধুত্ব। বড় কাছ থেকে তাদের জীবন-যাত্রা দেখার সুযোগ এসেছিল। মেঘালয়ে খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারোদের ঘরে যেমন অবাধ প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম, তেমনি অরণাচলের ওয়ান্‌চো, নক্‌টে, সিংফো, আকা, নিশি ও গ্যালংদের মসুপের সামুদায়িক শয্যায় অংশ নিয়েছিলাম। মণিপুরে দেখেছি মিতৈদের জীবন-যাপন, পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি মিজোদের নুলারিমের সঙ্গে। দেখেছি ত্রিপুরার আদিম (?) রিয়াং, হালম, জামাতিয়া ও কাইপেঙ্‌দের। পাশে বসে উপলব্ধি করেছি অসমের দিমাসাদের জীবন-যাত্রা। দেখার চেয়ে অদেখাই থেকে গেছে বেশি, জানার চেয়ে অজানাই রয়ে গেছে অনেক কিছু।

এদের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে, কোনও এক অদৃশ্য শক্তির প্ররোচনায় মুষ্টিমেয় কিছু উপজাতি মানুষ বর্তমানে যে আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে সেই আপাত সত্যটি-ই আমার কাছে বড় হয়ে থাকত।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে আমি যা বুঝেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, স্বার্থান্বেষী কিছু রাজনীতিক নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য উগ্রপন্থাকে মদত দিয়ে চলেছে। সময় হলেই উগ্রবাদীরা তাদের সৃষ্টি কর্তাদের মুখোশ খুলে দেবে। সম্ভবত সেই ভয়ঙ্কর দিন বেশি দূরে নয়। কারণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহাকান্তারের সারল্য, ধর্মারণ্যের সংস্কৃতি, পুরাণে বর্ণিত কামরূপের কর্তব্যপরায়নতা ও ইতিহাসের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রাজ্ঞতা এখনও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি মানুষকে উজ্জীবিত রেখেছে।

রাজনৈতিক কারণে আসামকে ভাগ করা হয়েছে সত্য কিন্তু ধর্মারণ্যের সংস্কৃতিকে সম্ভবত বিভক্ত করা যায়নি।

অরুণাচলের তাঙ্গামদের সঙ্গে আসামের দিমাসাদের পরিচয় না থাকলেও—উভয়েই ধর্মারণ্যের সংস্কৃতিতে আজও আস্থাবান। তিরাপের ওয়ান্‌চোদের সঙ্গে ত্রিপুরার রিয়াংদের ব্যবহারিক জীবনে সম্পর্ক না থাকলেও, জীবন-যাপনের ধরণ-ধারনের সাদৃশ্য একটু চেষ্টা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। দরকার শুধু সাদৃশ্য খোঁজার মানসিকতা।

একই রাজ্যে বসবাস করলেও খাসি-জয়ন্তিয়া ও গারোদের ভাষার মধ্যে মিল নেই। কিন্তু সামাজিক রীতি-নীতি ও জৈবিক প্রাত্যহিকতায় ঐক্যের ব্যত্যয় ঘটেনি।

প্রায় ষাটটি মূল উপজাতি শতাধিক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাস করছে। তাদের কোনও কোনও সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। সমাজ ও সংসারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, অত্যন্ত কাছ থেকে তাদের আচার, আচরণ ও জৈবিক জীবন-যাপনের পরিচয় পেয়েছি।

নাগরিক সভ্যতা নারী নির্যাতনে অপকৃষ্ট। কিন্তু উপজাতিদের জীবনে তার একটি বিপরীত ছবি আমি দেখেছি। তাঁদের সেই আরণ্যক সমাজে নারী সম্পদ ও সম্পত্তি। প্রকৃতির আভরণে সজ্জিতা উপজাতি নারীর সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ ও দায়-দায়িত্বের যে ছবি আমি দেখেছি, তারই একটি রূপরেখাকে দুই মলাটের মধ্যে আঁকার চেষ্টা করেছি মাত্র। আদি ও উপজাতিদের সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ও তাদের সরল-সাবলীল জীবনচর্চা সহজ ভাষায় সাধারণ্যে পৌঁছে দেবার যে প্রয়াস পেয়েছিলাম চেনা মানুষ অচেনা জীবন তারই রূপরেখা। সবিনয়ে বলতে চাই, রচনাগুলি আদৌ নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা নয়। প্রকৃতি নির্ভর আদি ও উপজাতিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় যা পেয়েছি গল্পাকারে তা-ই পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি মাত্র। তত্ত্ব ও তথ্যের চেয়ে জীবন চর্চা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপের প্রয়াস পেয়েছি। বিশ্লেষণ ও পরিবেশনে কিছু ভুল ত্রুটি থেকে গেছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতিতত্ত্ববিদদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে উপজাতি মানুষের সাহচর্য লাভ আমার পক্ষে সম্ভব হত না। অরুণাচল গবেষণা বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা মানব-বিজ্ঞানী ডঃ পি সি দত্ত আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। অন্যান্য রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ বিভাগের কাছ থেকেও অনুরূপ সাহায্য পেয়েছি।

অধুনালুপ্ত পাক্ষিক বসুমতীর সহকারি সম্পাদক মুকুল গুহ অত্যন্ত যত্ন নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলি লেখা ছাপিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। গুয়াহাটির বাংলা দৈনিক সময় প্রবাহ ও কলকাতার যুগান্তর-এ কয়েকটি লেখা ছাপা হয়েছিল। এদের কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

লেখক বন্ধু ভারতীয় জাদুঘর এবং জাতীয় গন্থাগারের অধিকর্তা ড. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী উৎসাহ না পেলে এই নিবন্ধগুলি হয়ত আদৌ লেখা হতো না। তার আগ্রহের প্রতি সম্মান জানানোর ভাষা আমার জানা নেই তাঁর কাছে ঋণ অপরিশোধনীয়। প্রিটোনিয়া প্রকাশনার কর্নধার পিনাকী দত্ত জনজাতির জীবন কাব্য সংকলনটি প্রকাশ করে আমাকে বাধিত করেছেন। ওনাকে ধন্যবাদ জানার ভাষা নেই।

গোপালকৃষ্ণ রায়

সূচিপত্র

১

নক্‌টে

অরণ্য ঘেরা পাহাড়ী পথ চলতে চলতে নামচুমের কাছে শেখা একটি নিশি প্রবাদ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। প্রায় ঘন্টা দুই বর্মা সীমান্ত ঘেরা পাটকেই রেঞ্জের চড়াই-উতরাই পথে চলেছি। নামচুম আমায় নিয়ে যাচ্ছেন নক্‌টে গ্রাম বড়দুরিয়া।

ইন্দ্রজিৎ নামচুম। অরুণাচলের নামডাফা জীবমণ্ডলের অফিসার। বনে বনে ঘুরে বেড়ালেও আদি ও উপজাতিদের জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। তক্‌মাধারী মানব-বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন 'বেয়ার ফুট অ্যানথ্রোপলোজিস্ট'। অরুণাচলের আদিদের জীবন ও জৈবিক চর্চাই শুধু নয়—নামচুম প্রতিবেশী উপজাতি সম্প্রদায়ের কিংবদন্তি ও গল্প গাথার অনেক সন্ধান রাখেন।

নিজে খাম্পতি সম্প্রদায়ের মানুষ। অরুণাচলের খাম্পতিরাই একমাত্র উপজাতি-যাদের নিজস্ব লিপি আছে। ঐ সম্প্রদায়ের কোনও কোনও পণ্ডিত শুধু খাম্পতিদের জীবনচর্চা লিখে রাখেননি—রামায়ণ-মহাভারত ও অনেক পৌরাণিক কাহিনীও লিখে রেখেছেন। সেইসব পাণ্ডুলিপির পাতায় খাম্পতিদের জীবন ও জৈবিকরহস্যও ছড়িয়ে রয়েছে। খাম্পতিবিদ কেউ কেউ তা উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন।

চলমান উপজাতি-সাইক্লোপেডিয়া নামচুম। তার সঙ্গে কেবাং-এ বসে বিচার দেখেছি, মোরাং-এ রাত কাটিয়েছি। লোভ সম্বরণ করতে না পেরে, তাঁর পিছু পিছু রাশেং-এ গিয়েছি। এই রাশেং বা কুমারী-নিলয়ের গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনেছি। জীবন-রহস্য উন্মোচনের রোমাঞ্চকর কাহিনীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।

নামচুমের কাছে শেখা নিশিদের সেই প্রবাদ বার বার মনে আসছে। নামচুম বলেছিলেন, নিশিরা কখনও বলে না— পথ হারিয়েছি। তারা বলে, 'না লাম প্যায়া কা-পা-কু-মা' অর্থাৎ আমরা পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

পাহাড়ী পথের চড়াই-উতরাই শেষ হতে চায় না। পাটকেই পর্বতের চূড়ায় সূর্যের অস্তমান রশ্মি নেমে এসেছে। নিবিড় সবুজ অরণ্যের ছায়া ঘন হচ্ছে। নামচুমকে বলি, 'না লাম প্যায়া কা-পা-কু-মা'।

নামচুম হেসে ওঠেন। নিবিড় অরণ্যের নির্জন পাহাড়ী পথে সে হাসির রেশ মিলিয়ে যেতে অনেকক্ষণ সময় লাগে।

আমরা কি পথ খুঁজে পাচ্ছি না?

পথ পথেই আছে। আমরা ঠিক পথেই চলেছি। অন্ধকার নেমে আসার আগেই বড়দুড়িয়ায় পৌঁছে যাব।

নামচুমের সঙ্গে যাচ্ছি নক্‌টে রাজ্যে। দুর্ধর্ষ কনিয়াকদের ভ্রাতৃপ্রতিম উপজাতি নক্‌টে ওয়ান্‌চোদের প্রতিবেশী, অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলার অধিবাসী। নক্‌টেদের সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত। কোনও এক কালে তারা নাকি মস্তক শিকারী ছিল। এখনও নাকি তাদের লোওয়াং এর (রাজা) গৃহ অনেক মানুষের মাথার খুলি দিয়ে সজ্জিত। নামচুম বলেন, আমরা কোথায় গিয়ে থাকব, জানেন? জবাবের প্রতীক্ষা না করে বলেন, পোহ্-তে। পোহ্- শব্দটির সঙ্গে তো আপনার পরিচয় থাকবার কথা। আদিরা যাকে বলে মসুপ বা মোরাং — নক্‌টেরা তাকেই বলে পোহ্ অর্থাৎ ব্যাচিলর ডর্মিটরি।

ওয়ান্‌চোরাও এই তিরাপ জেলার বাসিন্দা। পাটকেই রেঞ্জেই ওয়ান্‌চো রাজ্য। নক্‌টেদের মত তাদেরও রাজা আছে। সেই রাজার ঘরে থরে থরে সাজানো আছে মানুষের মাথার খুলি—শত্রু নিধনের স্মারক। মস্তক শিকার বহু যুগ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্বপুরুষদের সাহসিকতার স্মারক হিসাবে রাজার গৃহে আর মোরাং-এ তারা মানুষের মাথার খুলি সাজিয়ে রেখেছে। নক্‌টদের মত ওয়ান্‌চোরাও মঙ্গোলয়েড। নামচুম বলেন, আদিদের মত নক্‌টেদেরও রাশেং বা কুমারী-নিলয় আছে। অবশ্য তারা রাশেং বলে না। বলে, ইয়ান-পোহ্।

—ইয়ান-পোহ্। ইয়ান-পোহ্!

নামচুম বলেন, মুখস্থ করছেন?

শেষ চড়াই পাড় হয়ে আমরা পৌঁছে যাই বড়দুরিয়া। সেখানকার পোহ্-তে। আমরা বড়দুরিয়া গ্রামের লোওয়াং-এর অতিথি।

পাটকেই পর্বত এক সময় অন্ধকারে ডুবে যায়। নিঃশব্দ অন্ধকার বড়দুরিয়াকে ঢেকে দেয়। মানুষের খুলি দিয়ে সাজানো পোহ্-তে কেমন যেন ভৌতিক পরিবেশ। পোহ্-এর-গেটের দু'দিকে দু'টি মশাল। তার কম্পিত আলোয় মাথার খুলি গুলোকে বীভৎস মনে হয়। তবে ভয় পাই না। ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হবার আগেই নামচুম বলে ওঠেন, নক্‌টেদের শুধু ইয়ান-পোহ্ নয়, ইয়ান জো-ইম্‌থেনও আছে।

—ইয়ান জো-ইম্‌থেন?

এই প্রথম নামচুমের মুখে শব্দটি শুনলাম। ডিহিং আর সুবনসিড়ির অনেক আদিদের গ্রামে নামচুম আমায় নিয়ে গেছেন—কিন্তু ইয়ান জো-ইমথেন্ শব্দটি তার মুখে শুনিনি।

নামচুম বলেন, শব্দটি আপনার অপরিচিত। আমার সঙ্গেও পরিচয় ছিল না। নামডাফা আসার পর জানতে পেরেছি।

মসুপ বা মোরাং-এর সঙ্গে পোহ্-র আকৃতি ও প্রকৃতিগত কোনও তফাৎ নেই। গ্রামের অবিবাহিত যুবকেরা একসঙ্গে রাত কাটায়। তাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বয়স্করা পোহ্-তে বসে জনগোষ্ঠীর পৌরাণিক কাহিনী শোনায়। পূর্বপুরুষদের শৌর্য্য বীর্য্যের গল্পের মধ্য দিয়ে যুবকদের অতীতের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ইয়ান জো-ইমথেন শব্দটিকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু নামচুম সে পথে হাঁটেন না। তিনি তাঁর স্বভাব অনুযায়ী পোহ্-র গল্প বলতে থাকেন। নক্‌টেদের পোহ্-সুসজ্জিত। প্রতিটি পোহ্ই মানুষের মাথার খুলি দিয়ে সাজানো। ওয়ান্‌চোর মত পোহ্-র মধ্যে একটি ড্রাম, নক্‌টেরা বলে 'থুম'। থুমের গায়ে আঁকা থাকে মানুষ, বাঘ ও অন্যান্য জীবজন্তুর প্রতিমূর্তি।

প্রতিটি পোহ্-তে থুম রাখা আবশ্যিক। শত্রুর আক্রমণের ইঙ্গিত এই থুমের মাধ্যমেই গ্রামবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হয়। গ্রাম সভার সংকেতও এই থুম থেকে দেওয়া হয়। ব্যাচিলর ডর্মিটরি হলেও—গ্রাম সভার বৈঠক পোহ্-তেই অনুষ্ঠিত হয়।

নক্‌টেদের বাড়ি আর পোহ্-র আকৃতির মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। দেখতে একই রকম। ভিতরে বাঁশের মাচা। সেই মাচায় গ্রামের অবিবাহিত যুবকেরা রাত অতিবাহিত করে।

ছেলে-মেয়ে বড় হলেই তাদের পোহ্ ও ইয়ান-পোহ্-তে যাওয়া বাধ্যতামূলক। গ্রামকে ভালবাস, প্রতিবেশীর সাহায্যে এগিয়ে যাও আর নিষ্ঠা নিয়ে কাজ কর—পোহ্-তে নক্‌টে যুবকেরা এই আদর্শে দীক্ষিত হয়। এখান থেকে তারা সমাজের একজন সৈনিক হিসাবে গড়ে ওঠে।

হঠাৎ নামচুম বলে ওঠেন, আপনাদের সমাজে দেবসেবার জন্য দেবোত্তর প্রথা প্রচলিত।

—হ্যাঁ। দেবসেবার জন্য কিছু সম্পত্তি-নির্ধারিত থাকে। নামচুম বলেন, নক্‌টেরা পোহ্-কে মন্দিরের মতই পবিত্র মনে করে। পোহ্-র খরচ-খরচা চালাবার জন্য গ্রামবাসীরা সকলে মিলে কিছু স্থাবর সম্পত্তি পোহ্-র জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে। এখানেই নক্‌টের পোহ্-র সঙ্গে অরুণাচলের আদিদের মসুপও মোরাং-এর প্রকৃতিগত কিছু তফাৎ রয়েছে। অন্যান্য আদিদের দৈনন্দিন খরচ গ্রামের লোকেরা বহন করে। কিন্তু কোনও স্থাবর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করে রাখে না। সেই জন্য, দিন কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু আদিদের মসুপ ও মোরাং ব্যবস্থা অচল না হলেও খুব একটা সচল থাকছে না। নক্‌টেদের

পোহ্ অন্তত সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত। যার ফলে একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে পোহ্-প্রথা চলে আসছে।

নক্‌টেদের পোহ্- একটি বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করে। যাকে বলা হয়—'ডিপ্লোম্যাটিক প্রিভিলেজ'।

সে আবার কী? নক্‌টেরা কি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিনিধি? 'ডিপ্লোম্যাটিক ইউমিনিটি' তো একমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

নামচুম দন্তবিকশিত বিকট দর্শন খুলিগুলির দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে আমার মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলেন, নক্‌টেরা পোহ্-কে পবিত্র বলে মনে করে। ঠিক মন্দির, মসজিদ ও গির্জ্জার মত। যখন-তখন ইচ্ছা করলেই সেখানে ঢোকা যায় না।

কোনও ব্যক্তি জঘন্যতম সামাজিক অপরাধ ক'রে, এমন কি খুন করে যদি পোহ্-তে আশ্রয় নেয়, তাহলে পোহ্-র চৌকিদার বা কার্যকরী সমিতির অনুমতি ছাড়া পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। অনুমতি ব্যতীত সেখানে তল্লাসী চালানোও যায় না। তবে ভাবনার কোনও কারণ নেই, নক্‌টেরা যখন-তখন অপরাধ করে না, গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য পোহ্-তে আশ্রয়ও নেয় না। নক্‌টেরা আদৌ অপরাধপ্রবণ জাত নয়। কোনও একযুগে 'মস্তক শিকারী' হিসাবে আখ্যায়িত হলেও—প্রায় শত বৎসর পূর্বে তারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছে।

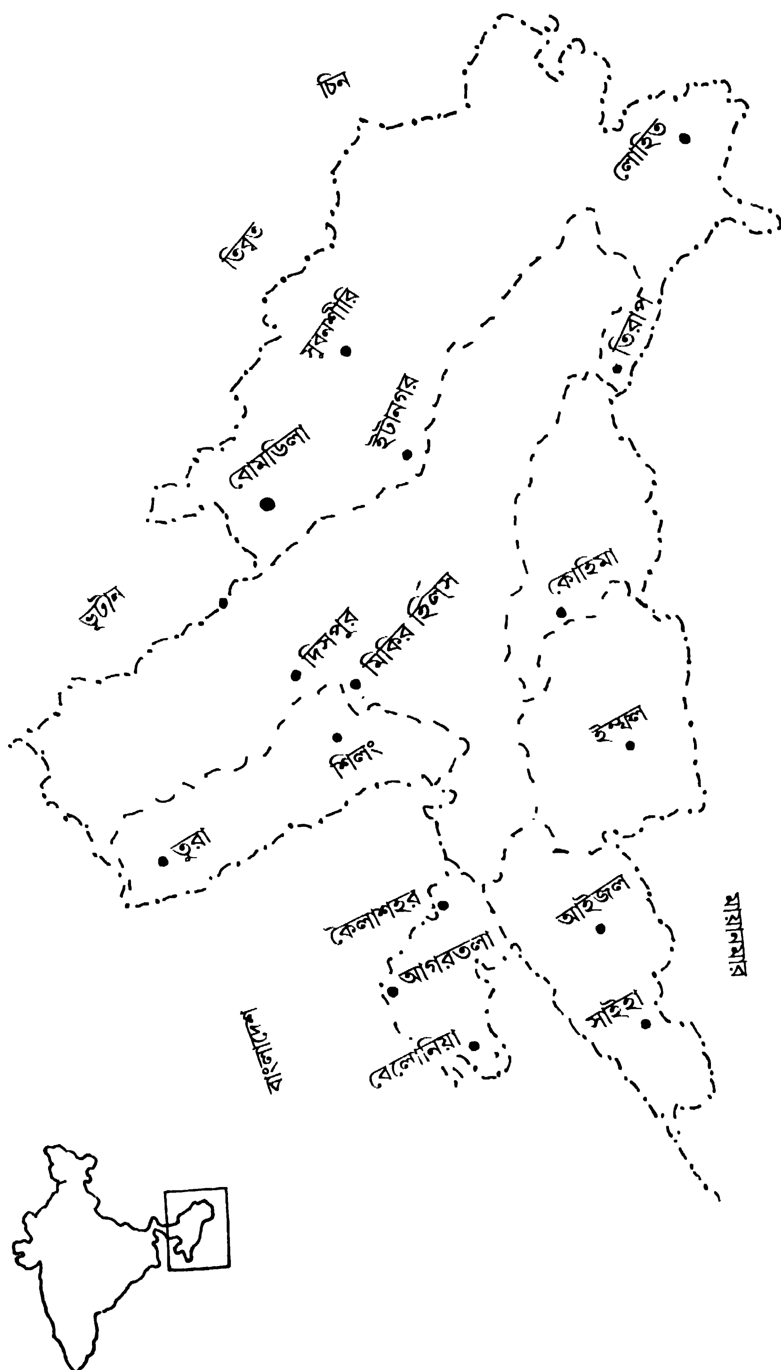
বৈষ্ণব?

নামচুম বলেন, হ্যাঁ, নক্‌টেরা বিষ্ণুর ভক্ত এবং বৈষ্ণবীয় আচরণে পাটকেই পাহাড়ে পরিচিত। বিশেষ করে নামসাঙ ও বড়দুরিয়ার নক্‌টেরা।

নক্‌টেরা বৈষ্ণব মতবাদে বিশ্বাসী। আসামের নাজিরার বড়েঘর 'সাত্রার' শিষ্য। শোনা যায়, বড়েঘর সাত্রার প্রতিষ্ঠাতা রামদেব আতারের সঙ্গে নরোত্তম নাগার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধু রামদেব আতারের কাছ থেকে সে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল।

যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, নক্‌টেরা তাহলে কি পৌত্তলিক? নামচুম অবশ্য কোনও নক্‌টেকে মূর্তিপূজা করতে দেখেননি। কথায় কথায় ইয়ান জো-ইম্‌থেন অনেক পিছনে পড়ে থাকে। নামচুমকে সে কথায় ফিরিয়ে নেওয়া সহজ নয়। মনে করিয়ে দিলেও তিনি আপন মনে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবেন। কৌতুহলের মাত্রা চরমে পৌঁছে দিয়ে তিনি ঠিক সময়ে আবার ফিরে আসবেন। নক্‌টেরা মঙ্গোলয়েড। কবে থেকে তারা অরুণাচলের অধিবাসী তা তারাও যেমন বলতে পারে না, মানববিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করেও তার যথার্থ হদিস খুঁজে পাননি। শুধু অরুণাচল নয়, এমন কি নেফাও নয়, সম্ভবত প্রাগজ্যোতিষপুরের অস্তিত্বেরও আগে থেকে তারা এই অঞ্চলের বাসিন্দা।

আদিদের সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে নক্‌টেদের কিছু কিছু জায়গায় অমিল থাকলেও—জীবনচর্চায় অনেক সাদৃশ্য আছে। অরুণাচলের অন্যান্য উপজাতিদের মত


চিন
তিব্বত
লোহিত
সুবনশীরি
ইটানগর
বোমডিলা
তিরাপ
ভুটান
কোহিমা
দিসপুর
মিকির হিলস
শিলং
ইম্ফল
তুরা
কৈলাশহর
আইজল
আগরতলা
সাইহা
বেলোনিয়া
বাংলাদেশ
মায়ানমার

তারাও আপন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারা ঘর তৈরি করে মাটি থেকে চার-পাঁচ ফুট উপরে। ঘরের নীচে থাকে প্রাণী-সম্পদ। নক্‌টেদের লোওয়াং বা রাজার গৃহ—বিশাল। সম্ভবত অরুণাচলের কোনও উপজাতির সর্দারদের এত বড় বাড়ি নেই। কাঠের থাম ও পুরু তক্তা দিয়ে তৈরি বাড়ি। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাঠের দেয়ালে খোদিত প্রাকৃতিক দৃশ্য। নানা জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি। বাড়ির সম্মুখ ভাগ মানুষের মাথার খুলি দিয়ে সাজানো। বড়দুড়িয়া লোওয়াং-এর বাড়িতে শ'খানেক মাথার খুলি রাখা আছে।

ইদু মিশমীদের মত তারা মাথার সম্মুখ ভাগ গোলাকারে কামায়। অথচ মিশমীদের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। গোল করে মাথার সম্মুখ কামিয়ে পিছনে ঝুটি বাঁধে। অন্যান্য মঙ্গোলয়েডদের মত তাদের দাঁড়ি গোঁফ নেই। নক্‌টে রমণীরা অবশ্য দীর্ঘ কেশের অধিকারিনী। লম্বা চুল রাখতে তারা ভালবাসে। বিনুনী বেঁধে কাঁধের দু'দিকে ঝুলিয়ে দেয়। কিন্তু . . .

বলতে বলতে হঠাৎ-ই নামচুম থেমে যান। বড়দুড়িয়া গ্রামে গভীর রাত। লোওয়াং-এর গৃহের আলো নিভে গেছে। পোহ্-র মশাল দুটি প্রায় নিভু নিভু। মাচাং-এর ওপর নিদ্রিত জনা পঁচিশ অবিবাহিত যুবক। কেউ কেউ চলে গেছে ইয়ান-পোহ্-তে।

নামচুম বলেন, কোনও বিধবা নক্‌টে রমণী যদি তার চুল কেটে ফেলে, তাহলে বুঝতে হবে—সে দ্বিতীয়বার বিবাহে আগ্রহী নয়।

যখন বিধবার প্রশ্ন উঠল, স্বভাবতই তখন মনে করা যেতে পারে, নামচুম এবার নক্‌টে রমণী আর ইয়ান-পোহ্-র কথা তুলবেন। কিন্তু তিনি সে পথে হাঁটলেন না। বললেন, ওয়ান্‌চো রমণীদের মধ্যে উল্কি কাটার প্রথা প্রচলিত। আপনি তো দেখেছেন—ওয়ান্‌চো মেয়েরা প্রথমে উল্কি আঁকে নাভিতে, তারপর পা, তারপর উরু এবং সবশেষে স্তনে। এই উল্কির সঙ্গে ওয়ান্‌চো নারীদের বাগদান , বিবাহ ও মাতৃত্বের সম্পর্ক আছে।

নক্‌টেদের মধ্যেও এই উল্কি আঁকার প্রথা প্রচলিত। একটু বেশি মাত্রায় প্রচলিত। নক্‌টে নারী পুরুষ উভয়েই উল্কি কাটে। কপাল থেকে পা পর্য্যন্ত। উল্কি কাটার জন্য আলাদা লোক থাকে। তারা শরীরের বিভিন্ন অংশে নানা রকম উল্কি এঁকে দেয়। উল্কি দেখেই নক্‌টেদের চেনা যায়। আদিদের মধ্যে আকারা মুখে উল্কি কাটে — আর শরীরের বিভিন্ন অংশে ছবি আঁকে। ছবি আঁকার জন্যেই তাদের বলা হয় আকা।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিটি নক্‌টে পুরুষ ও রমণীর দাঁত কালো। পাটকেই পাহাড়ের জঙ্গলে একরকম গাছ পাওয়া যায়। তারা ওই গাছের ছাল চিবিয়ে দাঁতগুলো মিশমিশে কালো করে রাখে।

নামচুম বলেন, নক্‌টেদের পোহ্-র কথা শুনলেন। পোহ্ আর তাদের নঙ্‌থুনের কথা আপনাকে এখনও বলা হয়নি।

এবারও ভেবেছিলাম নামচুম ইয়ান-জো-ইম্‌থেনের কথা শোনাবেন। কিন্তু চলে গেলেন নঙ্‌থুনের কথায়। গ্রাম সভাকে নক্‌টেরা বলে নঙ্‌থুন। বর্তমানে পঞ্চায়েত গঠিত

হলেও ধর্মারণ্য যুগের নঙ্‌থুন এখনও সচল এবং কার্যকর। গ্রামের সব বিচার-আচার এই নঙ্‌থুন পরিচালনা করে। নঙ্‌থুনে কোনও বিষয় মীমাংসিত না হলে, সেই বিষয়টিকে তারা সরকারি দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়।

নক্‌টেরা গ্রামের লোওয়াংকে রাজার মর্য্যাদা দেয় এবং সমীহ্ করে। পদাধিকার বলে লোওয়াং নঙ্‌থুনের সর্বময় কর্তা। লোওয়াংকে সাহায্য করার জন্য তিন রকমের সদস্য থাকে। নক্‌টে ভাষায় তাদের বলা হয়, ননওয়া, বামওয়া ও তানওয়া। এদের মধ্যে ননওয়া লোওয়াং-এর পাশে পাশে থাকে এবং সকল বিষয়ে তাকে সাহায্য করে।

রামওয়ার কাজ বার্তাবাহকের। নঙ্‌থুনের সব সিদ্ধান্ত সে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে। কবে শিকারের দিন আর কবে পরিষদের সভা বসবে, সে সব কাজও রামওয়াকে করতে হয়।

আর তানওয়ার কাজ কি?

নামচুম বলেন, তার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাকে পুরোহিতের কাজ করতে হয়। সব কাজের শুভ দিন এবং শুভ সময় তাকেই ঠিক করে দিতে হয়।

যদি গণনায় ভুল হয়? তাহলে?

নামচুম বলেন, এই 'তাহলে'র জবাব আমার জানা নেই। তবে নিশ্চয়ই তার গর্দান যায় না।

এই তিন রকমের সদস্য ছাড়াও নক্‌টে উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিটি শ্রেণী থেকে একজন করে সদস্য নঙ্‌থুনে স্থান পায়। তাদের বলা হয় নোকাতাঙ্।

মজার কথা, নঙ্‌থুনে কোনও মহিলা সদস্য থাকতে পারে না। তবে অভিযুক্তা স্বয়ং উপস্থিত থেকে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারে। নঙ্‌থুনের কোনও সদস্য সাম্মানিক পায় না। সকলেই অবৈতনিক। তবে যে সব জরিমানা নঙ্‌থুনে জমা পড়ে, তার একটা অংশ সদস্যদের মধ্যে বাটোয়ারা করে দেওয়া হয়। বেশির ভাগ অংশ পোহ্ ও গ্রামের উন্নয়নের কাজে খরচ করা হয়।

'সত্য বই মিথ্যা বলিব না'—কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের যে শপথ নিতে হয়—অভিযুক্ত ও সাক্ষীকে নঙ্‌থুনের সদস্যদের সামনে এই ধরনের শপথ গ্রহণ করতে হয়। তাদের শপথের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, ভয় ও আতঙ্ক।

মাটিতে হাত রেখে অথবা সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অভিযুক্তকে তার অপরাধ স্বীকার অথবা অস্বীকার করতে হয়। সব নক্‌টে ভূমি ও সূর্যকে দেবতা বলে মনে করে। ভূমি স্পর্শ করে আর সূর্যের দিকে তাকিয়ে নিজের ও পরিবারের ক্ষতির ভয়ে তারা কখনই মিথ্যা বলতে পারে না।

নামচুম বলেন, জঘন্য কোনও অপরাধের জন্য হাতি বা বাঘের দাঁত অথবা একটি ডিম মুখের মধ্যে পুড়ে তাকে শপথ করতে হয়। কোনও অপরাধী তা করতে রাজি হয় না। তার আগেই দোষ স্বীকার করে নেয়।

আর যে দোষ করেনি, তার বেলায়? কারণ দোষী বা নির্দোষ কোনও মানুষের পক্ষে ডিম মুখে পুড়ে স্পষ্ট ভাষায় শপথ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

নামচুম বলেন, অতদূর যেতেই হয় না। পাপবোধের মধ্য থেকেই স্বীকারোক্তি বেরিয়ে আসে।

ভূমির মামলার ফয়সালা হয় বিতর্কিত জমি স্পর্শ করে। উভয় দাবিদারকে ভূমি স্পর্শ করে বলতে হয়--এ জমি আমার। সহজে মিথ্যাচার কেউ করতে চায় না। একটা অজানা অমঙ্গলের ভয়ে মিথ্যা দাবিদার মাথা নীচু করে সরে যায়। সুতরাং নঙ্‌থুনের বিচার পদ্ধতির সঙ্গে একটি অপার্থিব বিষয় জড়িয়ে থাকে।

কেউ এসে পোহ্‌-র মশাল জ্বালিয়ে দেয়। আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নামচুম মৃদু হেসে বলেন, আপনি তো ইয়ান জো-ইম্‌থেনের গল্প শোনার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। একটু অপেক্ষা করুন, ভোর হবার আগেই নক্‌টেদের ইয়ান জো-ইম্‌থেনের কাহিনী শেষ করব।

নামচুম আগেই শুনিয়েছেন, নক্‌টেরা বৈষ্ণব। ব্রিটিশেরা আসাম দখলের অনেক আগেই তারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। সুতরাং মস্তক শিকার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অনেককাল আগেই ঘটে গেছে।

অথচ কোনও এককালে প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। ওয়ান্‌চো আর নক্‌টেরা প্রায় একই জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করত। যুদ্ধের ধারাও ছিল প্রায় একই রকম। তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল— বর্শা, দা ও তীর ধনুক। তীরের মাথায় লাগানো থাকতো--তীব্র অ্যাকোনাইটের বিষ। বর্তমানে অস্ত্র শস্ত্র সবই আছে--শুধু নেই শত্রু নিধনের মানসিকতা। বরং বলা যেতে পারে, এখন আর কেউ কাউকে শত্রু ভাবে না। তুমি বাঁচো, আমাকে বাঁচতে দাও—এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠার পর থেকে উপজাতিদের মধ্যে একটা মৈত্রীর নিবিড় বাতাবরণ গড়ে উঠেছে।

অস্ত্রের ঝনঝনানি থেকে নামচুম ফিরে আসেন গৃহের কলরোলে। তিনি লোওয়াং-এর জীবনচর্চা দিয়েই নক্‌টেদের জীবনবেদ শুরু করেন।

লোওয়াং সমাজের শিরোমণি। উত্তরাধিকার সূত্রে লোওয়াং-এর বড় ছেলে এই পদের উত্তরাধিকারী। লোওয়াং-এর প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত প্রথম পুত্র লোওয়াং-এর পদে অভিষিক্ত হয়। যদি প্রথম পত্নীর কোনও পুত্র সন্তান না থাকে তাহলে দ্বিতীয় পত্নীর প্রথম পুত্র লোওয়াং-এর সম্মানীয় আসনে সমাসীন হবে।

দেশ-বিদেশের রাজপরিবারে আমরা একই রকম প্রথা দেখতে পাই। তারা উত্তরাধিকার প্রথা সভ্য সমাজ থেকে ধার করেনি। অরুণাচল যখন ধর্মারণ্য ছিল তখন থেকেই এই প্রথা নক্‌টেদের মধ্যে প্রচলিত।

—যদি লোওয়াং-এর কোনও সন্তান না থাকে?

নামচুম বলেন, নক্‌টেদের অলিখিত সংবিধানে তারও ব্যবস্থা রয়েছে। লোওয়াং সন্তানহীন হলে, তার ছোটভাই ঐ পদের উত্তরাধিকারী হয়।

লোওয়াং কাহিনী এখানেই শেষ হয় না। অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করে পোহ্-র যুবকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশাপাশি বাঁশের মাচাং-এ মুখোমুখি বসে নামচুম নক্‌টেদের জীবনচর্চা করছেন।

নক্‌টেরা এক ভার্য্যায় আস্থাবান। এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ সমাজ পরিপন্থী কাজ। কিন্তু লোওয়াং-এর ক্ষেত্রে এ নিয়ম শিথিলযোগ্য। লোওয়াং একাধিক বিয়ে করতে পারে। তবে প্রথমা স্ত্রীকে অবশ্যই অন্য গ্রামের লোওয়াং পরিবারের কন্যা হতে হবে। পরবর্তী স্ত্রীরা সাধারণ পরিবারের হলেও নক্‌টে সমাজ-সংহিতায় আটকায় না।

লোওয়াং ছাড়া অন্য কেউ একাধিক বিয়ে করতে পারে না। তবে ব্যতিক্রম যে না ঘটে, তা নয় ; ব্যতিক্রমের জন্য সেই ব্যক্তিকে যথেষ্ট মূল্যও দিতে হয় এবং এ বিষয়ে স্বামী বা স্ত্রী নঙ্‌থুনে বিচার চাইতে পারে।

নামচুম বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সকল উপজাতিদের বিবাহের রীতি-নীতি প্রায় একরকম। অথচ সম্প্রদায় বহির্ভূত বিবাহের ঘটনা ঘটে না বললেই চলে। নিজেদের জনগোষ্ঠীর বাইরে সাধারণত কোনও বিবাহ হয় না। নক্‌টেরাও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। তবে সমগোত্রে কোনও বিবাহ হয় না।

মেয়েরা সমাজের সম্পদ ও সংসারের সম্পত্তি। পোহ্-তে বা নঙ্‌থুনে প্রবেশাধিকার না থাকলেও সমাজে তার মূল্য আছে। মেয়েরা মূল্যবান, তাই উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কনেপণ প্রচলিত। যৌতুক বলে কোনও বস্তুর সঙ্গে আদিদের পরিচয় নেই। তবে কনেপণ অনেক সময় মাত্রাধিক্য ও সামর্থের বাইরে হওয়ায়, কোনও কোনও আদি সম্প্রদায় সব ভাই এক বৌয়ের স্বামী হয়। অবশ্য নক্‌টেদের মধ্যে এই প্রথা নেই। তবে উত্তরাধিকার প্রথা বর্তমান। বড় ভাইয়ের স্ত্রীর উত্তরাধিকারী তার ছোট ভাই। অবশ্য এক্ষেত্রে বড় ভাইয়ের স্ত্রীর মতামতের উপর উত্তরাধিকার নির্ভর করে। স্বামীর কোনও ভাই না থাকলে গোত্র সম্বন্ধীয় নিকট-আত্মীয় বিধবার উত্তরাধিকারী হয়। গোত্র ও গোষ্ঠীর বাইরে যদি বিধবা অন্য কাউকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে, সেই পুরুষকে সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

নিয়ম থাকলেও বাস্তবে তা বড় একটা কার্যকর হয় না। কারণ ক্ষতিপূরণের মূল্য অনেকের পক্ষেই সাধ্যাতীত। তাই ভালবাসার সাধ থাকলেও—আর্থিক সাধ্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

নক্‌টে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের নানারকম বিধি আছে। তবে ইয়ান-পোহ্ থেকে যে বিবাহের সূত্রপাত হয় সেই বিবাহের প্রচলন বেশি।

মনে হয়, এবার নামচুম ইয়ান-জো ইম্‌থেনে ফিরে আসবেন। সম্ভবত ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। দেশের মধ্যে অরুণাচল সূর্যের প্রথম চুম্বনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নামচুম বলেন, ইয়ান-পোহ্‌-র মানে তো আগেই শুনেছেন। তবুও আবার বলি, ইয়ান-পোহ্‌ কুমারী-নিলয়। আদিরা যাকে রাশেং বলে, নক্‌টেরা তাকেই বলে ইয়ান-পোহ্‌। এখানে অবিবাহিতা মেয়েরা রাত কাটায়।

ইয়ান পোহ্‌-তে ছেলেদের প্রবেশ আবশ্যিক।

এখান থেকে ছেলে-মেয়ের মনে ভালবাসা অঙ্কুরিত হয়। পরে, কনেপণ দিয়ে প্রেয়সীকে ঘরের বধূ করে নিয়ে যায়।

নামচুম মনে করিয়ে দেন, রাশেং-এ বিবাহিতা মেয়েরা যেতে পারে না। কিন্তু ইয়ান-পোহ্‌- তে বিবাহিত দম্পতি গিয়েও রাত কাটাতে পারে।

জামাইখাটা প্রথাও নক্‌টদের মধ্যে প্রচলিত। কন্যা-ধার প্রথাও খুঁজলে পাওয়া যায়।

কন্যা-ধার কী ?

নামচুম বলেন, কারও কন্যাকে কেউ যদি বধূ করে নিয়ে আসে—ধার-প্রথা অনুযায়ী তাকে কন্যা দিয়েই ঋণ শোধ করতে হয়। অবশ্য, কনেপণের কোনও হেরফের ঘটে না।

কোরাপুটের বন্দোরা যাকে সেনালি ডিঙ্গো বলে, আলমোড়ার ভোটিয়ারা তাকেই বলে রঙ্‌বঙ্‌। অরুণাচলের নক্‌টেরা বলে ইয়ান-জো-ইম্‌থেন। ইয়ান-জো-ইম্‌থেন থেকে নক্‌টেরা মনপছন্দ জীবন সঙ্গিনী খুঁজে নেয়।

ইয়ান-জো-ইম্‌থেন থেকে তারা যৌবন-জিজ্ঞাসারও জবাব পায়।

২

ওয়ানচো

নদীর নাম তিসা। গ্রামের নাম নিউয়াসা। ওরা উচ্চারণ করে নইসা। ওরা মানে ওয়ান্‌চো। অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলার অর্ধাঙ্গ আবৃত উপজাতি। মায়ানমার বা বার্মার সীমান্ত ঘেঁষা তিরাপ। জেলার পূর্ব প্রান্তে তিসা। পশ্চিমে নাগাল্যাণ্ডের তুয়েঙসাঙ্ আর দক্ষিণে পাটকেই পর্বতশ্রেণী।

পাটকেই উপ-পর্বতমালায় ঘেরা নিউয়াসা আগে ছিল ওয়ান্‌চো এলাকার প্রশাসনিক সদর দপ্তর; এখন বারো কি.মি. দূরে লংডিং-এ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নীচে গড়িয়ে যাওয়া তিসার দিকে তাকিয়ে নামচুম বলেন, প্রায় দেড়শ' বছর আগে এই নদীতে বর্শাবিদ্ধ এক বাগ্‌দত্তার মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

দেড়শ' বছর আগে?

ইন্দ্রজিৎ নামচুম তিসার জলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিসার সঙ্গে তাঁর বহুদিনের পরিচয়। নামডাফা জীব-পরিমণ্ডলের কর্মী হিসাবে তাঁকে প্রায়ই এদিকে আসতে হয়। যখনই নিউয়াসায় আসেন, তখনই কিছুক্ষণের জন্য তিসার তীরে এসে বসেন।

মেয়েটির অপরাধ?

নামচুম সবসময় নিজের মর্জিমাফিক চলেন। তার সঙ্গে এসেছি তিরাপ। যাব মিঁয়াও, শুনব ওয়ান্‌চো বা বনফেরিয়া নাগাদের জীবনচর্চা। জেলার প্রায় সাত হাজার স্কোয়ার কি.মি. এলাকার এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে ওয়ান্‌চো 'রাজ্য'। ওয়ান্‌চোদের পূর্বদিকে বাস করে তাদেরই সমগোত্রীয় অপর একটি উপজাতি নক্‌টে আর পশ্চিমে দুর্ধর্ষ উপজাতি কোনিয়াক। কোনিয়াকদের সঙ্গে ওয়ান্‌চোদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। দুটি উপজাতির উৎপত্তির পৌরাণিক ভিত্তি প্রায় এক। নৃ-তাত্ত্বিকদের চোখে এই দুটি উপজাতির মিথ্ আর মাইগ্রেশনের সাদৃশ্য আছে। তবুও তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। পরস্পরের উপর আধিপত্য বিস্তারে কেউ পিছ-পা হতে চায় না।

নাগাল্যাণ্ডের কোনিয়াকদের মত ওয়ান্চোরাও মস্তক শিকারী। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও এই অপবাদের কথা তাদের বিরুদ্ধে শোনা গেছে। এখনও মানুষের মাথার খুলি তাদের গৃহে শোভাবর্ধন করে। কিন্তু মস্তক শিকারে তাদের আর উৎসাহ নেই। সভ্যতার কাছাকাছি এসে তাদের মানসিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে। তবে নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা থেকে তারা সরে আসেনি। পাটকেই পাহাড়ের গায়ে যতদিন মেঘ জমবে, যতদিন কুয়াসা হামাগুড়ি দিয়ে নীচে নামবে-ততদিন তাদের আদি সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন হবে না। জ্যাং বা আকাশের রং পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু আদি বিধি ও সমাজ ব্যবস্থার কোনও ব্যত্যয় ঘটবে না। পরাজয়ে পরাঙ্মুখ ও জীবন সংগ্রামে আত্মপ্রত্যয়, ওয়ান্চোদের প্রধান অস্ত্র।

মিঁয়াও শহরে সন্ধ্যা নেমে আসে। পাটকেই পাহাড়ের পিছনে সূর্য টুপ করে ডুবে যায়। নামচুম বলেন, ওয়ান্চো শব্দটি খুবই সাম্প্রতিক। স্বাধীনোত্তর কালে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তাদের রাজা বা সমাজপতি ওয়াংহাম থেকেই ওয়ান্চো নামের প্রচলন। ওয়ান্চোদের ইতিহাস আছে। আছে তাদের উৎপত্তির কাহিনী আর কিংবদন্তি। ব্রিটিশেরা তাদের বলত পূবের নাগা অথবা বনফেরিয়া নাগা। জনৈক ব্রিটিশ পর্যটক এক ধাপ এগিয়ে বলেছিল—নগ্ন নাগা। অহমদের রাজত্বকালে ওয়ান্চোদের পরিচয় ছিল—বড় মিথুনিয়া—হরু মিথুনিয়া, বড় বাচাং ও হরু বাচাং। স্বাধীনতার পর এই উপজাতির নামকরণ করা হয় ওয়ান্চো। ব্রিটিশ পর্যটকেরা ওদের 'অসভ্য' ও 'দুর্ধর্ষ' বলে চিহ্নিত করলেও—ওয়ান্চোদের অতীতের ইতিহাস অন্য কথা বলে। মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হলেও অহমদের সঙ্গে বৈষয়িক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক মোটামুটি ভাল ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও অহমেরা তাদের ব্রিটিশদের মত অসভ্য বা দুর্ধর্ষ বলে আখ্যায়িত করেনি।

একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওয়ান্চোরা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। তখন তাদের বলা হত পূবের নাগা। ব্রিটিশের সরকারি নথিপত্রে ওয়ান্চোদের অসভ্য আর দুর্ধর্ষ বলে চিহ্নিত করা হল। একটি ব্রিটিশ জরিপদল জরিপ করতে গিয়েছিল ওয়ান্চো রাজ্যে। সেই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন হল্‌কম্ আর ক্যাপ্টেন ব্যাগলে। আশি সদস্যের জরিপ দলকে বনফেরিয়া নাগারা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

নামচুম থামেন। মিঁয়াও-এর বুকে কুয়াসা নামতে শুরু করেছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াসা ঘন হবে। শহরের অস্তিত্বটি তখন কুয়াসার আড়ালে চলে যাবে। নামচুম আবার শুরু করেন, যে গ্রামে ব্রিটিশদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল, সেই ছোট্ট পাহাড়ী গ্রামের নাম নিনু। সরকারি গেজেটে গ্রামের নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু কী কারণে বনফেরিয়া নাগাদের সঙ্গে ব্রিটিশ জরিপকারীদের সংঘর্ষ হয়েছিল—সে কথা গেজেটে উল্লেখ নেই। দুই ক্যাপ্টেনসহ আশিজনকে তাঁবুর মধ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

আমাকে বলতেই হয়—অকারণে নিশ্চয়ই ঘটনাটি ঘটেনি। ধরে নেওয়া যেতে পারে আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত ব্রিটিশেরা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। সম্ভবত আত্মরক্ষার জন্য বনফেরিয়ারা প্রতিশোধ নিয়েছিল।

আমার কথার জবাব না দিয়ে নামচুম বলতে থাকেন, এই ঘটনার পর বনফেরিয়া নাগাদের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃ-তাত্ত্বিকেরা অনেকদিন নানাভাবে ওই লোমহর্ষক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন—কিন্তু প্রকৃত কারণ কেউই উদ্ধার করতে পারেনি। স্বল্পবসনা কোনও ওয়ান্‌চো নারীকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটেছিল বলে অনেকের ধারণা।

তাহলে বর্শাবিদ্ধ তরুণীটি কি এই ঘটনার নায়িকা?

নামচুম বলেন, গেজেটে সে রকম ঘটনার কোনও উল্লেখ নেই। তবে ওয়ান্‌চোদের মধ্যে এই রকম একটা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। নারীর অপমান বনফেরিয়ারা সহ্য করতে পারে না। তাদের সমাজে নারী একটি বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ওয়ান্‌চো মেয়েদের সুঠাম দেহের খাঁজে খাঁজে কামনার আগুন জ্বলে—সেই আগুনে সমগোত্রীয় যুবকেরা পুলকিত হলেও আত্মাহুতি দিতে পারে না। এখানেও ওয়ান্‌চো সমাজ বিধি নিষেধ আরোপ করেছে।

ওয়ান্‌চোদের উৎপত্তির কিংবদন্তি আছে আর সেই সঙ্গে এই উপজাতির ইতিহাসও আছে। নথিভুক্ত না থাকলেও বনফেরিয়ারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাটকেই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ-পশ্চিমের ন্যানুঅকান নামক জায়গা থেকে অরুণাচলে এসেছিল। ওয়ান্‌চোদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী বনফেরিয়ারা দু-দলে বিভক্ত হয়ে তিরাপে প্রবেশ করেছিল। যে দল নাগাল্যাণ্ডের টেংনু হয়ে তিরাপে এসেছিল-তাদের বলা হয় তান্‌জান আর অপর দলটি যারা চ্যাংনু দিয়ে ঢুকেছিল তারা চ্যাংজান নামে পরিচিত।

ব্রিটিশ আমলে ওয়ান্‌চোদের সংখ্যা কখনওই নিরূপিত হয়নি। শুধু যে সব গ্রামে তারা বসবাস করত সেই সব গ্রামের একটা মোটামুটি হিসাব রাখা হত। সম্ভবত 'অসভ্য ও দুর্ধর্ষ' বলেই ব্রিটিশেরা তাদের আদম সুমারির অঙ্গীভূত করেনি। ইংরেজরা তাদের যতখানি দুর্ধর্ষ এবং আদিম মনে করত মূলত তারা ততখানি নয়। অসমীয়াদের সঙ্গে মাঝে মাঝে গণ্ডগোল হলেও বনফেরিয়া নাগা বা আজকের ওয়ান্‌চোদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ভালই ছিল।

ব্রিটিশ আমলে ওয়ান্‌চোদের সঙ্গে প্রশাসনিক সম্পর্ক ভাল না থাকায়, সে আমলে তাদের শিক্ষার প্রসার আদৌ ঘটেনি। স্বাধীনতার পর শিক্ষা ব্যবস্থা ওয়ান্‌চোদের গ্রামে সম্প্রসারিত হয়েছে। দীর্ঘ দিন অবহেলিত থাকার ফলে শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। তাদের শিক্ষিতের হার অত্যন্ত নগন্য। আঠাশ হাজার ওয়ান্‌চোর মধ্যে মাত্র ৯০০ সাক্ষর। সাক্ষর মেয়েদের সংখ্যা মাত্র ৭০। ধরে নেওয়া যায়, গত দু-দশকে শিক্ষিতের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়েছে। কারণ ওরা উদ্যোগী ও উদ্যমী।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও-জীবনের পাঠশালায় শিক্ষা নিয়ে ওয়ান্‌চো ছেলে-মেয়েরা নিজেদের সমাজোপযোগী করে তুলতে পারে। হাতে-কলমে শিক্ষা প্রতিটি ছেলে-মেয়েকে দেওয়া হয়। 'মিলন, অনুকরণ, প্রদর্শন ও উপদেশ' এই চারটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে ওয়ান্‌চো ছেলে-মেয়েরা হাতে-কলমে শিক্ষা পায়। সে

শিক্ষায় অক্ষর না থাকলেও দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে।

ছেলেদের হাতে-কলমে শিক্ষার জন্যে রয়েছে মোরাং অর্থাৎ 'ব্যাচিলর ডর্মিটরি'। এই মোরাং ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন নামে অরুণাচলের প্রায় সব উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে। ছেলেদের যেমন মোরাং-এ শিক্ষা দেওয়া হয় তেমনি অবিবাহিতা মেয়েরা ঘরে এবং জুমের ক্ষেতে হাতে-কলমে শিক্ষা পায়। সমাজের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় নেমে আসে।

মোরাং-এর কথা পরে। তার আগে শুনুন ওয়ান্চোদের জীবন ও জীবিকার কথা। জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক বড় নিবিড়। জীবনের জন্য যেমন জীবিকা তেমনি জীবিকার উপর জীবন নির্ভরশীল। মূলত ওয়ান্চোরা কৃষিজীবী। আধুনিক লাঙল দিয়ে চাষে এখনও তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। পোড়ানো ঝলসানো চাষ পদ্ধতি এখনও চলেছে।

আর্থিক সঙ্গতি চাঙ্গা রাখার জন্য তারা বনে শিকার করে, নদীতে মাছ ধরে ও বাঁশ আর বেতের বাস্কেট বানায়। নিজেদের প্রয়োজনীয় পোশাক নিজেরাই তাঁতে বুনে নেয়। কঠোর পরিশ্রমে তারা স্বয়ম্ভর। পরনির্ভরশীলতার প্রতি ওয়ান্চোদের আদৌ বিশ্বাস নেই। সম্প্রতি কাঠ খোদাইয়ের কাজে বেশ কিছু ওয়ান্চো হাত পাকিয়েছে। কাঠের গায়ে তারা জীবনের শাসন ও অনুশাসন খোদাই করে। প্রকৃতির রূপকেও তারা কাঠের গায়ে ধরে রাখে। কাঠ-খোদাই সম্প্রতি তাদের জীবিকার দ্বিতীয় সূত্র। ভূমির সঙ্গে ওয়ান্চোদের হৃদয়ের যোগ আছে। নাড়ি টিপে রোগীর অবস্থা যেমন বিচার করা যায়, তেমনি ভূমি ছুঁয়ে তারা বলতে পারে, কোন্ জমিতে ফসল ফলাবে, আর কোন্ জমিতে হবে ঘর। বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল হলেও অকারণে বন ধ্বংস করার পক্ষপাতী তারা নয়। ঘর তৈরি করার জমিকে তারা বলে হামটিং আর জুমের জমিকে বলে জ্যাং। জঙ্গলকে বলে জ্যান। ঘর তৈরির জন্য জ্যান থেকে সংগ্রহ করে কাঠ, বাঁশ আর বেত। নোকলিং বা রিজার্ভ ফরেস্টে ওয়ান্চোরা হাত দেয় না। আইনের অনুশাসনকে উপেক্ষা করাকে তারা পাপ মনে করে।

অন্যান্য উপজাতিদের মতো বনফেরিয়া নাগা বা ওয়ান্চোদের জীবন নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তারা জীবনের শিক্ষা নেয় মোরাং থেকে। মোরাং একটি প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠান থেকে তারা আচার-আচরণ, সামাজিক ও কর্মজীবনের শিক্ষা গ্রহণ করে। মোরাং-এ ওয়ান্চো মেয়েদের প্রবেশাধিকার নেই। মেয়েরা থাকে অন্যত্র ও আলাদা। অরুণাচলের প্রতিটি আদিবাসীদের মোরাং থাকে। ওয়ান্চোদের প্রতিবেশী নক্টেরা মোরাংকে বলে পোহ্। বরিস্রা বলে ব্যাঙ্গো। বিভিন্ন নামে ডাকা হলেও— উদ্দেশ্য এক। আকারে-আকৃতিতেও সাদৃশ্য আছে। যুবকদের জন্য যেমন মোরাং বা মসুপ তেমনি কুমারী মেয়েদের জন্য কোনও কোনও উপজাতি রাশেং ও পুনাং-এর ব্যবস্থা রেখেছে। গ্রামের অবিবাহিতা মেয়েরা রাশেং-এ রাত কাটায়। মোরাং-এ যেমন ছেলেদের জীবনের শিক্ষা নিতে হয়, রাশেং-এ মেয়েরা তাই নিয়ে থাকে। অবিবাহিতা মেয়েদের মোরাং-এ যাওয়া

নিষেধ থাকলেও রাশেং-এ ছেলেরা রাত কাটাতে পারে। কোনও কোনও গ্রামে একাধিক মোরাং থাকে। জনসংখ্যার উপর মোরাং বা রাশেং-এর সংখ্যা নির্ধারিত হয়। শুধু অবিবাহিত যুবকদের রাত কাটাবার জন্যই মোরাং নয়। মোরাং হল গ্রামের সামুদায়িক কেন্দ্র। সভা-সমিতি, গ্রামের উন্নয়ন, পরিকল্পনা, বিচার এবং রাজনৈতিক আলোচনা এই মোরাং এ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ান্‌চোদের মোরাং-এ একটা দুন্দুভি থাকে। দুন্দুভি সঙ্কেতের কাজ করে। ওয়ান্‌চোদের মোরাং খুবই সুসংগঠিত। ওয়ান্‌চো মেয়েদের জন্য রাশেং বা কুমারী-নিলয় নেই। এই উপজাতি সম্প্রদায়ের মেয়েরা ঋতুস্নানের পরেই আলাদা শয্যায় শয়ন করে।

ওয়ান্‌চোরা মোরাংকে বলে পা উ। সব গ্রামেই পা-উ আছে। গ্রামের অধিপতি বা ওয়ান্‌চো সমাজের শিরোমণির আলাদা মোরাং থাকে। সেই মোরাংকে বলা হয় ওয়াংহাম্-পা। এই ওয়াংহাম্-পাকে ধরা যেতে পারে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট। জরুরি বিষয়, গ্রামের নিরাপত্তা ও বহিঃ-আক্রমণের বিষয় এই ওয়াংহাম্-পা-য় আলোচিত হয়। ওয়াংহাম্-পা-র নিয়ন্ত্রণে থাকে আরও দুটি মোরাং। ওয়ান্‌চো ভাষায় তাদের বলা হয়-পা-নু আর পা-সা। সম্প্রদায়ের সামুদায়িক সভা পা-নুতেই অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াংহাম্-পা ওয়ান্‌চোদের কাছে মন্দিরের মত পবিত্র। পা-উকে তারা নানাভাবে সাজিয়ে রাখে। সেখানে দুন্দুভি (ড্রাম) রাখা বাধ্যতামূলক। দুন্দুভিকে ওরা বলে—খাক্। পূর্ব-পুরুষদের মস্তিষ্ক শিকারের নমুনাও তারা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ওয়াংহাম্-পা-য় ঝুলিয়ে রাখে। খুলির মালা দেখেই বুঝতে ভুল হয় না—কোনও এক সময় বনফেরিয়া নাগারা মস্তক শিকারী ছিল।

প্রকৃতির সঙ্গে ওয়ান্‌চোদের নিবিড় সম্পর্ক। মোরাং-এর প্রতিটি দরজা-জানালায় কারুকার্যই প্রধান বিষয়বস্তু। ওয়াংহাম্-পা ও পা-নু অত্যন্ত সুচারুভাবে সজ্জিত ও অলংকৃত। বারো বছরের ঊর্ধ্বে যে কোনও বয়সের পুরুষ পা-উ-এর সদস্য হলেই তাকে সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক মনে করে ওয়ান্‌চোরা। মেয়েদের মোরাং-এ ঢোকবার সামাজিক ছাড়পত্র নেই। মাত্র একদিন মোরাং এ ঢুকতে পারে তারা। যেদিন নবনির্মিত মোরাং-এর উদ্বোধন হয় কেবলমাত্র সেদিন মেয়েরা উপস্থিত থাকতে পারে।

প্রত্যেক জাতি ও উপজাতিদের সমাজ আছে। সে সমাজ, নির্ধারিত সামাজিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়। নিয়ন্ত্রণ করে 'রাজা' বা সমাজপতি আর তাকে সাহায্য করার জন্য থাকে ব্যবস্থাপক সমিতি। প্রতিটি ওয়ান্‌চো গ্রামে সমাজপতি বা রাজা আছে। সমাজের সকল রকমের সুযোগ-সুবিধা ও সম্মান রাজা পেয়ে থাকে। রাজাকে কেন্দ্র করেই সমাজের সংহতি ও একতা। ওয়ান্‌চোরা রাজাকে মনে করে সামাজিক ঐক্যের প্রতীক। ওয়ান্‌চোদের মধ্যেও বর্ণভেদ রয়েছে। আমাদের মত তাদের সমাজেও চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র না থাকলেও প্রায় সেই রকমই একটা ব্যবস্থা ওয়ান্‌চো সমাজে দেখা যায়। ওয়ান্‌চোদের ভাষায় রাজাকে বলা হয় ওয়াংহম্। ওয়াংহম্ হচ্ছে বর্ণশ্রেষ্ঠ। আমরা যাদের শূদ্র বলি, ওয়ান্‌চো ভাষায় তাদেরই বলা হয় ওয়াংপ্যান। ওয়াংহম্ আর ওয়াংপ্যানের মাঝে রয়েছে ওয়াংচাম্ ও ওয়াংচুম। এই দুটি বর্ণের জন্ম

হয়েছে—ওয়াংহম্‌ আর ওয়াংপ্যানের সমাজসিদ্ধ মিলনে। ওয়াংহম্‌ পুরুষ ও ওয়াংপ্যান নারীর মিলনে যাদের জন্ম হয়—তারা সমাজের দ্বিতীয় বর্ণ অর্থাৎ ওয়াংহমের পরেই সমাজে তদের স্থান। ওয়ান্‌চোরা তাদের বলে ওয়াংচাম্‌। ওয়াংচাম্‌ পিতা ও ওয়াংপ্যান মাতার মিলনে যাদের জন্ম হয়-তারা হল ওয়াংচুম্‌। অর্থাৎ আমাদের শূদ্রের সঙ্গে তুলনীয়। বর্ণভেদ থাকা সত্বেও বর্ণ নিয়ে বদমাইসী কেউ করে না। ওয়াংহম্‌ বর্ণশ্রেষ্ঠ হলেও—ওয়াংচুমের সঙ্গে এক আসনে বসতে তার কোনও বাধা নেই। ফলে ওয়ান্‌চো সমাজে জাত-পাতের লড়াই নেই। আমাদের মত উচ্চবর্ণেরা নিম্নবর্ণদের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করে না।

ওয়ান্‌চোদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। অরুণাচলের সব উপজাতিরা পিতার অধীন। সংসারের দায়িত্ব ছাড়া মেয়েদের আর কোনও বিষয়ে অধিকার নেই। পুরুষ-শাসিত সমাজ হলেও-মেয়েদের প্রতি তারা নির্মম নয়। কঠিন কাজ সাধারণত পুরুষেরাই করে। সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন—মা ও বাবার সমান দায়িত্ব। ছেলে-মেয়ে বড় হলে তাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের উপর মা-বাবা যেমন হস্তক্ষেপ করে না—তেমনি কোনও ছেলে-মেয়ে কখনই পিতা-মাতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। ওয়ান্‌চোদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী কোনও বয়স্থ ছেলে-মেয়ে এক ঘরে শয়ন করে না। ছেলেরা বড় হলেই পা-উ-এ চলে যায় আর মেয়েরা কোনও রক্তের সম্পর্কহীন বিধবার তত্ত্বাবধানে রাত কাটায়। অবশ্য রাজার মেয়েরা নিজেদের বাড়িতে আলাদা ঘরে ঘুমায়। রাজকন্যার শয়ন কক্ষকে ওয়ান্‌চোরা বলে, নাউসা-জিপ্‌-হাম্‌।

রাজা-রাজাই। ওয়ান্‌চোদের কাছে 'রাজা' দেব-প্রতিম। দেব-প্রতিম রাজা শ্রেষ্ঠত্বর সুযোগ নিয়ে সাধারণের উপর অত্যাচার করা দূরের কথা কখনোই অন্যায় ও অবিচার করে না।

যে গ্রামীণ ব্যবস্থাপক সমিতি ওয়ান্‌চোদের মধ্যে প্রচলিত, 'রাজা' সেই সমিতির কর্ণধার। তাকে সাহায্য করার জন্য সব বর্ণ থেকেই একজন কবে প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সমিতিতে থাকে। সব বিষয়ে রাজার ভেটো দেবার অধিকার থাকলেও—তিনি কখনো সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন না। সর্বসম্মতিক্রমে সব বিচারের ফয়সালা হয়। এই ব্যবস্থাপক সমিতিকে ওয়ান্‌চোরা বলে—ওয়ানচু-ওয়ান্‌চা। একমাত্র গ্রামের বয়স্করাই এই সমিতির সভ্য হতে পারে। পক্ককেশের অভিজ্ঞতার প্রতি ওয়ান্‌চোরা বিশ্বাসী। রাজা ছাড়াও এই ব্যবস্থাপক সমিতিতে থাকে, ওয়াংচা, ওয়াংচু, নোপা, ওয়াংচাম্‌ এবং প্রতি গোত্র থেকে একজন করে প্রতিনিধি।

তাদের নিয়ম অনুসারে ওয়াংচা আর ওয়াংচু মন্ত্রীর মর্যাদা পায়। নোপা পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করে আর ওয়াংচাম্‌ হল বার্তাবহ। আজকাল অবশ্য পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু ওয়ান্‌চোর নিজস্ব ব্যবস্থাপক সভার বিলোপ হয়নি। পূর্বের মত একইভাবে তারা কাজ করে।

নামচুম আবার 'রাজার' বিষয়ে ফিরে আসেন। তিনি আগেই জানিয়েছেন, রাজা অত্যাচারী নয়। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসায় সে একজন গণতন্ত্রী। ওয়ান্‌চোদের সমাজে গণতন্ত্র কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। রাজা বা ওয়াংহাম গ্রামের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। উত্তরাধিকার সূত্রে রাজার ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। রাজার মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সে স্থান অধিকার করে। এই পুত্রকে অবশ্যই প্রথম রানীর প্রথম পুত্র-সন্তান হতে হবে। প্রথম রানিকে ওয়ান্‌চোরা বলে—ওয়াংসিয়া। ওয়াংসিয়া সমাজে সম্মানিতা। তাকে রান্না করতে হয় না। রাজার আহারের সময় তাকে উপস্থিত থাকতেই হয়। মেয়েরা উত্তরাধিকারিণী নয়। যদি উপযুক্ত উত্তরসূরি না মেলে তাহলে গ্রামের মানুষ একসঙ্গে বসে পাশের গ্রামের রাজাকেই নিজেদের রাজা বলে স্বীকার করে নেয়।

রাজা শুধু সুখ উপভোগ করে না—সাধারণ মানুষের দুঃখের অংশ নেয়। বিপদে-আপদে রাজা তাদের পাশে দাঁড়ায়। সাহায্যের দরজা তার সব সময়েই খোলা থাকে।

এক স্ত্রী নীতি ওয়ান্‌চোরা অনুসরণ করে। রাজার ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। রাজা একাধিক বিয়ে করতে পারে। অন্য গ্রামের 'রাজকন্যা'-কে বিয়ে করা রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক।

স্ত্রী যদি অসুস্থ ও অবিশ্বাসী হয়, সে ক্ষেত্রে ওয়ান্‌চোরা সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। বিধবা বিবাহের বিশেষ প্রচলন নেই। তবে কোনও বিধবা যদি পুনরায় কাউকে বিয়ে করতে চায়, ওয়ান্‌চো সমাজ বাধা দেয় না। ওয়ান্‌চো মেয়ের বিয়ে ঠিক হলেই তার নাভিতে ক্রস চিহ্নের মতো একটি উল্কি এঁকে দেওয়া হয়। উল্কি দেখেই ওয়ান্‌চোরা বুঝতে পারে এ মেয়ে বাগদত্তা।

—বর্শাবিদ্ধ মেয়েটি কি বাগ্‌দত্তা ছিল?

হঠাৎ আমার প্রশ্নে নামচুম থেমে যান। পালটা প্রশ্ন করেন, আপনি জানলেন কী করে? তারপর হেসে জবাব দেন, প্রচলিত কিংবদন্তি তাই বলে। বাগ্‌দত্তা হবার পর কোনও যুবকই আর তার দিকে তাকায় না। বাগদত্তা মেয়ে ইচ্ছে করলে নির্ধারিত ছেলের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করতে পারে। যৌনসংসর্গ এ ক্ষেত্রে অপরাধ নয়। সন্তান এলেও সে সমাজসিদ্ধ।

কোনও মেয়ে প্রথম সন্তান সম্ভবা হলে, ওয়ান্‌চোরা তার স্তনে উল্কি এঁকে দেয়। আর এই উল্কি আঁকা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ছেলের বাড়ি। পান-ভোজে গ্রামের সব লোককে আপ্যায়িত করা হয়। মুক্ত স্তনে উল্কি দেখলেই ওয়ান্‌চোরা বুঝতে পারে-এইবার মেয়ে মা হতে চলেছে। মেয়ের গায়ে আরও উল্কি আঁকা হয়। সন্তান জন্ম দেবার পর মায়ের উরুতে উল্কি আঁকা বাধ্যতামূলক। উরুতে উল্কি দেখলেই মনে করতে হবে—এ মেয়ে মা হয়েছে। নাভি, স্তন আর উরুতে উল্কি না থাকলে বুঝতে হবে এ মেয়ে কুমারী।

কোনও বাগ্‌দত্তার অন্য পুরুষে উপগত হওয়া ওয়ান্‌চো সমাজে দণ্ডনীয় অপরাধ। বর্শাবিদ্ধ সেই বাগ্‌দত্তাটি নাকি ক্যাপ্টেন ব্যাগলের বক্ষলগ্না হয়েছিল। আর তার জন্যই

গভীর রাতে জরিপ দলের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল ওয়ান্‌চোরা। বাগ্‌দত্তাকে বর্শাবিদ্ধ করে তিসার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নামচুম জানালা দিয়ে বাইরে তাকান। ঘন কুয়াসার মধ্যে কিছু দেখার চেষ্টা করেন। আমি উঠতে চাই। নামচুম আমাকে বসিয়ে বলেন, শেষটুকু শুনে যান।

আধুনিক সভ্যতার তরঙ্গে ওয়ান্‌চোদের এই প্রথা ভেসে যায়নি। নগর সভ্যতার পাশাপাশি নিউয়াসার সমাজব্যবস্থা সমানভাবে চলেছে। দুর্গম গ্রামে আজও ওয়ান্‌চোরা অর্ধ-নাঙ্গা। ছেলেদের পরনে নেংটি—মেয়েদের কোমরে ডুমা। অনাবৃত শরীরে উদ্ধত বন্য সৌন্দর্য। প্রকৃতি-সৃষ্ট এই সৌন্দর্যের কোনও বিকল্প নেই।

৩

সিংফো

বেশ শব্দ করেই চায়ে চুমুক দিয়ে নামচুম বললেন, চা আবিষ্কারের সাল-তারিখ আপনার মনে আছে?

ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা টেবিলের উপর নামিয়ে নামচুমের মুখের দিকে তাকাই। ঘুম থেকে উঠে যিনি অপাং (মদ) দিয়ে দিনের কাজ শুরু করেন, হঠাৎ তিনি চা আবিষ্কারের দিন-তারিখের কথা জানতে চাইছেন কেন? নামচুম বলেন, ইংরেজরা চায়ের আবিষ্কারক, তাদের এ দাবি আমি মানতে রাজি নই।

আমার জানা আছে, নিশ্চিত না হয়ে ইন্দ্রজিৎ কোনও বিষয় নিয়ে তর্ক করেন না। নামডাফার বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেও বহির্বিশ্বের অনেক খবর রাখেন। নোয়াডিহিং-এর ধারে বসে খাম্পতি ভাষায় কবিতা লিখলেও অরুণাচলের আদি-উপজাতিদের শিকরের সন্ধান তিনি রাখেন। তাঁকে মানব বিজ্ঞানীরা 'খালিপদ' নৃ-তাত্ত্বিক বলে ঠাট্টা করলেও তাঁরাই আবার তাঁর কাছে আদিদের জীবনচর্চার সুলুক সন্ধান জেনে নেন।

চায়ের পাতা পানীয় হিসাবে ব্যবহার করার পিছনে ইংরেজদের কোনও অবদান নেই। অবশ্য তারা চায়ের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু চায়ের আবিষ্কর্তা হিসাবে তাদের মানতে আমার আপত্তি আছে। খেয়ালি নামচুম এমন হেঁয়ালি মাঝে মধ্যেই করেন। তাঁর প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে সর্বদাই কম-বেশি রহস্য থাকে। তর্ক করে সে রহস্যের উদঘাটন করা যায় না। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলে সব হেঁয়ালির সমাধান তিনি নিজেই করে দেন।

নামডাফার অরণ্যকুঞ্জ অনেকক্ষণ আগেই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। নোয়াডিহিং-এর জল দেখা যায় না। অরণ্যকুঞ্জের লাউঞ্জে হ্যারিকেনের আলো-আঁধারি। বনের মধ্যে গভীর অন্ধকার। মাঝে মধ্যে নিশাচর জন্তু-জানোয়ারের চিৎকার। বন্যজন্তুর হুঙ্কারের

সঙ্গে নামচুম পরিচিত। তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমিও প্রায় পরিচিত হয়ে উঠেছি। তবুও বিকট আওয়াজে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। নামচুম নির্বিকার। ঘরের পিছনে বাঘের গর্জনেও তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না। যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব চোখে-মুখে লেগে থাকে।

—ইংরেজদের বহু আগেই চা-কে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করছে কারা, জানেন?

আমার জানা নেই। জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে ইন্দ্রজিৎ নামচুম বলেন, সিংফো।

—সিংফো! আমাদের সিংফোরা?

হাসতে হাসতে নামচুম বলেন, আমাদেরই সিংফো।

বহু যুগ আগে থেকেই সিংফোরা চা-কে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করছে। চা-ব্যবহারে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক পদ্ধতির কিছু মিলও খুঁজে পাওয়া যায়। কচি চা-পাতা তুলে তিনদিন রোদে শুকিয়ে আর তিনরাত শিশিরে ভিজিয়ে নেয়। তারপর রোদে শুকানো শিশিরে ভেজানো সেই পাতা একটি বাঁশের চোঙার মধ্যে ঢুকিয়ে মৃদু আঁচ খাওয়ায়। এর ফলে দীর্ঘদিন পাতার সুগন্ধ থাকে।

চায়ের ইতিহাস বলেছিলেন নামচুম। তাঁর মতে সিংফোরা চা-ব্যবহারের পথিকৃৎ। তাদের এই কৃতিত্বের জন্য প্রতিবেশী উপজাতি মানুষ হিসাবে নামচুমের বুক গর্বে ফুলে ওঠে।

নামডাফার অভয়ারণ্যে রাত গভীর হয়। নোয়াডিহিং-এর শব্দ আরও কাছে আসে। ফায়ার প্লেসের আগুন উস্কে দিয়ে নামচুম বলেন, একদা এই সিংফোদের মধ্যে সিংহবিক্রম ছিল। দুর্বিনীত এই মানুষগুলির সঙ্গে প্রতিবেশীদের খটমট লেগেই থাকত। কিন্তু আজ? আরুণাচলের সব উপজাতির মধ্যে তারাই সবচেয়ে বেশি অলস। আফিং খেয়ে তারা দিনরাত বুঁদ হয়ে থাকে।

—তাদের জীবন চলে কি করে? এবার নামচুম অপাং-এর গ্লাস তুলে নেন। তাতে ছোট একটি চুমুক দিয়ে বলেন, জানেন তো, কোনও ব্যক্তির একটি হাত যদি কোনও কারণে কমজোরি হয়, তাহলে অপর হাতে প্রচণ্ড শক্তি পায়। সিংফোদের অবস্থা প্রায় সেইরকম। সিংফো রমণীরা খুবই পরিশ্রমী। ঘর থেকে বনে, বন থেকে জুমে তাদের দিবা রাত্রির কাজ প্রসারিত। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সিংফোদের রাজ্য খুবই উর্বরা। অনায়াসে সেখান থেকে তারা জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করে।

মেয়েরা যখন দাসদের নিয়ে জুমের ফসল কাটে, সিংফো পুরুষরা তখন গালিচার মত ঘাসে গা এলিয়ে দিয়ে রোদ পোহায় অথবা দু-চার জন তীর ধনুক আর কাট্টাল নিয়ে শিকারে বেরিয়ে যায়। আফিং সিংফোদের জীবনে এক সর্বনাশা অভিশাপ।

—আপনি দাসের কথা কি যেন বলছিলেন?

নামচুম বলেন, সিংফো সমাজে সেই সনাতনী দাসপ্রথা প্রচলিত আছে। ইংরেজীতে আপনারা যাকে 'স্লেভারি' বলেন। সিংফো অর্থনীতিতে দাসদের অবদান বড় বেশি। দাস হলেও তাদের স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করে না। কয়েকটি সামাজিক বিধি ব্যতীত দাসের সঙ্গে প্রভুর বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। সিংফো মানে জানেন?

দাসদের প্রসঙ্গ থেকে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে সরে যান তিনি। এই মুহূর্তে দাসদের সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাঁর কাছ থেকে কোনও সদুত্তর পাওয়া যাবে না। ঠিক সময়ে তিনি নিজেই আবার দাস প্রথার প্রসঙ্গে ফিরে আসবেন। নামচুমের প্রশ্নের জবাবে বলি, জবাবটাও আপনি দিন।

নামচুম মৃদু হেসে বলেন, সিংফো মানে মানুষ।

এই মানুষগুলো আজ থেকে ঠিক দু'শ বছর আগে ১৭৯৩ সালে বার্মা সীমান্ত অতিক্রম করে অসমে ঢুকেছিল। তখন অহমরাজ গৌরীনাথের বিরুদ্ধে মহামারিয়া সম্প্রদায়ের একটি অংশ বিদ্রোহ করেছিল। অরাজকতার সুযোগ নিয়ে সিংফোরা খাম্পতিদের তাড়িয়ে দেয়।

—আপনার সম্প্রদায়কে?

—ঠিকই বলেছেন, আমি খাম্পতি সম্প্রদায়ের মানুষ। আমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সিংফোদের জোর লাঠালাঠি হয়েছিল। তারা খাম্পতিদের পাটকেই পাহাড়ের উর্বরা উপত্যকা থেকে হটিয়ে দিয়ে নিজেরা তেঙ্গাপানিতে বসবাস শুরু করে। কি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। আমার মনের কথা টেনে নিয়ে নামচুম বলেন, না, ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনও আক্রোশ নেই। আট প্রজন্মের পর মনের মধ্যে আক্রোশ পুষে রাখার কোনও মানে হয় না।

আজ যে-সব সিংফোরা আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে, তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষেরা আদৌ তা ছিল না। তারা ছিল আগ্রাসী। মাঝে মধ্যেই অসমের সমতলে গিয়ে লুটতরাজ চালাত। আর নিরীহ মানুষকে বন্দী করে এনে নিজেদের দাস করে রাখত। ইংরেজদের হাতে তারা বারকয়েক নাস্তানাবুদ হয়েছিল। সেও তো প্রায় শ' দেড়েক বছর আগের কথা। ইংরেজ সৈন্যরা নোয়াডিহিং পর্যন্ত ধাওয়া করে তাদের কবল থেকে সমতলের বন্দীদের মুক্ত করে এনেছিল। নামচুম বলেন, সম্ভবত, দাস প্রথাই সিংফোদের অলস করেছে। অসমের সমতল থেকে যাদের অপহরণ করে আনতো সিংফোরা তাদের দাসে পরিণত করত। এমনি করেই দাসের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে এবং দাসদের একটা নিজস্ব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। আজ তাদের সমাজেও অনেক দাস দেখতে পাওয়া যায়।

দাসদের দিয়ে সব কাজ করাতে করাতে তারা নিজেরাই বিলাসী আর অলস হয়ে উঠল। তারপর এল আফিং। সেই আফিং-এর প্রভাব সিংফোরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য সিংফো রমণীরা এই সব কুপ্রভাব থেকে মুক্ত। আর মুক্ত বলেই সম্ভবত সিংফো সমাজ এখনও টিকে আছে।

যে দস্যুবৃত্তির জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আগ্রাসী আর অত্যাচারী বলে পরিচিত ছিল, সেই দুর্বিনীত সিংফোরা নারীর কোমল প্রভাবে এখন বড়ই বিনীত। মনে হয়, সিংফোদের ইতিহাস থেকে নামচুম এবার সমাজ ব্যবস্থায় ফিরে আসবেন। কিন্তু যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ বিশ্বাস করা যায় না। একটা নতুন প্রসঙ্গ তুলে সেই পথেই চলতে থাকবেন।

নামচুম বলেন, সিংফো রমণীদের চেহারায় বিশেষ কোনও লাবণ্য নেই। রমণীর সহজাত লাবণ্য নিয়ে জন্মালেও বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই লাবণ্য হারিয়ে যায়। জলে ভিজে আর রোদে পুড়ে রমণীর রমণীয়তা ফিকে হয়ে যায়। নামচুমের গলা কেমন যেন ভিজে মনে হয়। হয়ত সিংফো রমণীর অতি পরিশ্রম তাঁর ভাল লাগে না। পুরুষরা যদি নিজেদের কাজ ঠিকমত করত তাহলে সিংফো রমণীদের দৈহিক সৌন্দর্য সব রমণীর ঈর্ষার কারণ হতে পারত। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্বিনীত সিংফোরা এখন বিনয়ের অবতার, তবুও তারা তাদের মেয়েদের প্রতি সদয় হয়ে উঠতে পারেনি। তারা যে অত্যাচারী এমন নয়। সব দায়িত্ব মেয়েদের উপর ছেড়ে দিয়ে তারা নিষ্কর্মা হয়ে থাকে। আশা করা যায়, পরবর্তী প্রজন্ম এই ভুল শুধরে নেবে।

আমার জন্য আর এক পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিয়ে গ্লাসে অপাং ঢালেন নামচুম। আমার অভিজ্ঞতা বলে, নেশা না জমলে, নামচুমের গল্প বলার তাল বার বার কেটে যায়।

নোয়াডিহিং-এর ধারে এই অরণ্যকুঞ্জে নামচুম আমাকে ওয়ান্‌চো, নক্‌টে, আর কনিয়াকদের জীবনবেদ শুনিয়েছেন। কিন্তু নিজের সম্প্রদায় খাম্পতিদের কাহিনী কিছুতেই বলতে রাজি হননি। খাম্পতিদের সঙ্গে শতবর্ষের ঝগড়া থাকলেও সিংফো রমণীর প্রতি নামচুমের একটু দুর্বলতা আছে।

নারীদের উপর এমন কঠিন আচরণ নামচুমকে কষ্ট দেয়। নামচুম বলেন, আচার-আচরণে আর ব্যবহারে সিংফো রমণীরা পুরুষের বিপরীত। কোনও সিংফো পুরুষ আস্তে কথা বলতে পারে না। সব সময় এবং সকলের সঙ্গেই চেঁচিয়ে কথা বলে। এটা তাদের জন্মগত অভ্যাস। কিন্তু সিংফো রমণীর কথাবার্তা ও আদব-কায়দা পুরুষের ঠিক উল্টো। তারা ধীর-স্থির এবং ব্যবহারে অত্যন্ত বিনয়ী। নম্রতা সিংফো রমণীর অলঙ্কার।

মেয়েদের জন্য সিংফো সমাজ এখনও টিকে আছে। পুরুষ ও রমণী যদি একই ধাঁচের হতো তাহলে আত্মঘাতী সংঘর্ষে গোটা সিংফো সমাজটাই শেষ হয়ে যেত।

সিংফো রমণীরা ব্যবহারে শুধু বিনয়ী নয়, পোশাকেও অভিজাত ও শালীন। তাদের পোশাকের সঙ্গে অসমের মেখলার কিছু সাদৃশ্য আছে। মেয়েদের বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা থাকে। কেশচর্চায় সিংফো রমণী অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁরা আকাশচুম্বি ঝুঁটি বাঁধে। পুঁতি বসানো রুপোর ক্লিপ দিয়ে ঝুঁটি ঠিক রাখে। অবশ্য পুরুষরা প্রায় একইরকম কেশচর্চা করে। পুরুষরা ডুরে লুঙ্গি পরে। পোশাকে মায়ানমারীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নামচুম বলেন, চুল বাঁধার ধরন দেখলেই বোঝা যায়, কে বিবাহিতা আর কে কুমারী।

বলেই বেশ জোরে হেসে ওঠেন নামচুম। তার হাসির রেশ নোয়াডিহিং-এর তরঙ্গে মিশে অনেক দূরে ভেসে যায়।

বিবাহিতা সিংফো রমণী মাথার মাঝখানে আকাশচুম্বি ঝুঁটি বেঁধে রাখে। বিবাহিতা রমণীরা অবশ্য আরও একটি চিহ্ন ধারণ করে। বলুন তো সেই চিহ্নটি কী?

এবারও চুপ করে থেকে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করি।

—না, আপনাদের সমাজের মেয়েদের মত হাতে শাঁখা আর কপালে সিঁদুর পরে না। বিবাহিত রমণীরা উল্কি কাটে। গোঁড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা উল্কি। উল্কি দেখেই বোঝা যায়, এ মেয়ে বিবাহিতা।

সিংফো সমাজে কুমারী কন্যা উল্কি কাটতে পারে না। তাদের আকাশচুম্বি ঝুঁটি বাঁধা নিষেধ। ঘাড়ের কাছে এলো খোঁপা ঝুলিয়ে রাখে।

—নক্‌টেরা তো নারী-পুরুষ উভয়েই উল্কি কাটে।

—হ্যাঁ। সিংফোদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত। কিন্তু পুরুষদের উল্কি খুব গভীর হয় না। হাতে বা পায়ে ফিকে উল্কি কেটে নেয়। বিবাহিত-অবিবাহিত যে কোনও পুরুষই উল্কি কাটতে পারে।

কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত অথচ নম্রতায় অবিচল সিংফো রমণীর বিবাহের কথা জানতে ইচ্ছে করে। মেয়েদের কথা যখন উঠেছে , তখন নামচুম নিশ্চয়ই তাদের বিবাহের কথা বলবেন। কিন্তু নামচুম সে পথে হাঁটেন না। তিনি বলেন, জানেন অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সিংফোরা প্রচণ্ড যুদ্ধবাজ ছিল। লুটতরাজ আর অপহরণ ছিল তাদের দৈনন্দিন ব্যাপার। তীর-ধনুক, দা আর বর্শার সঙ্গে তারা নিজেদের তৈরি বন্দুক ব্যবহার করত। কাঠ কয়লা আর মায়ানমার থেকে আমদানি করা গন্ধক দিয়ে বারুদ তৈরি করত। অবশ্য এখন আর সেই সব বন্দুকের ব্যবহার নেই। তবে তীর-ধনুক আর বল্লম নিয়ে জঙ্গলে শিকার অব্যাহত আছে। মৃগয়ায় তারা যত সময় নষ্ট করে, চাষে ও গৃহস্থালীতে তার একাংশও করে না। করলে সিংফো রমণীদের এমন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হ'ত না।

নামচুম বলেন, বুঝতে পারছি, যুদ্ধ, লুটতরাজ আর অপহরণের কথা আপনার ভাল লাগছে না। জানেন তো, একটি জাতির জীবনবেদ শুধু জন্ম-বিবাহ আর মৃত্যু নিয়ে নয়। আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলি জানা না থাকলে একটা জাতির জীবনবেদ লেখা যায় না। নামচুমের কথায় প্রতিবাদ করা যায় না। কারণ নামচুম প্রতিবাদীর প্রতিবাদকে মোটেই আমল দেন না। তিনি সর্বদাই নিজের খেয়াল আর মর্জিমত চলেন। সিংফোরা খাম্পতিদের মতই বৌদ্ধ। কিছু অলৌকিক সংস্কারেও তারা বিশ্বাসী। ভূত, প্রেত ও অপদেবতার অস্তিত্বে তাদের সন্দেহ নেই। রোগ ও অপঘাত মৃত্যুর সঙ্গে অপদেবতার ঘনিষ্ঠ যোগকে তারা অস্বীকার করে না। ওপরে মু-নাত ও নীচে গা-নাত — সবচেয়ে জাগ্রত দেবতা। সিংফোরা সর্বদাই এই দেবশক্তিদ্বয়কে তুষ্ট রাখতে সচেষ্ট থাকে। প্রতিবেশী অনেক

উপজাতির মতো সিংফোরা অনেক সংস্কার মেনে চলে। তারা বিশ্বাস করে অসীম আকাশের ঠিক মাঝখানে বৃষ্টি আর রোদের দেবতা থাকে। উভয় দেবতাকে তুষ্ট রাখতে তারা মহিষ ও মোরগ উৎসর্গ করে। তাদের ভাষায় বৃষ্টি দেবতার নাম নিংসাই-নাত। কোনও ব্যক্তির যদি কোনও কারণে রক্তপাত ঘটে তাহলে তারা শম-নাতের পূজা করে। আর শিকারে যাবার আগে মু-নাতের উদ্দেশে একটি মহিষ বলি দেয়।

এইসব পূজার্চনা তারা নিজেরা করে না। এর জন্য আলাদা পুরোহিত আছে। তারা পুরোহিতকে বলে 'পাঙ্গি'। সিংফোরা বিশ্বাস করে পাঙ্গি দৈবশক্তিতে শক্তিমান। মু-নাতের সঙ্গে সে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। সমাজে তাই পাঙ্গি সর্বজনমান্য। পাঙ্গির মন্ত্রশক্তিতে কারও ক্ষতি ও কারও লাভ হতে পারে। তাই তারা কখনও পাঙ্গিকে চটায় না।

রোগ-ব্যাধি শমনাত নামক একটি অপদেবতার কীর্তি। তাকে সন্তুষ্ট রাখা দায়িত্ব সিংফো রমণীদের পালন করতে হয়। স্বামী-পুত্র-কন্যাকে ব্যাধিমুক্ত রাখতে প্রতিটি সিংফো রমণী শম-নাতের উপাসনা করে। শম-নাতের পূজা 'পাঙ্গি' করতে পারে না। এই পূজা করাতে হয় 'তুমসাওবা'কে দিয়ে।

অনেকক্ষণ কথা বলে নামচুম থামেন। আরও একবার গ্লাসে অপাং ঢালেন, রাত গভীর হয়। নামডাফার ঘন অরণ্য নিঃঝুম। মাঝে মধ্যে বন্য প্রাণীর চিৎকারে সেই স্তব্ধতা ভেঙে যায়! অনন্তকাল ধরে নোয়াডিহিং বয়ে চলেছে। তার উপলভাঙা তরঙ্গের শব্দ আরও স্পষ্টতর হয়।

নামচুম বলেন, মৃত্যুর পর সাধারণত তারা দেহ কবর দেয়। কিন্তু কোনও মাননীয় ব্যাক্তির মৃত্যু ঘটলে তার দেহ তিন-চারবছর রেখে দেওয়া হয়।

--সেকি! কেমন করে রাখে? ওরা কি মমি করতে জানে?

নামচুম একটু ভেবে বলেন, না মমি নয়। মৃত্যুর পর দেহটি একটি নিরাপদ উন্মুক্ত জায়গায় রেখে দেয়। প্রাকৃতিক কারণে সেই দেহ পচে গলে নষ্ট হয়ে যায়। শুধু থাকে কঙ্কাল। কঙ্কালটি একটি কফিনের মধ্যে রেখে দেয়। যতদিন সেই সম্মানীয় ব্যক্তির সব আত্মীয় না দেখবে ততদিন কফিনের মধ্যে কঙ্কালটি সযত্নে রক্ষিত থাকবে। তারপর কোনও একদিন গ্রামের সকলের উপস্থিতিতে কফিনটি কবরে নামিয়ে দেওয়া হয়।

নামচুম বলেন, আপনার ধৈর্যের উপর অনেক চাপ দেওয়া হয়ে গেল। জানেন তো, সংস্কার আর সংস্কৃতি পরস্পরের পরিপূরক। তাই সে-সব কথা একটু সবিস্তারে বলতে হয়।

এতক্ষণ ইতিহাস, সংস্কার ও সংস্কৃতির সব কথাই নামচুম বললেন। এবার নিশ্চয়ই সিংফোদের বিবাহের কথা শোনাবেন।

নামচুম বলেন, সিংফোর কাহিনী প্রায় শেষ হয়ে এল। এবার তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও বিবাহের কথা শুনুন।

—প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার কথা বলবেন না?

—এ সবই তো সমাজ ও জীবনের অঙ্গ। এ সব বাদ দিয়ে বিবাহের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আপনিতো আদিদের রাশেং দেখেছেন। আপনার ভাষায় যার নাম কুমারী-নিলয়। অরুণাচলের অন্যান্য উপজাতিদের মতো সিংফোদের কুমারী-নিলয় আছে। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় ভার্জিন হাউস। মসুপ বা ব্যাচেলর ডর্মিটরিও আছে।

অবিবাহিতা মেয়েরা কুমারী-নিলয়ে রাত কাটায়। একজন বয়স্কা মহিলার তত্ত্বাবধানে তারা সেখান থেকে জীবনের শিক্ষা নেয়। সন্ধ্যার পর যুবকেরা একে একে সেখানে যায়। এই কুমারী-নিলয়ে জন্ম নেয় প্রেম-ভালবাসা। হৃদয়ের ভালবাসা দেহে সঞ্চারিত হবার আগেই ছেলের বাবা এক জোড়া সিল্কের ধুতি, একটি খুরপি, ভেলভেটের একটি বাক্স আর একটি দাস নিয়ে মেয়ের বাবার বাড়ি চলে যায়। এগুলো সব কনেপণ। দাস উপহার কনেপণের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করলে একাধিক দাস কনেপণ হিসাবে দিতে পারে। অবশ্য কনের পিতার আর্থিক অবস্থার উপর দাসের সংখ্যা নির্ভর করে। চার হাত এক করিয়ে দেবার দায়িত্ব অন্য আর একরকম পুরোহিতের। সিংফোরা সেই পুরোহিতকে বলে 'দেওধীশ'। প্রথানুযায়ী বর-পক্ষ কনে-পক্ষকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করে। বরপণ বলে সিংফো সমাজে কোনও বস্তু নেই। কনেপণ অরুণাচলের সব উপজাতির মধ্যেই প্রচলিত। কারণ তারা নারীকে সম্পদ ও সম্পত্তি বলে মনে করে। সিংফো পুরুষরা একাধিক বিয়ে করতে পারে। সাধ্য অনুযায়ী পাঁচটি বা সাতটি স্ত্রী রাখাও প্রথা বিরোধী নয়। উপপত্নী রাখাও সমাজসম্মত। উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তারা সিংফো সমাজের নির্ভেজাল সদস্য।

নামচুম বলেন, সব জাতি-উপজাতির মধ্যে কিছু বাছ-বিচার থাকেই। সিংফোদের মধ্যেও আছে। মা ও মাতৃগর্ভজাত বোন ব্যতীত সিংফোরা যে কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। উত্তরাধিকার প্রথাও তাদের সমাজে প্রচলিত।

নামচুম থামেন। ফায়ার প্লেসের আগুন খানিকটা উস্কে দিয়ে বলেন, উত্তরাধিকার প্রথা নিশ্চয়ই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। বড় ভাইয়ের বিধবার উত্তরাধিকারী তার ছোট ভাই অথবা পরিবারের উপযুক্ত অন্য সদস্য। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার কনেপণ দিতে হয় না। কিন্তু বিধবা যদি সংসারের বাইরে অন্য কাউকে বিয়ে করে, তাহলে সেই লোকটিকে দ্বিগুণ কনেপণ দিতে হয়। কোনও বিধবা ইচ্ছে করলে সারাজীবন সাত্ত্বিক জীবন-যাপন করতে পারে। সিংফো সমাজ তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহে বাধ্য করে না।

পুরুষদের একাধিক বিবাহ করার অধিকার থাকলেও কোনও বিবাহিতা রমণী পর-পুরুষে উপগতা হতে পারে না। বারভোগ্যা রমণীর সমাজে স্থান নেই।

নামচুম বলেন, আপনাদের সমাজে ধর্ষণ তো এখন নৈমিত্তিক ঘটনা। সিংফো সমাজে এই বিষয়টি খুবই বিরল। কুমারী-নিলয়ে অবস্থানকালীন যদি কোনও মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয় এবং ছেলেটি যদি সেই মেয়েকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে, তাহলে গ্রাম সভায় তার বিচার হয়।

—শাস্তি?

—বিচার ব্যবস্থা যখন রয়েছে. তখন শাস্তির ব্যবস্থাও অবশ্যই থাকবে। এ ক্ষেত্রে ছেলেটি মেয়ের বাবাকে গোটা দুই দাস ও একটি মহিষ জরিমানা দেয়।

—আর গর্ভের সন্তান?

নামচুম বলেন, জানতাম, আপনি এ প্রশ্ন করবেন। দোষী ছেলেটিকে সেই সন্তানের দায়িত্ব নিতে হয়। সে অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকাকে বিয়ে না করতে পারে—কিন্তু পিতৃত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। কুমারী মাকে ফাঁকি দিলেও তার গর্ভের সন্তানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

৪

হিলমিরি

আজকাল আর কেউ পর্বতিয়া মিরি বলে না। ইংরেজরা ওদের নামকরণ করেছিল হিলমিরি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দু-এর দশক থেকেই অহমদের দেওয়া নাম পর্বতিয়া মিরি হারিয়ে গেছে। সরকারি দলিলে ওরা ইংরেজদের দেওয়া নামেই পরিচিত। অরুণাচলীরাও পর্বতিয়া মিরি বললে, ভুরু কুঁচকে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হিলমিরি বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলে দেবে, সোজা চলে যান সুবনসিরি জেলায়। উচ্চ ও নিম্ন দুই সুবনসিরি জেলায় একশ' পঁচিশটি গ্রামে প্রায় অর্ধ-বিচরণশীল এই উপজাতিরা বাস করে। নৃ-তাত্বিকদের দ্বারা সমীক্ষিত হলেও, প্রতিবেশী অন্যান্য আদি সম্প্রদায়ের কাছে প্রায় উপেক্ষিত। অন্তত তিন দশক আগেও হিলমিরিদের এমন অবস্থাই ছিল। সম্ভবত তাদের সংখ্যাল্পতা ও অর্ধযাযাবরী মনোবৃত্তি প্রতিবেশীদের উপেক্ষার অন্যতম কারণ। বর্তমানে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হলেও, হিলমিরিদের মৌলিক মনোবৃত্তির বিশেষ হেরফের ঘটেনি। বাইরের চাকচিক্যে তারা যত না বিশ্বাসী—আপন রীতিনীতিতে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যয়ী।

গোষ্ঠী সংহতি হিল বা পর্বতিয়া মিরিদের প্রত্যয়ী করেছে। হিলমিরিরা গোষ্ঠী বহির্ভূত অন্য আদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক গ্রামে বাস করে না। এমন কী সমগোত্রীয় গ্রাম তারা বেশী পছন্দ করে। তাদের গোত্র দিয়েই গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায়, গ্রামের নাম দিয়ে গ্রামবাসীর গোত্র জানা যায়। গোত্রভিত্তিক গ্রাম হিলমিরি ব্যতীত অন্য কোনও উপজাতিদের মধ্যে পাওয়া যায় না। অথচ সামাজিক সংস্কার অনুযায়ী হিলমিরিদের সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিয়ের জন্য তারা অন্য গ্রামে ও অন্য গোত্রের সন্ধান করে। আজকাল প্রতিবেশী নিশি (বা ডাফলা) ও গ্যালংদের সঙ্গে কদাচিৎ বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটছে। কারণ, নিশি ও গ্যালংরা হিলমিরিদের নিকটতম প্রতিবেশী। এই দুই আদি সম্প্রদায়ের মাঝখানে পর্বতিয়া মিরিদের অবস্থান।

ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি ও ব্যবহারিক আচার-আচরণে অরুণাচলের এই দুই আদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিলমিরিদের কিছু সাদৃশ্য আছে। অতীতে এই সাদৃশ্য ছিল কিনা, তার কোনও প্রমাণ নেই। কারণ, অর্ধবিচরণশীল এই উপজাতি সম্প্রদায় ছ-এর দশকের আগেও স্থান পরিবর্তনে অভ্যস্থ ছিল। সুবনসিরি নদীকে সামনে রেখে এই আদি গোষ্ঠী কখনও উজানে আবার কখনও ভাটিতে বাসস্থান গড়ে তুলেছে। হিলমিরিরা কখনও সোজা রাস্তায় পথ চলে না। কখনই প্রধান সড়কের ধারে-কাছে থাকে না। পায়ে চলা পথে পাহাড়ের পিছনে গহন বনের সীমানায় চলে যায়। শহর বা গঞ্জের নাগালের বাইরে থাকে। নৃ-তাত্ত্বিকেরা এদের পুরো নোমাডিক বা যাযাবর বলেন না। তাদের ধারণা, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এই আদি গোষ্ঠী মাঝে মাঝেই স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। তবে বর্তমানে এই স্থান পরিবর্তনের মাত্রা অনেক কমে এসেছে। এখন দুই সুবনসিরি জেলার গভীর অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ের পাদদেশে একশ' পঁচিশটি গ্রামের বাসিন্দা তারা। এক সময় নিজেদের গ্রামের গণ্ডিকেই যারা পৃথিবী ভাবত, তাদের দু-চারজন সাহসে ভর করে মাঝে মাঝে জিরো বা দোপারিজো শহরে চলে আসে। তবে এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন সুবনসিরির সবুজ উপত্যকায় সীমাবদ্ধ।

সম্ভবত এই সীমাবদ্ধতা আর বেশিদিন থাকবে না। সংক্রামক ব্যাধির মত নগর সভ্যতা অচিরেই তাদের মধ্যে সংক্রামিত হবে। জিরো-কুণ্ডিল দোপারিজোর হাওয়া তাদের অল্পে সন্তুষ্ট মনেও একটা লোভের সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে। এবার গোষ্ঠী কেন্দ্রিক হিলমিরিদের জীবন চর্চার দিকে ফিরে তাকানো যাক।

আগেই বলা হয়েছে, ওরা অর্ধবিচরণশীল। বেশিদিন এক জায়গায় থিতু হয়ে থাকতে পারে না। এর জন্য যাযাবরী মনোবৃত্তির চেয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থা বহুলাংশে দায়ী। গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে কিন্তু জমির পরিমাণ বাড়েনি। ১৮৯১ সালে হিলমিরির মোট সংখ্যা ছিল প্রায় দু-হাজার। অবশ্য তদানীন্তন নেফায় আদমশুমারির কাজ দায়সারা ভাবেই করা হয়েছিল। ১৯৬১ সালে অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর পর এই গোষ্ঠীর সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে ২৫০০। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে নৃ-তাত্ত্বিক ও সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, বিচরণশীলতার জন্য তাদের যথাযথ সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব হয়নি। অবশ্য ১৯৭১ সালের জনগণনায় হিলমিরির সংখ্যা দেখানো হয়েছে প্রায় দশ হাজার। সুবনসিরি দুটি জেলার ১২৫টি গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তারা। সবচেয়ে বড় বসতির জনসংখ্যা প্রায় তিনশ'। আবার মাত্র ন-জন নিয়েও একটি বসতি গড়ে উঠেছে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হিলমিরিদের অতিরিক্ত জমির সন্ধান করতে হয়। তারা প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল সুবনসিরি নদীর উৎসমুখে। উৎসমুখে তাদের সেই বসতি অনেককাল আগেই লোপ পেয়ে গেছে। জমির সন্ধানে তারা ক্রমাগত ওপরে উঠেছে। প্রচলিত পথ পরিহার করে — পরিত্যক্ত দুর্গম পথ অতিক্রম করে তারা আজকের ঠিকানায় এসে পৌঁছিয়েছে। পাহাড় আর বিস্তীর্ণ বন এখন তাদের দখলে। উপত্যকায় বসতি আর পাহাড়ের ঢালে

জুম চাষ। নব্য প্রস্তর যুগের সেই পোড়ানো ঝলসানো কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়নি। আধুনিকতা জিরো, দোপারিজোর পাকা সড়ক ধরে পাহাড়ের শিখরে পৌঁছুলেও—নব্য প্রস্তর যুগের চাষ ব্যবস্থার উপর বিশেষ কোনও প্রভাব পড়েনি। পাহাড়, বন আর সিন্‌গিক বা সুবনসিরির জল এই নিয়েই অন্যান্য উপজাতিদের মত পর্বতিয়া মিরিদের জীবন আর জীবিকা। এবার সেই জীবনের সন্ধান করা যাক। হিলমিরিরা জীবনকে দেখে জীবন দিয়ে। তাই হয়ত তথাকথিত নগর-সভ্য মানুষের সঙ্গে তাদের দূরত্বটা বেশি। পাহাড়, বন আর সিন্‌গিকের সীমিত পরিধির মধ্যে থেকেও—ওদের জীবনের ব্যাপ্তি পরস্পরের মনে প্রসারিত।

কবে, কোথা থেকে, কী ভাবে এসেছিল—সে সম্পর্কে তাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। তবে এই পৃথিবীর জন্ম আর তার মাঝে তাদের অবস্থান নিয়ে হিলমিরিদের নিজস্ব একটা ধারণা আছে। আর সেই ধারণাকে আবহমান কাল থেকেই লালন করে চলেছে।

ওদের ঘর আছে—তাই ওরা গৃহস্থ। সমাজ আছে—তাই সামাজিক। জীবন আছে বলেই ওরা অন্যদের মতো জৈবাকাঙ্ক্ষা তাড়িত। সামাজিক শৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই হিলমিরিরা গোত্রকেন্দ্রিক গ্রাম গড়ে তোলে। কিন্তু সমগোত্রে কখনই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। অন্তঃবিবাহ যে গোষ্ঠী সম্প্রসারণে অন্তরায়—এই বৈজ্ঞানিক সত্য বহুকাল আগে থেকেই তাদের ধ্যান ও ধারণার মধ্যে মিশে আছে। অন্যান্য উপজাতিদের মতই তাদেরও কোনও লিখিত বিধি-বিধান নেই। মৌখিক সমাজবিধিই বংশ পরম্পরাক্রমে অনুসরণ করে চলেছে।

সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য হিলমিরিদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠানে একজন মধ্যস্থ থাকে। হিলমিরিরা তাকে বলে গিঙভুঙ। জমির বিরোধ থেকে শুরু করে, অবৈধ সম্পর্কের বিচার গিঙভুঙকেই করতে হয়। গিঙভুঙের বিচারের বাণীকে তারা বেদবাক্যের মর্যাদা দিয়ে থাকে। অবশ্য নারীর উপর দৈহিক পীড়ন ও ধর্ষণ হিলিমিরি সমাজে বিরল ঘটনা।

অন্যান্য আদি সম্প্রদায়ের মত হিলমিরিদের সুপ্রতিষ্ঠিত কেবাং (পঞ্চায়েত) নেই। ছেলেদের আলাদা থাকার জন্য মোরাং নেই। রাশেং বা কুমারী-নিলয়—ছোটো গ্রামে প্রয়োজন হয় না বলে, রাখে না। অরুণাচলের আদি সম্প্রদায়ের কাছে কেবাং একটি মূল্যবান প্রতিষ্ঠান। গ্রামের শান্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের মত হলেও—আরও বেশি গণতান্ত্রিক। বিচার্য বিষয়ের গুরুত্বের উপর কেবাং সভ্যের গুরুত্ব বাড়ে এবং কমে। গ্রামের যে কোনও মানুষ কেবাং-এর সভায় অংশ নিতে পারে এবং বিষয়বস্তুর উপর মতামত রাখতে পারে। কিন্তু মেয়েদের কেবাং-এ যাওয়া নিষিদ্ধ। তারা কেবাং-এ যেতে পারে না। তবে কোনও মেয়ের বিরুদ্ধে বিচার হলে সে ক্ষেত্রে অভিযুক্তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সব সুযোগই দেওয়া হয়।

হিলমিরিদের এরকম কেবাং নেই। কিন্তু তাই বলে সেখানে বিচার বন্ধ থাকে না। অপরাধীর বিচার হয়। বিচার করে গিঙভুঙ। অপরাধের গুরুত্ব বুঝে দণ্ডাদেশ দেয়। এই গিঙভুঙের কাজ শুধু পুরুষ নয়, মেয়েরাও করে। তবে আন্তঃগ্রাম বিচারের জন্য হিলমিরিদের ব্যাঙ্গো আছে। গ্রামবাসীরাই ব্যাঙ্গোর প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। ব্যাঙ্গোর সভাপতিকে বলা হয় ব্যাঙ্গোনিগম আর সচিব রেইজনিগম নামে পরিচিত। ব্যাঙ্গো সভাপতি সর্বজনমান্য এবং অবশ্যই প্রভাবশালী।

এ সবই হিলমিরিদের জীবনের অঙ্গ—অন্যান্য আদি সম্প্রদায়ের মত প্রাত্যহিকতায় পূর্ণ। সব পুরুষশাসিত সমাজের মত হিলমিরিদের ছেলের প্রতি দুর্বলতা থাকলেও মেয়েদের তারা ঘরের সম্পত্তি ও সমাজের সম্পদ বলে মনে করে। আমাদের সমাজে যেমন বরপণের দৌরাত্ম্যে মেয়েদের ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়—তেমনি কনেপণের উঁচু দাবির ফলে এক নারীকেই অনেক ক্ষেত্রে দ্রৌপদীর ভূমিকা পালন করতে হয়। এই ব্যবস্থা সমাজসিদ্ধ হলেও—বহুল প্রচলিত নয়।

সম্পত্তি ও সম্পদ হলেও নারীদের স্বাধীনতা নেই। জন্ম থেকেই হিলিমিরি কন্যারা ভাগ্যের কাছে বন্দী। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি পরিশ্রম করতে হয়। ঘরের সব কাজ করেও—পুরুষের সঙ্গে বাইরে সমান পরিশ্রম করে। ঘরে যারা জায়া ও জননী—জুমে এবং ফেরিতে তারাই পুরুষের সহকর্মী।

পাঁচ বছর বয়স থেকেই মেয়েদের কর্মজীবন শুরু হয়। আমৃত্যু সেই কর্মজীবন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে। ভোরে ধানভানা দিয়ে যে কাজের শুরু—বেতের বক্ষবন্ধনী তৈরির মধ্যে দিয়ে গভীর রাতে তার পরিসমাপ্তি। মাঝে পুরুষের নেশা অপাং তৈরি। পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের জীবন গড়ে তোলে পর্বতিয়া মিরি রমণীরা। তারা ঘরে স্নেহময়ী জায়া-জননী, মাঠে কর্মতৎপর অক্লান্ত মজুর। প্রসব বেদনা ওঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তারা কাজ করে। জুমের ক্ষেতে কারও প্রসব বেদনা উঠলে সে নিজেই নির্জন জঙ্গলে চলে যায়। নিজেই দা দিয়ে নবজাতক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। আবার সব সময় যে এমন পরিস্থিতি হয়, তা নয়। বাড়িতে আঁতুর ঘরের ব্যবস্থাও আছে। সব সময় যে নির্বিঘ্নে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাও নয়। অনেক সময় বিপদও দেখা দেয়। আর বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে প্রথমেই ডাক পড়ে ওঝার। কিছু পূজা-আচ্চা ও মোরগ বা ছাগলের রক্ত উৎসর্গের মধ্য দিয়ে জরায়ুর জটিল বন্ধনকে খোলার চেষ্টা করা হয়। মা ও সন্তান বাঁচলে—ওঝার কৃতিত্ব বাড়ে, আর মৃত্যু ঘটলে—অদৃশ্য মৃত্যু-দেবতাকে দায়ী করে। শহর ঘেঁষা দু-চারজন আধা শিক্ষিত ছাড়া, হিলমিরিরা নিজেদের চিকিৎসা পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। বনজ ও প্রাণীজ ওষুধের অভাব নেই। ক্যামব্রিং বা কবিরাজ গ্রামের সকলের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখে। অসুখবিসুখে তাকেই পরিত্রাতার ভূমিকা নিতে হয়। বরাত জোরে মুমূর্ষু প্রাণ ফিরে পেলে—ক্যামব্রিং-এর জয়ধ্বনিতে গ্রাম মুখর হয়ে ওঠে।

আগেই বলেছি, জন্মের পর থেকেই হিলমিরি মেয়েরা ভাগ্যের হাতে বন্দী। পিতা, স্বামী ও পুত্রের অবর্তমানে এক বা একাধিক প্রভুর অধীনে তাদের থাকতে হয়।

অন্য আদি- উপজাতিদের মত হিলমিরি সমাজে রাশেং বা কুমারী-নিলয় নেই। ছেলেদের জন্য মোরাং-এর ব্যবস্থা নেই। রাশেং থেকে আদি রমণীরা জীবনের শিক্ষা পায়—যৌন শৃঙ্খলার প্রাথমিক শিক্ষা সেখান থেকেই দেওয়া হয়। হিলমিরি রমণীরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাই ঘরে শিক্ষা নিয়ে তারা জীবন গড়ে তোলে। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়।

ঘরে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরাই তাদের ভাগ্যনিয়ন্তা। সুতরাং তার প্রতি আমৃত্যু অনুগত থাকাই মেয়েদের প্রধান কর্তব্য।

এই কর্তব্য থেকে হিলিমিরির মেয়েরা কোনও দিন বিচ্যুত হয়নি। পুরুষদের দাবি মেটাতে তারা কোনও দিন কার্পণ্য করে না। স্বামীর কাছে কোনও বিষয়ে অনুযোগ করা সমাজসিদ্ধ নয়। স্ত্রীর ক্রুদ্ধ জবাব স্বামীর কাছে অচিন্তনীয়।

একমাত্র বিয়ের দিন তারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অবশ্য প্রদোষের এই ঔজ্জ্বল্য প্রত্যুষের আগেই ম্লান হয়ে যায়। বিয়ের মধ্য দিয়ে হিলমিরি মেয়েরা আর একটি দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়ে পিত্রালয় থেকে স্বামীর ঘরে যায়। তবু বিয়ে। তারা বিয়েকে বলে নিদা। এক জীবন থেকে অন্য জীবনে। দুয়ের মিলনে একটি অস্তিত্বের জন্ম। সেই অস্তিত্বকে ঘিরেই স্বপ্ন। সেই অস্তিত্বের মধ্যেই নিজের সত্তার অবস্থান।

নিদার রাতে তার মর্যাদা বাড়ে। তাকে ঘিরেই সারা গ্রামে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। জুমের কামিনীর প্রায় নিরাবরণ দেহ সেদিন নানা আভরণে ঢাকা পড়ে। হিলমিরি রমণীরা বেতের কাজের পাকা শিল্পী। বেত দিয়ে শুধু গৃহস্থালী তৈজসপত্র তৈরি করে না—তারা বেত দিয়ে নানা রকমের অলংকার তৈরি করে। তাদের হাতে তৈরি বেতের বক্ষবন্ধনী উচ্চমানের হস্ত শিল্প। বেতের বক্ষবন্ধনীর ব্যবহার অরুণাচলের অন্য উপজাতিদের মধ্যে দেখা যায় না। ত্রিপুরার উপজাতিদের রিয়া বা বক্ষবন্ধনী রাজকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং পবিত্র। বিয়ের সময় রিয়া দিয়েই বর কনের মুখ দেখে। অতি পবিত্র বলে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রিয়া ব্যবহার করে।

এই নিদার রাতটুকুই তার কাছে স্মরণীয়। পরবর্তীকালের সুখ-দুঃখের টানা-পোড়েন সেই রাতকে ম্লান করতে পারে না। মাথার মাঝখানে চওড়া পুঁতির মালা। কানে রুকতাক, গলায় মিতে মুরাক। হাতে থাকে একটা আরকা (দা)।

বরের ঘরে প্রবেশ করার আগে কনেকে একটি মুরগি সি (পৃথিবী) ও ডোনির (সূর্য) উদ্দেশে উৎসর্গ করতে হয়। আবহমানকাল থেকে হিলমিরিদের সমাজ ব্যবস্থায় এই নিয়ম চলে আসছে।

আমাদের সমাজে যেমন যোটক বিচার আছে, হিলমিরি সমাজেও তেমনি কনের শুভাশুভ বিচার করা হয়। দাম্পত্য জীবন সুখের হবে কিনা—নতুন বউ সংসারের পক্ষে শুভ কিনা—বিয়ের আগে ওঝাকে দিয়ে তা পরীক্ষা করানো হয়। একটি মুরগি হত্যা করে তার হৃদয় পরীক্ষা করে ওঝা বলে দেয়—বর-কনের হৃদয়ের মিল হবে কি

হবেনা। অনেক সময় 'মুরগির হৃদয়' মিলনে সাড়া দেয় না। সে ক্ষেত্রে নিদা বানচাল হয়ে যায়। যদিও ওঝা নানাভাবে নিদা নিয়ন্ত্রক-দেবতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে, নতুন কনে স্বামীর একক সোহাগিনী হয় না। তার আগে তিন-চার এমন কি পাঁচ সোহাগিনী হয়ত স্বামীকে দখল করে রেখেছে।

হিলমিরিরা বহু বিবাহে বিশ্বাসী। তাদের নিকটতম প্রতিবেশী নিশি বা ডাফলাদের মত তারাও বিবাহবিলাসী। একাধিক স্ত্রী হচ্ছে সমাজে সম্মানের মাপকাঠি। কনেপণের লোভে অনেক সময় মেয়ের পিতা তার সপ্তদশী কন্যাকে পঞ্চাশোর্ধ পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেয়।

হিলমিরির অপর প্রতিবেশী গ্যালং সমাজে 'দ্রৌপদী'-প্রথা এখনও প্রচলিত। চার-পাঁচ ভাই মিলে একটি মেয়েকে বিয়ে করে। হিলমিরির মধ্যে ঠিক এই প্রথা না থাকলেও পর্বতিয়া রমণীকে স্বামীর অবিবাহিত ভাইদের যৌন-যন্ত্রের ভূমিকা পালন করতে হয়। এই প্রথা সমাজসিদ্ধ। এটা নিয়ম তাই প্রতিবাদ অনুপস্থিত। গার্হস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে হিলমিরিরা তাদের মেয়েদের মন ঠিক এমনিভাবেই তৈরি করে দেয়।

স্বামীর অন্য অবিবাহিত ভাইয়ের ঔরসে কারও যদি জন্ম হয়—হিলমিরি সমাজ তাকে অবৈধ মনে করে না। সকলেই বিবাহিত স্বামীর সন্তান বলে স্বীকৃতি পায়।

আর্থিক অবস্থা সব সময় সমান থাকে না। আর্থিক অনটন এবং দৈহিক অসুস্থতা অনেক সময় বহু-স্ত্রী প্রতিপালনে অনেককে অক্ষম করে তোলে। সেক্ষেত্রে নিজের স্ত্রীকে অবিবাহিত ভাই বা নিকট আত্মীয়কে উপহার দেয়। এই উপঢৌকন সৎ ছেলেকে দিতেও কোনো সামাজিক বাধা নেই।

নগর-সভ্য মানুষের কাছে হিলমিরিদের এই সমাজ ব্যবস্থা অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব মনে হতে পারে কিন্তু সুবনসিরি জেলার দুর্গম অঞ্চলে রাগা-মাগা-পেরি গ্রামে এই ব্যবস্থা স্মরণাতীত কাল থেকেই চলে আসছে।

সভ্যতা গড়িয়ে গড়িয়ে এখন প্রায় তাদের ঘরের কাছে পৌঁছে গেছে। নগর-সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিল বা পর্বতিয়া মিরিদের জীবন-জীবিকা ও জৈবিক চেতনার পরিবর্তন হচ্ছে।

দু-একজন করে বেশ কয়েকজন এখন জিরো-দোপারিজোর পাকা সড়ক ধরে জেলার সদর শহরে পৌঁছে গেছে। দু-চারজন ব্যবসার খাতিরে শহরেই থাকছে। তবুও হিলমিরি রমণীর জীবনে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি। এখনও তারা সেই ভাগ্যের হাতে বন্দিনী।

৫

তাঙ্গাম

আজ অগ্নিপরীক্ষার কথা শুনুন।

—অগ্নিপরীক্ষা? কার অগ্নিপরীক্ষা? কিসের অগ্নিপরীক্ষা?

নামচুমের চোখে মুখে রহস্যের হাসি খেলে যায়। তিনি জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ইন্দ্রজিৎ নামচুমের স্বভাব এই রকম। হঠাৎ অদ্ভুত কথা ব'লে, মানুষকে অহেতুক কৌতুহলী করে তোলেন। নামচুম লেখক নন-শিল্পীও নন। তিনি নামডাফা জীবপরিমণ্ডলের একজন অফিসার। নোয়াডিহিং- এর ধারে নামডাফা জীবপরিমণ্ডল। বনে বনে ঘুরে বেড়ানোই তাঁর কাজ। শত কাজের মধ্যেও অরুণাচলের আদিদের তথ্য অনুসন্ধান করতে তিনি ভালবাসেন।

—ত্রেতা যুগে সীতা অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতেও তাঙ্গাম রমণীদের কখনও সখনও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়।

—সে কি? এখনও এসব আছে না কি?

নামচুম বলেন, জানেন তো, পুরনো অভ্যেস সহজে মরে না। তাই কালে ভদ্রে তাঙ্গাম বধূরা অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তাঙ্গাম আদি বা অবর গোষ্ঠীভুক্ত একটি ছোট সম্প্রদায়। সিয়াং জেলার আবরোকা পর্বতশ্রেণীর উপত্যকায় প্রায় দুর্গম গ্রামের অধিবাসী। নিগং খাম্পাদের ভাষায় ইয়াং সাঙ চু নদীর ধারে তাঙ্গামরা থাকে। অরুণাচলের বৃহৎগোষ্ঠী আদিদের নিয়ে নৃ-তাত্ত্বিকেরা অনেক কাজ করেছেন। তাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অনেক তথ্য উদ্ধার করলেও তাঙ্গামদের নিয়ে বড় একটা ভাবনা-চিন্তা কেউ করেননি। সংখ্যায় তারা খুবই অল্প। আট দশটি গ্রাম মিলিয়ে শ'তিনেক লোক। আবরোকার দুর্গম অঞ্চলে বাস করে বলেই হয়ত তারা এখনও নগর সভ্যতায় পৌঁছাতে পারেনি অথবা দুর্গমতা

অতিক্রম করে নগর সভ্যতা তাদের কাছে যেতে পারেনি। ত্রেতাযুগের অগ্নিপরীক্ষা হয়ত সেই কারণেই তাঙ্গাম সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

কেবাং (গ্রাম পঞ্চায়েত) যে সব বিচার করে উঠতে পারে না বা বাদী-বিবাদী কেবাং-এর বিচারে সন্তুষ্ট হতে পারে না, কেবলমাত্র সেই সব মামলা অলৌকিক পদ্ধতিতে সমাধান করা হয়। অগ্নিপরীক্ষা তারই একটা অঙ্গ।

নোয়াডিহিং-এর ধারে ডাকবাংলোয় বসে গল্প শোনাচ্ছিলেন তিনি। রাতের নামডাফার অভয়ারণ্য জন্তু-জানোয়ারের চিৎকারে কেমন যেন ভয়াল হয়ে ওঠে। গভীর বনে নিরন্তর একটা শোঁ শোঁ শব্দ। ঢেউয়ে ঢেউয়ে নোয়াডিহিং কল্লোলিত। কবে কোন্ অতীতকাল থেকে একসুরে একভাবে গান গেয়ে চলেছে সে। নামচুম বলেন, সিয়াং জেলার আবরোকা পর্বতশ্রেণীর ধারে কাছে অনেক হ্রদ আছে।

চোখে বিরক্তি নিয়ে নামচুমের মুখের দিকে তাকাই। তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। বরং তাঁর মুখে এক চিলতে রহস্যের হাসি ফুটে ওঠে। তিনি নীরবে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কোথায় অগ্নিপরীক্ষা—আর কোথায় হ্রদ। এক জায়গায় আগুন আর এক জায়গায় জল। নামচুম আগুন আর জল পাশাপাশি রেখে কাহিনীকে কোন্ দিকে নিতে চান!

—নামচুম বলেন, অগ্নিপরীক্ষায় পৌঁছাতে হ্রদের ধারেই যেতে হবে। হ্রদ অতিক্রম না করলে অগ্নিপরীক্ষার খবর পাওয়া যায় না। তার আগে তাঙ্গামদের এলাকার ভৌগলিক বিবরণ জানা দরকার। জলবায়ু আর পথঘাটের সঙ্গে পরিচিত না হলে তাদের সম্পর্কে আপনার ধারণা অস্পষ্ট থেকে যাবে।

নভেম্বরে নোয়াডিহিং-এ প্রচণ্ড শীত। পাটকেই হিলের দিকে পেঁজা তুলোর মত তুষার। নোয়াডিহিং আপন মনে ঢেউ তুলে বয়ে তুলেছে। টিটাপোরি পাহাড়ের পাদদেশে পাঁচটি প্রাকৃতিক হ্রদ পাশাপাশি। টিটোপোরি প্রায় চোদ্দ হাজার ফিট উঁচু। গম্বুজাকৃতি শিখর ঘন বরফে ঢাকা। তাঙ্গামদের প্রতিবেশী খাম্পারা মনে করে, এখানে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা বাস করে। তাই তারা বছরে একদিন পাহাড় পরিক্রমা করে। কিন্তু তাঙ্গামেরা এই পাহাড়কে বড় ভয় পায়। সর্বদা পাহাড়কে এড়িয়ে চলে। টিটোপোরি পাহাড়ের পাদদেশে পরপর সাজানো পাঁচটি হ্রদ। তার জন্যই অরুণাচলীরা বলে পঞ্চহ্রদের দেশ। পাঞ্জাবে আছে পঞ্চনদী। টিটোপোরিতে পঞ্চহ্রদ। স্ফটিকের মত জল। টলটল করছে। হ্রদগুলির কিছু ভাগ বরফে ঢাকা। নামচুম বলেন, এই হ্রদগুলিতে একটাও মাছ নেই। এমন কী একটা কীটপতঙ্গও খুঁজে পাবেন না।

—ভারি আশ্চর্য তো! জল আছে, অথচ জলজ প্রাণী নেই! নামচুম বলেন, নিগং বা ইয়াং স্যাঙ চু-র উৎসস্থল কিন্তু আবরোকা পাহাড়ে ছোট একটি হ্রদ থেকে। আরও একটা বিশাল হ্রদ রয়েছে কেতাক পর্বতের কাছে। হ্রদটি এত বড় যে, খাম্পাদের এই হ্রদ পরিক্রমা করতে সারাদিন লেগে যায়।

নিগংকে সামনে রেখে চূড়া উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যে পাহাড় তার নাম—পেমি লেতুঙ বা রিউ তালাঙ। খাম্পাদের কাছে পবিত্র দেবতা। ওরা এই পাহাড়ের নাম দিয়েছে—চণ্ডো ফাড়ি।

—আমাদের চণ্ডী থেকে খাম্পাদের চণ্ডোর জন্ম হয়নি তো? প্রশ্নটা মনে ঘুরপাক খায়।

বছর কয়েক আগেও খাম্পারা পবিত্র পাহাড় পরিক্রমা করত। কিন্তু আজকাল আর করতে পারে না। সিমংরা ওদের যেতে দেয় না। ওই পাহাড়ে নাকি কস্তুরী মৃগ আছে। তাদের অবস্থানের কথা খাম্পারা জানে। সিমংরা মনে করে, পরিক্রমার নামে খাম্পারা কস্তুরী সংগ্রহ করে।

—একটু থেমে ইন্দ্রজিৎ বলেন, তাঙ্গামদের কাছে পৌঁছাতে হলে আপনাকে এসব অতিক্রম করতেই হবে। আমরা এখন তাঙ্গামদের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি।

সিয়াং জেলার দুর্গম অঞ্চলের তিন-চারটে গ্রামে তাঙ্গামরা বসবাস করে। ছয়ের দশকে তাঙ্গামদের সংখ্যা ছিল দুই থেকে তিনশ'-র মধ্যে। এখন সম্ভবত কিছু বেড়েছে। ময়ুম, নাইরিং আর কুগিং—এই তিন গ্রামের অধিবাসী তাঙ্গাম। ওরা স্বল্প পরিচিত। মেম্বা, খাম্পা আর সিমংরা তাঙ্গামদের প্রতিবেশী। নামচুম বলেন, তাঙ্গামদের সংখ্যা এত কম কেন, জানেন?

—আমি চুপ করে থেকে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করি।

নামচুম বলেন, কোনও এক কালে তাঙ্গামদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু-হাজার। কিন্তু সিমংদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঙ্গামেরা প্রায় নির্বংশ হয়ে যায়।

—কেন? যুদ্ধ কেন?

নামচুম বলেন, সেও এক সীতার কাহিনী।

—মানে কেউ কি কারও স্ত্রীকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল?

নামচুম বলেন, না। কিংবদন্তি বলে, তাঙ্গামদের কোনও এক বাগদত্তাকে নিয়ে সিমংদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছিল। পরাজিত তাঙ্গামেরা পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে রাশিং নামক এক জায়গায় পালিয়ে গিয়েছিল। নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, ময়ুম, নাইরিং আর কুগিং-এর তাঙ্গামেরা সেই পলাতক গোষ্ঠীর উত্তরসূরি।

বড় কষ্টের জীবন তাঙ্গামদের। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে ওরা বেঁচে আছে। আবরোকা পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে প্রায় বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সরু ঢালু জায়গায় সীমাবদ্ধ চাষবাস করে। অথচ নিগং-এর সুন্দর উপত্যকা একদিন ওদের অধিকারে ছিল। সিমংরা সেই উর্বর উপত্যকা তাঙ্গামদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেয়। অ্যাকোনাইটের ব্যবসা না থাকলে তাঙ্গামেরা হয়ত পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেত।

অ্যাকোনাইট! ওটা তো বিষ!

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। তাঙ্গামেরা এই বিষের ব্যবসা করে। ধরতে গেলে তাঙ্গামদের বিষভিত্তিক অর্থনীতি। অ্যাকোনাইট একটি মারাত্মক বিষ। রক্তের সঙ্গে মিশলে মৃত্যু অবধারিত। কিছুটা তুলো গাছের মতো দেখতে। চাষের দরকার হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মেই আবরোকা পাহাড়ের ঢালে অজস্র অ্যাকোনাইট জন্মায়। তাঙ্গামেরা এই গাছ সংগ্রহ করে। এর শিকড় দিয়ে তৈরি করে বিষ। তীরের মাথায় বিষ মাখিয়ে শিকার করে।

যেহেতু তাদের অঞ্চলে অ্যাকোনাইট জন্মায় এবং তারা বিষ তৈরিতে সিদ্ধহস্ত তাই, এই বিষের ব্যবসা তাদের প্রায় একচেটিয়া। শুধু তাদের প্রতিবেশী খাম্পা বা সিমংরা নয়—অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায় ও শিকারের জন্য তাঙ্গামদের কাছ থেকে অ্যাকোনাইটের বিষ সংগ্রহ করে।

অ্যাকোনাইটের শিকড় সংগ্রহ করতে তাঙ্গামেরা অনেক সংস্কার মানে। তারা পরাঙ পরো বা আমাদের অক্টোবর মাসে দল বেঁধে অ্যাকোনাইট সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ে। ঠিক যেন একটি অভিযান। দিন তারিখ নির্ধারণ করে সারা গ্রামে জানান দেয়। অভিজ্ঞ লোকের নেতৃত্বে অ্যাকোনাইট সংগ্রহের অভিযান চলে।

অনভিজ্ঞদের আনাড়ির মত অ্যাকোনাইট তুলতে দেওয়া হয় না। কোন্ গাছটি কী ভাবে তুলতে হবে—তা অনভিজ্ঞদের শিখিয়ে দেওয়া হয়। পাহাড় থেকে অ্যাকোনাইট তুলে আবার দল বেঁধে ফিরে আসে। সাধারণত সব অ্যাকোনাইটের গাছ ব্যাঙ্গো বা সামুদায়িক হলে রাখা হয়।

স্বভাবসিদ্ধ রহস্যময় হাসি হেসে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন ইন্দ্রজিৎ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কোনও কোনও তাঙ্গাম রমণী অগ্নিপরীক্ষার ভয়ে অ্যাকোনাইট-এর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। কেউ যদি অ্যাকোনাইট খায় অথবা অসাবধানতাবশত খাবারের সঙ্গে মিশে যায়—তাঙ্গামেরা নিজেদের পদ্ধতিতে তার চিকিৎসা করে। সে এক ভয়ঙ্কর চিকিৎসা। বিষক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার চিকিৎসা শুরু করতে হয়। ওষুধ কি জানেন? প্রশ্ন করেই থামেন নামচুম। উত্তরের আশায় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেই হয়। ধৈর্যের প্রান্ত সীমায় পৌঁছোবার মুহূর্তে নামচুম বলেন, মানুষের বিষ্ঠা।

—বিষ্ঠা?

—হ্যাঁ। বিষ্ঠার সঙ্গে 'তাগেদ' গাছের ছাল গুঁড়ো করে মিশিয়ে একরকম পেস্ট তৈরি করা হয়। সেই পেস্ট রোগীকে গলাধঃকরণ করানো হয়। তারপর রোগীর হাত-পা ধরে বন বন করে কয়েক পাক ঘোরানো হয়। রোগী ভগ্ ভগ্ করে বমি করতে শুরু করে। যার বিষক্রিয়া কম থাকে কপালগুণে সে বেঁচে ওঠে। বাকিরা বেশির ভাগই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যদি ক্ষতস্থান দিয়ে অ্যাকোনাইট রক্তের সঙ্গে মেশে, তার চিকিৎসা আলাদা। ঘরে তৈরি মিলেটের অপাং বা মদ ও সামান্য আদা কেটে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়। এক্ষেত্রেও

কেউ বাঁচে—কেউ বাঁচে না। তাই তাঙ্গামেরা অ্যাকোনাইট তৈরির সময় নানা সংস্কার খুব সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলে। তীরের মাথায় অ্যাকোনাইট মিশিয়ে অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে রেখে দেয়।

অ্যাকোনাইট যেমন মৃত্যুর কারণ—তেমনি তাদের জীবিকার উপকরণ। নামচুম বলেন, নিশ্চয়ই অগ্নিপরীক্ষার কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন? আগে জীবন তারপর তো অগ্নিপরীক্ষা।

বিংশ শতাব্দীতে অগ্নিপরীক্ষা, এমন গল্প কে না শুনতে চায়। সে কথা শুনতে হলে নামচুমের মর্জির উপর নির্ভর করতেই হবে। ঠিক সময়ে নামচুম অগ্নিপরীক্ষার কাহিনী শোনাবেন। তার আগে তাঙ্গামদের ঘর, সংসার, সমাজ আর আচার আচরণের কথা শুনতে হবে।

তাঙ্গামদের সংখ্যা কমছে। বরং বলা যায় তাদের গোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে না। স্মরণকালেও তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু-হাজার। সিয়াংয়ের বিস্তীর্ণ উপত্যকা জুড়ে তাদের প্রায় পঁচিশটি গ্রাম ছিল। এখন সে সব গ্রাম সিমং, খাম্পা আর মেম্বাদের দখলে চলে গেছে। গোটা তিনেক গ্রামে মাত্র শ'দুই-তিন তাঙ্গাম নিজেদের অস্তিত্বকে কোনও রকমে টিকিয়ে রেখেছে। সিমংদের সঙ্গে যুদ্ধে বার বার হেরে গেছে। এই যুদ্ধেই উর্বরা উপত্যকা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

সমগোত্রীয় বিবাহ তাঙ্গামদের সংখ্যা কমে যাবার অন্যতম কারণ বলে নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। সমগোত্রীয় বিবাহের ফলে এই উপজাতির জন্ম দেবার ক্ষমতা কমে এসেছে। ছোট পরিবারের ধারা সারা দেশে চালু করার যে চেষ্টা চলেছে—নানা কারণে তাঙ্গামদের মধ্যে তা অনেক আগেই চালু হয়ে গেছে। দুটির বেশি সন্তান কোনও তাঙ্গাম পরিবারে দেখা যায় না। এই অবস্থা চলতে থাকলে, আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই এই আদি গোষ্ঠী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

ওরা এখন বিপন্ন উপজাতি। ঠিক গ্রেট আন্দামানিজদের মত। অবশ্য সম্প্রতি ওদের মনোভাবের সামান্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সংখ্যায় কম হলেও খাম্পাদের সঙ্গে বিয়ে-থা হচ্ছে। একমাত্র ভিন্ন গোষ্ঠীয় রক্তের মিশ্রণে এই উপজাতি বেঁচে থাকতে পারে। তাঙ্গাম পুরুষদের একাধিক স্ত্রী রাখাও যেমন দোষের নয়, তেমনি কিছু কিছু তাঙ্গাম রমণীর দ্রৌপদীর ভূমিকা পালন করাও অপরাধ নয়।

—গ্যালং রমণীদের তো অরুণাচলের দ্রৌপদী বলা হয়!

নামচুম বলেন, ঠিক। গ্যালংদের মধ্যে এটা প্রথা আর তাঙ্গামদের মধ্যে একটা বিরল ঘটনা। সন্তান না হলে তারা এই পথে যায়। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে স্বামী বা স্ত্রীর অক্ষমতা প্রমাণিত হয়। সন্তান লাভের জন্যই কোনও কোনও তাঙ্গাম রমণীকে মাঝে মাঝে দ্রৌপদী হতে হয়। তাদের সমাজ সেই সব সন্তানকে অবশ্যই বৈধ বলে স্বীকার করে।

তাঙ্গাঁমদের ব্যাঙ্গো আছে কিন্তু রাশেং নেই। ব্যাঙ্গো ও রাশেং-এর কথা অনেক আগেই শুনেছি। শব্দ দুটি আমার কাছে খুবই পরিচিত। ব্যাঙ্গো হল যুব আবাস আর রাশেংকে বলা যেতে পারে কুমারী-নিলয়। অরুণাচলের অন্যান্য উপজাতির মত তাঙ্গামদের রাশেং খুব কার্যকর নয়। রাতে সেখানে কোনও মেয়ে থাকে না। দিনের বেলায় হাতের কাজের প্রশিক্ষণের জন্য কিছু সময় কাটায়। কিন্তু ব্যাঙ্গো সর্বদাই কোলাহল-মুখর। কাজের শেষে সব পুরুষই কিছুক্ষণের জন্য ব্যাঙ্গোতে আসে। সেখানে গল্প গুজব ছাড়াও গান, বাজনা ও নাচ হয়। অনেক সময় বয়স্করা উঠতি বয়সীদের সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার শিক্ষা দেয়।

রাশেং না থাকলেও ছেলে মেয়েদের প্রেম থেমে থাকে না। তবে প্রেমজ বিবাহ তাঙ্গাম সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই কম। সংখ্যাল্পতার জন্য প্রেমও সীমিত। বিয়ে সাধারণত যোগাযোগ করেই হয়। বরের বাবা বিয়ের জন্য অগ্রণী ভূমিকা নেয়। কনে দেখার সময় তাকে কিছু উপঢৌকনও দিতে হয়।

নামচুম বলেন, তাঙ্গামদের প্রথানুযায়ী বরকে বেশ কিছুদিন ভাবী শ্বশুরবাড়িতে শিক্ষার্থী হিসাবে থাকতে হয়।

—শিক্ষার্থী! বিয়ের আগে শ্বশুর ঘরে কিসের শিক্ষা নেয়?

নামচুম বলেন, ছেলেকে উপযুক্ত করে তোলার জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থা।

—এই সময়ে কি সে কনের কাছে যেতে পারে?

—অবশ্যই। শিক্ষানবিশীর সময়ে দু-জনের মনের আদান প্রদান ঘটে। পরস্পর পরস্পরকে চেনে জানে। বিয়ের আগে সহবাস তাঙ্গাম সমাজে নিষিদ্ধ নয়। প্রকৃতিদত্ত আবেগকে তারা সমাজের রশি দিয়ে বেঁধে রাখে না। তাঙ্গামেরা এই সময়কে বলে, মাবোগিরা। উপযুক্ত হবার পর ছেলের বাবা, মাছ , মাংস, চাল আর দু-বোতল অপাং (মদ) নিয়ে মেয়ের সঙ্গে দেখা করে। মেয়ে যদি বিয়েতে রাজি হয়, তাহলে ছেলের বাবার উপহার গ্রহণ করে। এবং ছেলের অভিভাবক প্রদত্ত উপহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিতরণ করে। আর যদি. . . . . নামচুম থামেন। কৌতূহলের চূড়ায় তুলে দিয়ে সহজেই সরে পড়তে পারেন।

—আর যদি?

অপাং-এ চুমুক দিয়ে নামচুম মৃদু হেসে বলেন, মেয়ে যদি অমত করে তাহলে. . .।

—তাহলে উপহার ফিরিয়ে দেবে, তাই তো? কিন্তু বছর দুই ঘর করার পর অমতই বা করবে কেন?

নামচুম বলেন, সবাই করে না। কেউ কেউ করে। আর করলে তাঙ্গামদের সমাজে তাকে মত করানো বিধান আছে। যদি কোনও মেয়ে নির্দিষ্ট ছেলেকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজি না হয় অথবা অভিভাবকেরা যদি মনে করেন মেয়ে এই বিয়েতে সুখী হবে না, তখন তারা মেয়ের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য অদৃশ্য ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি শূকর

উৎসর্গ করে।

ব্যস! শূকর উৎসর্গ করলেই কি মেয়ের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে যাবে?

মাঝে মাঝে উৎসর্গ ব্যর্থ হয় বৈকি। তবে সেক্ষেত্রে মেয়ে নির্ধারিত পাত্রকে বিয়ে করে না। চাপে পড়ে কেউ করলে, কোনও এক সময়, পিতৃগৃহে ফিরে আসতেই হয়। অবশ্য মেয়ের বাবা তার জন্য ছেলের বাবাকে ক্ষতিপূরণ দেয়।

অরুণাচলের আদি সমাজে বধূ নির্যাতন খুবই বিরল ঘটনা। ধর্ষণের ঘটনাও বড় একটা শোনা যায় না। তাঙ্গাম সমাজে বধূ নির্যাতনের ঘটনা-কম হলেও মাঝে মাঝে ঘটে। শ্বশুর-শাশুড়ির নির্যাতনে অনেক সময় মেয়ে বাবার বাড়ি চলে যায়। এক্ষেত্রে ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে ক্ষতিপূরণ দেয়।

নামচুম মনে করিয়ে দেন, বধূ নির্যাতন আদৌ প্রাত্যহিক ঘটনা নয়। অনেক সময় মেয়ের রূঢ় ব্যবহার ও সংস্কার পরিপন্থী কাজের জন্যেও এসব ঘটে থাকে। সতীত্বের উপর সন্দেহও নির্যাতনের অন্যতম কারণ। অবশ্য সন্দেহ নিরসনের জন্য তারা কেবাং-এর দ্বারস্থ হয়। কেবাং ব্যর্থ হলে অগ্নিপরীক্ষার প্রশ্ন ওঠে।

অনেকক্ষণ পর নামচুম অগ্নিপরীক্ষায় ফিরে আসেন। এই অগ্নিপরীক্ষার কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।

নামচুম বলেন, নির্যাতনের তালিকা আদৌ বড় নয়। হয়ত এক দশকে একটা ঘটনা ঘটে। তাঙ্গামেরা নারীকে সম্পদ ও সম্পত্তি ভাবে। অন্দর মহলের কর্তৃত্বে পুরুষেরা কোনওদিন মাথা ঘামায় না। তেমনি মেয়েরাও ছেলেদের কোনও ব্যাপারে নাক গলানো পছন্দ করে না।

কোনও তাঙ্গাম রমণী স্বামীর মৃত্যুর পর পিতৃগৃহে ফিরে যায় না। স্বামীর গৃহে সম্পদ হয়ে থাকে। কোনও কারণে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে বনিবনা না হলে মেয়ের বাবা বা ভাই, স্বামীর উঠানেই নিজেদের খরচে আলাদা ঘর তৈরি করে দেয়।

তাঙ্গামেরা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী। সব কিছুর মধ্যেই তারা অলৌকিক শক্তির প্রভাব দেখতে পায়। তাই সেই শক্তিকে সর্বদা খুশি রাখার চেষ্টা করে। যে অলৌকিক শক্তি মেয়েদের অনুর্বরা করে তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে তাঙ্গাম কন্যারা ছোটবেলা থেকেই তার পূজা করে। ওই শক্তিকে তাঙ্গামেরা বলে, ইউ-গিয়োনিঙ।

নামচুম বলেন, গিয়োনিঙ পুজোর উপকরণ কি জানেন? মেয়েরা তাদের 'আবে' বা পেটিকোটের একটা অংশ আপুন বা গামলার মধ্যে রেখে তার মধ্যে কিছু অপাং ঢেলে দেয়। কয়েক টুকরো আদাও দেওয়া হয়। একটি কলা, একটি কালো কুকুর অথবা কালো মুরগি গিয়োনিঙের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। যে অঞ্চল থেকে কলা সংগৃহীত করা হয়-কোনও মেয়ে এক বছর সেই অঞ্চলের কোনও ফলমূল খায় না।

উর্বরা শক্তির দেবতার নাম 'নাইত'। এই নাইতকেও তাঙ্গাম রমণীরা সর্বদা খুশি রাখে। 'নিপং' নামে একটি অলৌকিক দেবীকে তাঙ্গামেরা ভীষণ ভয় করে। এই দেবী

সর্বদাই মেয়েদের ক্ষতি করে। সুযোগ পেলে পুরুষকেও ছাড়ে না। নিপং আক্রান্ত নারী ও পুরুষের মৃত্যু ঠেকানো বড় কঠিন।

নামচুম বলেন, একটু ধৈর্য ধরুন। তাঙ্গাম ছেলেমেয়ের প্রেমের কথা বলেই অগ্নিপরীক্ষার কাহিনী শোনাব। প্রেমের কথা শুনতে কার না কৌতূহল হয়। শোনার জন্য চুপ করে থাকতেই হয়।

তাঙ্গাম যুবক যুবতীদের মেলামেশার মধ্যে কোনও বিধি নিষেধ নেই। ওরা খোলাখুলি মেশে। মেশামেশির সময় পদস্খলন যে ঘটে না তা নয়। কুমারী জীবনেও কেউ কেউ মা হয়ে যায় বৈকি। সেক্ষেত্রে ছেলেটি মেয়েটিকে বিয়ে না করলেও সন্তান অবৈধ হয় না।

নামচুম গম্বুজাকৃতি তুষারাবৃত আবরোকা পাহাড়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। এক সময় আপন মনে বলে ওঠেন, ডাক্‌কাহিরা।

—ডাক্‌কাহিরা কি?

নামচুম বলেন, অগ্নিপরীক্ষার তাঙ্গাম প্রতিশব্দ ডাক্‌কাহিরা শুধু সতীত্ব পরীক্ষার জন্য নয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অপরাধীকে শনাক্ত করার অলৌকিক ব্যবস্থা। কেবাং যে বিচার করতে ব্যর্থ হয় অথবা যদি কোনও পক্ষ কেবাং-এর রায় না মানে তখনই ডাক্‌কাহিরার সাহায্য নেওয়া হয়। নামচুম বলেন, কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, খোলামেলা সামাজিক ব্যবস্থায় মেয়েদের বিশ্বস্ততার প্রশ্ন ওঠে কেমন করে? তাঙ্গাম রমণীরা বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। কুমারী জীবনে সঙ্গম যেমন কলঙ্ক বলে মনে করে না—তেমনি বিয়ের পর স্বামীর প্রতি আনুগত্যও ভঙ্গ করে না। কেউ যদি করে, তার প্রমাণের জন্য ডাক্‌কাহিরার ব্যবস্থা করা হয়। কেবাং একটা গণ্ডী এঁকে দেয়। গণ্ডীর মাঝখানে দাঁড় করানো হয় সন্দেহজনক স্ত্রীকে। তার দু-হাতের তালুতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হয়। ওই জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নিয়ে তাকে সাতবার গণ্ডী পরিক্রমা করতে হয়। হাতে যদি ফোস্কা পড়ে তাহলে তাকে অসতী বলে চিহ্নিত করা হয়।

সে কি! জ্বলন্ত অঙ্গারে ফোস্কা তো পড়বেই। দোষী, নির্দোষ কেউই আগুন থেকে রক্ষা পায় না—পেতে পারে না।

নামচুম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, এমন ঘটনা ঘটলে, কোনও মেয়েই ডাক্‌কাহিরার মুখোমুখি হয় না। তার আগেই অ্যাকোনাইটের বিষ খেয়ে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়।

৬

আকা

তিরাপ থেকে তাওয়াং পর্যন্ত তো ঘোরা হল। বলুন তো, অরুণাচলের কোন্ উপজাতি-রমণী মুখে উল্কি আঁকে? নামচুমের আকস্মিক প্রশ্নে হোঁচট খেতে হয়। প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে ইন্দ্রজিৎ নামচুম জানালা দিয়ে পাহাড়ের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে ধরেন।

মন হাতড়াতে থাকি। স্মৃতির পর্দায় নানা উপজাতি-রমণীর আনাগোনা শুরু হয়। কিন্তু কারও মুখে উল্কি দেখতে পাই না।

পারলেন না তো? পারবেন কী করে? আপনার তো তাদের সাথে দেখা হয়নি! স্বাভাবিকভাবেই মুখ থেকে প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, তারা কারা?

উপজাতিদের কাহিনী বলার আগে, সর্বদাই কিছু ভনিতা আর ভূমিকা করেন ইন্দ্রজিৎ নামচুম।

—কাদের কথা বলছেন?

এবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনেন নামচুম। বলেন, আমি আকাদের কথা বলছি। আকা রমণীরাই মুখে চিরস্থায়ী উল্কি কাটে।

—শরীর থাকতে মুখে কেন?

নামচুম বলেন, মুখে উল্কি কাটে বলেই—অসমের সমতলীরা ওদের নাম দিয়েছে আকা। অর্থাৎ চিত্র। নিজের মুখকে চিত্রিত করে।

নামচুম বলেন, আকারা মুখে উল্কি কাটে নিজেদের সৌন্দর্য বাড়াতে।

—উল্কি কাটা তো বেশ যন্ত্রণাদায়ক।

নামচুম বলেন, অবশ্যই। নিজের মুখকে সুশ্রী করার জন্যে এটুকু যন্ত্রণা তারা সহ্য করে।

কামেং জেলার অধিবাসী আকা। ওরা নিজেরা বলে, হ্রুসো। দুটি মূল ধারায় বিভক্ত। তাদের একটি উপধারাও রয়েছে। সেই উপধারাকে বলা হয় আকা-মিরি। পাশাপাশি বসবাস। সাধারণত অরুণাচলের উপজাতির মধ্যে সম্প্রদায় বহির্ভূত বিয়ে হয় না। হ্রুসো আর মিরির মধ্যে বিয়ের প্রথা প্রচলিত আছে। এই দুয়ের মিলনে যাদের জন্ম, তাদেরই বলা হয় আকা-মিরি। অবশ্য আকা রীতি-নীতি ও সমাজ ব্যবস্থা আকা-মিরির মধ্যেও প্রচলিত। মূলধারায় যারা রয়েছে তাদের বলা হয় কাটসুন আর কোভাটসুন। এই উপজাতির আরও দুটি অদ্ভুত নাম আছে। হাজারি-খাওয়া ও কাপাসচোর।

কাপাসচোর! কেন, ওরা কি কাপাস চুরি করত নাকি?

নামচুম বলেন, শব্দটির মধ্যে যথার্থই সত্য আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক, এমন কী দ্বিতীয়, তৃতীয় দশকেও অসমের সমতল থেকে কাপাসতুলো চুরি করত!

—আর হাজারিখাওয়া!

শব্দটি কেন যে ওদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা আমি ভাল করে অনুসন্ধান করতে পারিনি।

নাহারলগুনের রাস্তা প্রায় জনশূন্য। শীতের খুব একটা দাপট না থাকলেও হিমালয়-ধৌত হিমেল হাওয়া বিরামহীন। গায়ে একটা চাঁদর জড়িয়ে রাখতেই হয়।

নামচুম বলেন, আকা রমণীরা মোটেই অ-সুন্দরী নয়। গায়ের রং যথেষ্ট ফর্সা। নারী ও পুরুষ উভয়ের টান-টান স্বাস্থ্য। মাথায় কালো চুল। মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের নাক—একটু চ্যাপ্টা।

আকাদের আদি ইতিহাস এখনও জানা যায়নি। তবে তারা যে অন্য কোনও এক স্থান থেকে অরুণাচলে এসেছিল সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই।

অন্য উপজাতির তুলনায় তারা অনেকটা আধুনিক।

—আধুনিক হলে যন্ত্রণা সহ্য করে মুখে উল্কি কাটে কেন?

নামচুম বলেন, আধুনিকতার সঙ্গে উল্কি কাটার কোনও সম্পর্ক নেই। এটা বংশানুক্রমিক রীতি। তাদের সমাজে বহু যুগ থেকেই উল্কি কাটার প্রথা চলে আসছে। প্রাচীন রীতি ভাঙা খুব কঠিন। এটা শুধু আদিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়—অন্য উপজাতি সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য। আকা উপজাতি মেয়েদের অল্প বয়সেই মুখে উল্কি কেটে দেওয়া হয়। দশ না পেরোতেই জন্মগত মুখশ্রী নিজেদের ইচ্ছামত চিত্রিত করে নেয়। নামচুম বলেন, কী দিয়ে আর কেমন করে উল্কি কাটে জানেন?

অরুণাচলের গভীর অরণ্যে নানা রকম কাঁটা গাছ আর গুল্ম জন্মায়। বড় সরু ছুঁচালো কাঁটা। সূঁচের চেয়েও সূক্ষ্ম। আর পাওয়া যায় রজন গাছের একরমক কষ।

কাঁটা ফুটিয়ে ফুটিয়ে মুখে উল্কি আঁকে। কেউ আঁকে ফুল, কারো বা কপাল থেকে কপোল পর্যন্ত উড়ন্ত পাখি। কারো বা পছন্দ লতা-পাতা

—ঘা হয় না?

—হয়। তবে মারাত্মক কিছু না। তাড়াতাড়ি শুকাবার জন্য বনৌষধি আছে।

মুখ চিত্রিত করতে কোনও পূজা-পার্বনের প্রয়োজন হয় না। দিনকয়েক পর চিত্রিত মুখ নিয়ে মেয়েরা গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা করে। চিত্রকরের চিত্রজ্ঞানের অনুপুঙ্খ পরীক্ষা চলে।

শুকিয়ে যাবার পর, ফর্সা মুখে চিরস্থায়ী নীল কালো ছবি ভেসে ওঠে। উল্কি আঁকার জন্য আকা সম্প্রদায়ের কোনও বিশেষজ্ঞ নেই। নিজেরা মুখ চিত্রিত করার অভিজ্ঞতা নিয়েই জন্মায়। তারা জন্মগত উল্কি-শিল্পী। কাঁটা-রজন আর ঘা শুখাবার বনজ ওষুধ নিজেরাই সংগ্রহ করে। সূর্যের দিকে মুখ করে বসে কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত চিত্রিত করে।

অপাংকে আকারা কী বলে, জানেন? আবার একটা বেমক্কা প্রশ্ন করে আমার সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা নেন নামচুম। নিজেই জবাব দেন। বলেন, আরাহ্। আকারা তিনি রকমের মদ তৈরি করে। যে মদ নারী-পুরুষ, বাল-বাচ্চা একসঙ্গে পান করে, তার নাম-লাউপানি। এটা তাদের সর্বজনীন পানীয়। লাউপানির চেয়ে যা বেশি ঝাঁঝালো, তার নাম-মিলগী।

মদের ইতিহাস শোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকলেও, নামচুম মদের কাহিনী না শুনিয়ে আকাদের জীবনচর্চায় ফিরবেন না। তাঁর মতে মদও উপজাতিদের জীবনের অঙ্গ।

—আর এখন যেটি পান করছি, তার নাম আরাহ্। তৈরি করে মেয়েরা আর পান করে পুরুষ। যে কেউ লাউপানি খেতে পারে কিন্তু কোনও মেয়ের আরাহ্ খেয়ে মাতাল হবার অধিকার নেই।

এখানে একটি কথা বলি ইংরেজদের সঙ্গে আকাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। প্রায়ই এটা-সেটা নিয়ে বিবাদ লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে অসম যুদ্ধে আকারা কখনও পিছু হটেছে, আবার কখনও বা ইংরেজ সৈন্যরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। পরে অবশ্য দু-পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়েছিল।

আকা সুন্দরীরা উল্কি কেটেই শুধু মুখশ্রী সুন্দর করে না, তারা ভীষণ অলঙ্কারপ্রিয় আর পোশাক বিলাসী।

—হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। ইতিহাস থেকে নামচুম আবার জীবন চর্চায় ফিরে এসেছেন।

নানা ধাঁচের আর নানা রকমের অলঙ্কার ব্যবহার করে আকা রমণী। সবই অবশ্য রুপো আর পুঁতির। পোশাকেও তাদের আভিজাত্য আছে। আকা রমণীরা শরীরের কোনও অংশ উন্মুক্ত রাখে না। খাসি মেয়েদের মত গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পোশাক পরে।

অথচ এই দুটি তারা তৈরি করতে জানে না। অসমের দারাং জেলা থেকে অলঙ্কার আর পোশাক আমদানি করে। তাঁতের কাজ যে আকারা জানে না, তা নয়। তারা মোটা রঙিন ব্যাগ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত। সমতলীরা বেশ ভাল দামেই তাদের ব্যাগ কেনে। আকা পুরুষের পোশাকে বিশেষ কোনও আকর্ষণ নেই। সাধারণ 'সোসিউ-জে' আর লম্বা 'পল' হলেই তাদের চলে যায়। মেয়েরাও পল পরে। 'গুডু' পুরুষ ও রমণী উভয়ের দরকার। পা ঢাকা না থাকলে গুবড়ে পোকার মতো বড় বড় মাছি উৎপাত করে। ওই মাছিকে আকারা বলে ডিমড্যাম। উল্কি আঁকা সালঙ্কারা আকা-যুবতী যে কোনও পুরুষের দৃষ্টি নিথর করে দিতে পারে। অরুণাচলের উপজাতি রমণীরা সকলেই কম-বেশি অলঙ্কার প্রিয়। কিন্তু আকা রমণীদের অলঙ্কারবিলাসিনী বললে আদৌ অত্যুক্তি করা হয় না। তারা অলঙ্কার ভালবাসে অথচ তাদের সমাজে কেউ অলঙ্কার তৈরি করতে জানে না। অসমের সমতল থেকে তৈরি করিয়ে আনতে হয়। পুঁতির মালা আর রমবিন গলা থেকে নাভি পর্যন্ত শোভা পায়। কানে থাকে 'গিচ্‌লি'। একটু অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা রুপোর ফিলিগ্রি করা 'লেনচি' (নেকলেস) পরে। গয়নার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পূর্বপুরুষের স্মৃতি আয়েসচেরি। বংশানুক্রমিক কণ্ঠহার। উৎসবের তারতম্য অনুসারে এই আয়েসচেরি কখনও পুরুষ আবার কখনও বা নারীর গলায় শোভা পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হেজেলমেয়ার আকাদের যে সব গয়না পরতে দেখেছেন-একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও সেই সব গহনার বিশেষ কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। —সেই 'অলঙ্কার প্রীতি' সমানভাবে চলেছে। বলেই হো হো করে হেসে ওঠেন নামচুম। গলায় আরও খানিকটা 'আরাহ্' ঢেলে নামচুম বলেন, সেই তখন থেকে গয়না গয়না করে যাচ্ছি। শুধু গয়না আর পোশাকে যে আকা সমাজ সীমাবদ্ধ নয় সে কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

সাজসজ্জায় আকা রমণীর বিশেষত্ব কারও নজর এড়িয়ে যায় না। শুধু চিরস্থায়ী উল্কি কেটে জন্মগত মুখশ্রীর সৌন্দর্য বাড়ায় না, নানা কৃত্রিম উপায়ে ওষ্ঠ রাঙায়। না, শহর থেকে লিপস্টিক কেনে না। প্রকৃতির রাজ্যে ঠোঁট রাঙানো জারক নিজেরাই আবিস্কার করে নিয়েছে। একরকম বন্য পাইন গাছের রস দিয়ে সুন্দর করে ঠোঁট রাঙায়। পাইন জারককে তারা বলে লিঙ্‌চঙ্। শুধু ঠোঁট রাঙাবার জন্য নয়, লিঙ্‌চঙ্ ঘরকে বাহারি করার নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। চৌ-কাঠ, বাঁশের দেয়াল আর কাঠের আসবাবপত্রে তাদের শিল্পী মনের অনেক সাক্ষ্য জড়িয়ে থাকে। বিশেষ করে থুমোনা বা অতিথি কক্ষকে নানা শিল্পকলায় দৃষ্টি মুগ্ধ করে সাজিয়ে রাখে। বাড়ির প্রথম ঘরটিকেই বলা হয় থুমোনা। অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট। অতিথি না থাকলে থুমোনা অন্য কেউ ব্যবহার করে না।

রাজা-রানীর যুগ শেষ হলেও আকা সমাজে রানী প্রথা প্রচলিত। বর্তমান সময়েও সমাজের উপর রানীর প্রভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। হুসিগাঁও আর জামিরি গেলে রানীর সাক্ষাৎ মেলে। অতীতের রাজবংশের উত্তরাধিকারিণী এই দুই গ্রামের রানী। আকাদের ভাষায় রানীর পরিচয় 'নুগুম'। নুগুম আকা সমাাজের সবচেয়ে বরণ.ীয়া ব্যক্তিত্ব। অবশ্য

গ্রামের প্রতিও রানীর বিশেষ কর্তব্য আছে। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে রানীকে এগিয়ে আসতেই হয়। গ্রামের রাজনীতিতে রানীর প্রভাব অনতিক্রমণীয়। গাঁও সভার সব কাজেই রানীর মতামত নেওয়া হয় এবং তার মতামতের বিরোধিতা কেউ করে না। আগামী দিনে হয়তো এই রানী প্রথা থাকবে না। হুসিগাঁও আর জামিরির রানীর মৃত্যুর পর আর কেউ তাদের শূন্য আসনে হয়ত বসবে না। একটি দীর্ঘদিনের প্রথা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

—রানীর বংশধর কেউ নেই?

নামচুম বলেন, কালের পরিবর্তনে নুগুমের স্থান এখন নেচলু-নুগ্নো বা গ্রামসভার প্রধানের উপর বর্তাবে।

আকা সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। এ অধিকার অর্জনের জন্য আকা রমণীকে বিপ্লব করতে হয়নি। বহুযুগ থেকেই আকা সমাজে নারীদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত। ক্ষেতে-খামারে, বনে-জঙ্গলে, ঝোরায়-ঝর্নায় নারী-পুরুষ পাশাপাশি কাজ করে।

অবশ্য নারীদের কাজে সমাজ কিছু সংস্কার জুড়ে দিয়েছে। এ সংস্কার শুধুমাত্র সংস্কার নয় কিছুটা বিজ্ঞান আছে। বনে আগুন দেওয়া আকা রমণীদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। আকা রমণীরা কোনও প্রাণকে পোড়ায় না। তারা নতুন প্রাণের জন্ম দেয়।

আকারা সমাজ সচেতন। সামাজিক শৈথিল্য তারা বরদাস্ত করে না। আপন সম্প্রদায়ের সংহতি আর ঐক্যবোধে বিশ্বাসী আকা সমাজ অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। সম্প্রদায়ের মধ্যে বহিরাগতের অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে সে বিষয়ে তারা সতত সজাগ। তারা জানে সম্প্রদায়ের সংহতি বিনষ্ট হলেই সামাজিক সমৃদ্ধির অবক্ষয় শুরু হয়। আকারা প্রতিবেশীকে প্রতারণা করে না এবং নিজেরাও প্রতারিত হয় না।

হঠাৎ নামচুম প্রশ্ন করেন, মুগৌ শব্দের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

—হ্যাঁ। অনেকদিন আগে একবার বলেছিলেন। মুগৌ মানে তো পুরোহিত, তাই না?

নামচুম হেসে বলেন, ভুলে যাননি দেখছি।

হঠাৎ মুগৌর কথা কেন?

নামচুম বলেন, আপনি তো আকাদের প্রেম-ভালবাসা আর বিয়ের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। মুগৌকে দিয়েই তো বিয়ের শুরু।

আদি সমাজে বিয়ের প্রস্তাব বরের পক্ষ থেকেই আগে উত্থাপিত হয়। মেয়ের বাবা কন্যাদানের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করে না। মেয়ে সুন্দরী হলে তো গরিমায় বাবা-মায়ের পা মাটিতে পড়ে না। ছেলের বাবা কনেপণ নিয়ে ঘুর ঘুর করে। ঠিক আমাদের সমাজের উল্টো।

ছেলের বাবা মুগৌ বা ঘটক লাগিয়ে রাখে। আদি সমাজে মেয়েরা সমাজের সম্পদ ও ঘরের সম্পত্তি। সম্পদ আর সম্পত্তি সহজে কেউ হাতছাড়া করতে চায় না।

কনের বাবা মুগৌর প্রস্তাবের শুভাশুভ আগে বিচার করে। বিচারের জন্যও ডাক পড়ে মুগৌর। ধ্যান আর ধ্বনি দিয়ে বিয়ের শুভাশুভ বিচার করে সে। পরিশেষে একটি মুরগির ছানাকে বিয়ের দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করে।

প্রস্তাবের শুভাশুভ বিচারের পর মুগৌকে পরবর্তী ভূমিকা পালন করতে হয়। যে কেউ মুগৌর ভূমিকা পালন করতে পারে না। ছেলের আত্মীয় অথবা গ্রামের সজ্জন বয়স্ক ব্যক্তি মুগৌর ভূমিকা পালন করে। কারণ, মুগৌর ভুল-ভ্রান্তিতে বিয়ে ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। আবার তার বাক্‌চাতুর্যে অল্প কনেপণেও মেয়ের বাবা সন্তুষ্ট হয়। বিয়ে যদি সুখের হয় উভয় পক্ষই মুগৌকে পুরস্কৃত করে।

বিয়েকে কেন্দ্র করে সারা গাঁয়ে একটি সামুদায়িক চেহারা ফুটে ওঠে। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বিয়েতে অংশগ্রহণ করে। আদর-আপ্যায়নে কোনও পক্ষপাতিত্ব থাকে না।

তিনদিন উৎসব শেষে বরপক্ষ ফিরে যায়। নাচে-গানে সারা গ্রামের মানুষ তাদের বিদায় জানায়।

কিন্তু—

বলেই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকান নামচুম। নির্জন নাহারলগুন নৈঃশব্দে নিশ্চল। সকলেই ঘুমে অচেতন। শুধু হিমালয়ের হিমেল হাওয়ায় বনানীর পাতায় পাতায় প্রাণের স্পন্দন।

—থামলেন কেন?

নামচুম বলেন, বিয়ের পর বরকে একাই ফিরে যেতে হয়।

—সেকি!

নামচুম বলেন, আকা সমাজে এই নিয়ম। বিয়ের পর বছরখানেক মেয়েকে পিত্রালয়ে থাকতে হয়। অবশ্য মাঝে মাঝে বর, বধূ দর্শনে শ্বশুরালয়ে যেতে পারে। বছর শেষে মুগৌকে সঙ্গে নিয়ে বর শ্বশুরালয়ে যায়। বউ নিয়ে ঘরে ফেরে। আর সেদিন থেকে কনে আ-জীবন বরের ঘরের সম্পদ আর সম্পত্তি হয়ে থাকে।

সব সমাজেই প্রেমের ফাঁদ পাতা থাকে। উপজাতি সমাজ তার ব্যতিক্রম নয়। যৌবনের ধর্ম অনুযায়ী ছেলে-মেয়েরা মাঝে মাঝে রোমান্টিক হয়ে ওঠে। কখনও তাদের রোমাঞ্চ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তারা অরণ্যের ছায়াদুর্গে দিন কয়েকের জন্য আত্মগোপন করে।

অভিজাত সম্প্রদায়ের মত আকারা পুলিশে খবর দেয় না। নিচলেউ-নিগ্গুর দরবারে নালিশ করে না। কারণ তারা জানে, 'অপরাধীরা' দু-চারদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। মুগৌকে খবর দিয়ে, ছেলে-মেয়ের হাতে ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি সুতলীর ডোর বেঁধে

দেয়। সুতলির বন্ধনেই (ফক্কি) মিলে যায় সামাজিক স্বীকৃতি, বিবাহিত জীবনের সীলমোহর। তাই বলে বরপক্ষ কনেপণ থেকে রেহাই পায় না। মেয়ের বাবাও মেয়ের প্রাপ্য ঠিকমত মিটিয়ে দেয়। মিরি ছাড়া অন্য কোনও প্রতিবেশীর সঙ্গে আকারা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। আর এই বিয়ের মধ্যে দিয়েই জন্মায় আকা-মিরি।

পিতৃধারায় ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয় না। মাতৃধারায় আকারা বিবাহে আগ্রহী। একটি মেয়ে তার মাসির ছেলেকে বিয়ে করতে পারলে খুশী হয়। তেমনি ছেলে তার মামার মেয়েকে বধূ হিসাবে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করে। আকা সমাজে পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করতে পারে-কিন্তু মেয়েদের বহু বিবাহ অবৈধ এবং অবশ্যই অজ্ঞাত। আকা পুরুষের একাধিক বিবাহে বাধা নেই সত্য—কিন্তু পরবর্তী বিবাহ নির্ভর করে প্রথম স্ত্রীর অনুমতির উপর। সব ক্ষেত্রেই কি অনুমতি মেলে?

নামচুম নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই জবাব দেন। আর্থসামাজিক অবস্থার উপর একাধিক স্ত্রী রাখা না রাখা নির্ভর করে। যার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল, সমাজে সম্মান আছে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী থাকলে তার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। জুম থেকে সংসারের খুটিনাটি সব স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তবে মনে রাখতে হবে প্রথমা স্ত্রীর কর্তৃত্বকে বিন্দুমাত্র খর্ব করা যায় না। অনেক সময়, স্ত্রীর একাধিক বোন, দিদির প্রাণেশ্বরের গলায় মালা দিয়ে স্বামীত্বে বরণ করে। সতীন-সন্তানদের মধ্যে কোনও ভেদ রেখা থাকে না।

আগেই বলেছি, উপজাতি সমাজে মেয়েরা সমাজের সম্পদ আর সংসারের সম্পত্তি। সম্পত্তির মত স্ত্রীরও উত্তরাধিকার থাকে। অকাল মৃত্যুর পর বড় ভাইয়ের বিধবাকে ছোট ভাই পূর্ণ স্ত্রীর মর্যাদা দেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে-কোনও বড় ভাই ছোট ভাইয়ের বিধবাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না। বড় ভাইয়ের বিধবা যদি কোনও কারণে দেবরকে স্বামীত্বে বরণ করতে না চায়, তাহলে তার নিজের পছন্দ মত অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে। অবশ্য নির্বাচিত সেই ব্যক্তিকে দেবরের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ মেটাতে হয়। বিয়ে না করেও স্বামীর সংসারে বৈধব্য জীবন-যাপনে বাধা নেই। সেখানে তার প্রাপ্য সম্মানে কেউ আঘাত দেয় না। অবশ্য বিয়ের একটা নির্দিষ্ট বয়স আছে। সে বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা আকা সমাজে নেই। পিতৃধারায় যৌনসম্ভোগ মার্জনাহীন অপরাধ। ঠিক তেমনি পরকীয়াপ্রেম ও অমার্জনীয় অপরাধ। অপরাধের তারতম্য বিচার করে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডও আকা সমাজ দিয়ে থাকে।

প্রেমালাপ যদি নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে সেক্ষেত্রেও আকা সমাজ নীরব থাকে না। সর্বসমক্ষে অসামাজিক ও অশালীন কথাবার্তার উপর আকা সমাজের নিষেধাজ্ঞা আছে।

নামচুম বলেন, গল্পের শুরুতেই আপনাকে থুমোনা শব্দটি বলেছিলাম। বাড়ির প্রথম সুসজ্জিত কক্ষকে আকারা বলে থুমোনা। থুমোনা শুধু একটি কক্ষ নয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অতিথিপরায়ণ আকারা অতিথি আপ্যায়নকে বলে থুমোনা। অতিথির প্রতি আকারা যে উচ্চাঙ্গের সম্মান প্রদর্শন করে, অন্য কোনও উপজাতির মধ্যে তেমন দেখা যায় না। আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে আকারা অতিথি সেবা করে। অতিথি বাৎসল্য আকা সমাজের উজ্জ্বল অধ্যায়। অতিথিকে শূন্য হাতে কোনওদিনই ফিরিয়ে দেয় না তারা। যাওয়ার সময় সাধ্যমত উপহার অতিথিকে দেয়। এটা পারস্পরিক আদান-প্রদান। বন্ধুত্বের পরিধি বিস্তারের একটি সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই আকারা প্রমাণ করে—সকলের এক আত্মা—সকলেই পরস্পরের আত্মীয়। প্রাকৃতিক শক্তির পূজারী আকারা। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। আত্মা অবিনশ্বর। ঘুরে ফিরে আবার ফিরে আসে। ফিরে আসে থুমোনায়। থুমোনার মধ্যেই জন্ম নেয় আকাদের সামাজিক সংহতি।

৭

নিশি

ব্যাসগুহা থেকে সন্ধ্যার মুখে সিমনার বনবিভাগের বাংলোয় ফিরে এলাম। ব্যাসগুহা ভাল করে দেখা হল না। অবগাহন করা গেল না পবিত্র ব্যাসকুণ্ডে। আশ্রমে গিয়ে শোনা হল না ভোলাবাবার দেবকীর্তন। জানা হল না ভোলাবাবার গুরু নাগাবাবার কথা। বুড়োই আর টেঙ্গাজুলির সঙ্গমে দাঁড়িয়ে দেখা হল না সুবনসিড়ির প্রাকৃতিক দৃশ্য। অতৃপ্ত মন নিয়ে নামচুমের পিছু পিছু সিমনার বাংলোয় ফিরে আসতে হল। নামচুম বলেন, ওই নোংরা জলে স্নান করে কী হবে? তার চেয়ে ডাফলাগড় অথবা ডিলিং-এ গিয়ে ডিক্রামে স্নান করব। ডাফলাগড়, ডিলিং আর ডিক্রাম—নদী আর গ্রাম পরস্পরের অনুপ্রাসে আবদ্ধ। তবুও মন খচ্‌খচ্‌ করে। হাজার হলেও ব্যাসকুণ্ড পবিত্র। অবগাহনে দেহ ও মনের মালিন্য দূর হয়। ইন্দ্রজিৎ নামচুমের এই থিয়োরিতে বিশ্বাস নেই। পাপই যখন করিনি--তখন পাপ ধোয়ার প্রশ্ন ওঠে কী করে? খাম্পতি উপজাতি নামচুমের যুক্তি অকাট্য। বনবিভাগের কর্মী হয়েও উপজাতি জীবনচর্চায় পারঙ্গম। নৃ-তাত্ত্বিক মানসিকতা আর বিচার বুদ্ধি নিয়ে উপজাতিদের জীবনচর্চা করেন তিনি। প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করেন। সিমনা বাংলো থেকে শ'খানেক মিটার দূরেই এই তীর্থস্থান। অসমের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুণ্যকামী মানুষেরা এই রামগড়ে তীর্থ করতে আসেন। আশ্রমের মুক্ত অঙ্গনে রাত্রিবাস করে সকালে পবিত্র কুণ্ডে অবগাহন করেন। পাশের গুহাতে ধ্যান করেছিলেন মহর্ষি ব্যাস। এই গুহাতে বসেই তপসিদ্ধ হয়েছিলেন। কবে কোথা থেকে ভগবান ব্যাস এখানে এসেছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই।

নামচুম বলেন, ব্যাসদেব এসেছিলেন কিনা, জানি না। তবে তাঁর নামেই এই গুহা আর এই কুণ্ড। আশ্রমের প্রতিষ্ঠা পরবর্তী কালে। আশ্রমের প্রথম পুরোহিত ছিলেন নাগাবাবা। ভাল নাম বিশ্বনাথ দাস।

—বাঙালি নাকি?

নামচুম মুচকি হেসে বলেন, না। অসমীয়া। শুনেছি , বাংলাও বলতে পারতেন; এখন পারেন কিনা জানি না।

—কিন্তু এখন তো আশ্রমে রয়েছেন ভোলানাথ।

নাগাবাবা মাঝে মাঝে দেশ পরিক্রমায় বেরিয়ে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে আশ্রম পরিচালনা করেন ভোলাবাবা। পুরো এলাকার নাম রামগড়। তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত হলেও, প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব লাভ করেছে সম্প্রতি। বছর পঁচিশেক আগে গোটা কয়েক প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে। তার মধ্যে পাথরের গায়ে খোদিত নাগমূর্তি প্রত্নতাত্ত্বিকদের আকৃষ্ট করেছে।

বলি, উদ্ধার করা হয়েছে নাগমূর্তি; বেশির ভাগ পুণ্যার্থী আসেন নাগাবিল থেকে আর আশ্রমের পুরোহিতের নাম নাগাবাবা—এটা নাগ রাজ্য নয় তো?

নামচুম হেসে ওঠেন। বলেন, অরুণাচলের সর্বত্রই তাদের অবাধ চলাফেরা। তিরাপ থেকে তাওয়াং যেখানেই যান, সর্বত্রই তাদের দেখা মেলে।

দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে আসে। পাহাড়ে ঘেরা বনে ঢাকা সিমনা বাংলোর অস্তিত্ব দূর থেকে বোঝা যায় না।

পোখুম-পোমা, বুড়োই আর টেঙ্গাজুলি শব্দ তুলে ডিক্রামের দিকে ছুটে চলেছে। নামচুম বলেন, আজকে আপনাকে ডাফ্‌লাদের গল্প বলব।

ডাফ্‌লা!

হ্যাঁ, আপনাদের কাছে ওরা নিশি নামে পরিচিত। আমাদের চারপাশেই ওরা রয়েছে। কেউ কেউ এই জায়গার নাম বলে ডাফ্‌লাগড়।

উপজাতিদের সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্যের কথা নামচুমের জানা আছে। নিশিদের অন্য পরিচয় যে ডাফ্‌লা, এ কথা আমার জানা ছিল না। বলি, আজ রাত তাহলে ভালই কাটবে।

মিষ্টভাষী নামচুমের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। নিজেই বলেন, ভাবনা নেই, আজ আর অপাং (মদ) খাব না।

সে কী! তাহলে তো গল্প জমবে না।

—জমবে। ঠিক জমবে। আপনি গল্পের মধ্যে মশগুল হয়ে যাবেন। যুদ্ধ বিশারদ বলে ডাফ্‌লারা বন্দিত আর বিবাহ বিশারদ বলে নিন্দিত।

—বিবাহ বিশারদ মানে?

নামচুমের মুখে সেই দুষ্টু হাসি ফুটে ওঠে। বলেন, ডাফলারা এক নারীতে সন্তুষ্ট নয়, তারা বহুবিবাহে বিশ্বাসী। কম করে চারটি স্ত্রী না থাকলে ডাফলা সমাজে তারা দুর্বল বলে পরিচিত হয়।

—সে কী! তাহলে ডাফলা সমাজে মেয়েদের সংখ্যা বেশি? নামচুম সংখ্যাতত্ত্বের কচকচানিতে যান না। বলেন, ওদের জীবনের ঘটনা আর প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার কথাই

আপনাকে শোনাব। ভাল করে শুনুন, বহু বিবাহে বিশ্বাসী হলেও—বিচ্ছেদে ওদের ঘোরতর আপত্তি। বিবাহ বিচ্ছেদ ডাফলা সমাজে খুব কমই ঘটে।

ইংরেজরা ওদের দুটি নামে চিহ্নিত করেছিল। মার্শাল রেস আর ম্যারিটাল রেস।

ডাফলারা যুদ্ধ প্রিয় নয়, কিন্তু যুদ্ধ বিশারদ। পাকা তীরন্দাজ। শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য ওরা তীরের গায়ে অ্যাকোনাইটের শিকড় দিয়ে তৈরি তীব্র বিষ মিশিয়ে রাখে। রক্তের সঙ্গে সেই বিষ মিশে মুহূর্তের মধ্যে শত্রুর মৃত্যু ঘটায়।

নামচুম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, একটা যুদ্ধের কাহিনী দিয়েই মার্শাল রেস ডাফলাদের কাহিনী শুরু করা যাক। জমি দখলের যুদ্ধ নয়। ডাফলাদের কোনও 'সীতাকে' অপহরণ নিয়েও এ যুদ্ধ নয়। ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধের মূল কারণ 'হুপিং কাশ'।

—হুপিং কাশ নিয়ে যুদ্ধ?

নামচুম বলেন, হ্যাঁ, হুপিং কাশই হল যুদ্ধের একমাত্র কারণ।

ইংরেজদের ভাষায় ডাফলা হল বন্য মানুষ বা 'ওয়াইল্ড ম্যান'— বর্বর। আর ডাফলাদের কাছে ডাফলার মানে হল শুধু মানুষ। কারণ তারা মান ও হুস সম্পর্কে বড় বেশি সচেতন। সম্ভবত ওরা দুর্ধর্ষ বলেই ইংরেজরা ওদের বলত 'বর্বর'।

নামচুমকে মনে করিয়ে দিই। হুপিং কাশ অনেক পিছনে পড়ে গেল।

নামচুম বলেন, না পিছনে পড়বে না। হুপিং কাশের কাহিনী বলতে গেলে একটু ভূমিকার দরকার।

নীরোগ না হলেও ডাফলারা মূলত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী। ডাফলারা নিজেদের চিকিৎসা নিজেরাই করে। কিন্তু হুপিং কাশের চিকিৎসা তাদের জানা নেই। এ রোগের অস্তিত্বই তাদের অজানা। সারা ডাফলা রাজ্যেই এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। কারণ নির্ধারণের জন্য মসুপে বসে কেবাং-এর সভা। সংক্রামক রোগের সূত্র আবিষ্কারের সন্ধান চলে। অবশেষে সূত্রের সন্ধান মেলে। ডাফলা রাজ্যের লাগোয়া অসমের সমভূমি থেকে এই রোগ সংক্রামিত হয়েছে।

কেবাং থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অপরাধীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হোক।

বলি, রোগ আবার কেমন করে অপরাধী হয়! নানা কারণেই তো রোগের সৃষ্টি। তা যে কোনও জায়গায়--যে কোনও মানুষের হতে পারে।

নামচুম বলেন, তা পারে এবং সাধারণত তাই ঘটে থাকে। কিন্তু ডাফলাদের ব্যাপারটা একটু আলাদা।

অসমের সমতলের মানুষের সঙ্গে তাদের একটা ব্যবসায়িক যোগসূত্র ছিল। লবণ, লোহা আর আফিং সমতলের মানুষের কাছ থেকে তারা সংগ্রহ করত। তাদের সংস্পর্শ থেকে ডাফলাদের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হয়েছে।

কিন্তু কে দেবে ক্ষতিপূরণ? রোগের জন্য কোনও ব্যক্তি বিশেষ দায়ী নয়। সুতরাং ক্ষতিপূরণের দাবি সমতলের কোনও মানুষই গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ক্ষতিপূরণ আদায়ের চরমসীমা অতিক্রম করার পর--একদল সশস্ত্র ডাফলা অসমের আনতোলা গ্রাম আক্রমণ করে বসল।

জিজ্ঞাসা করি, ঘটনাটি কোন্ শতাব্দীতে ঘটেছিল?

নামচুম মনে মনে কী যেন হিসাব করেন, বলেন, ঘটনাটি ঘটেছিল গত শতাব্দীতে। সম্ভবত ১৮৭৪ সালে। প্রায় একশ' বাইশ বছর আগের কথা। একশ' বাইশ বছর আগে ডাফলারা আনতোলা গ্রাম আক্রমণ করল। পাঁচ-জনকে হত্যা ও পঁয়ত্রিশ জনকে বন্দী করে ডিলিং আর রঙ্গাভ্যালিতে নিয়ে এল। তাদের অপরাধ হুপিং কাশের মারাত্মক জীবাণু ডাফলাদের মধ্যে তারাই সংক্রামিত করেছে। বলি, তাহলে কী সমতলের মানুষ ডাফলাদের বিরুদ্ধে 'ব্যাক্টেরোলজিক্যাল ওয়ার' শুরু করেছিল? শতবর্ষ আগে এমন মর্মান্তিক চিন্তাধারা তাদের মধ্যে ছিল না কি?

—পাগল! আপনারা লেখকেরা বড় বেশি আগাম ভাবেন। রোগটি সংক্রামক। সমতলের মানুষের সঙ্গে ডাফলাদের ব্যবসা/বাণিজ্য ছিল। নুন, লোহা আর আফিং তারা সমতল থেকে আমদানি করত। যে কোনও কারণেই হোক রোগটা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর রোগের উপক্রমণিকা আর উপশম সম্পর্কে ডাফলারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন নামচুম। সিমনা বাংলোর বাইরে ঘোর অন্ধকার। পাহাড়গুলোকে কালো রং-এর বিশালাকার ছায়া মনে হয়। ডিক্রামের সশব্দ ঢেউ।

—গল্পটি কি এখানেই শেষ?

নামচুম বলেন, না। এখান থেকেই গল্পের শুরু। বলতে পারেন এখান থেকেই যুদ্ধের আরম্ভ।

শাসক ইংরেজ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। দুর্বিনীত দুর্ধর্ষ ডাফলাদের শায়েস্তা করতে না পারলে সমতলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। সুতরাং ডাফলাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অভিযান শুরু হল। ডাফলা রাজত্বের সঙ্গে সমতলের সত্তর মাইল সীমান্ত। বন আর পাহাড়ে সীমান্ত পথ দুর্গম। ইংরেজরা সত্তর মাইল ব্যাপি সীমান্তে ষাটটি চৌকি বসিয়ে এক অনতিক্রমনীয় অবরোধ গড়ে তুলল। ডাফলাদের সমতলে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

নামচুম বলেন, আজকের দিনে যেসব অর্থনৈতিক অবরোধের কথা শুনতে পাই, একশ' বাইশ বছর আগে ইংরেজরা ডাফলাদের বিরুদ্ধে সেইরকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিল। দূত মারফৎ খবর পাঠানো হল, বন্দীদের মুক্তি দিলেই অবরোধ তুলে নেওয়া হবে।

ডাফলাদের কাছ থেকে কোনও সাড়া পেল না ইংরেজ। অবরোধকে ডাফলারা উপেক্ষা করেই চলল। বলি, লোহার কথা না হয় বাদই দিলাম, নুন বা আফিং ছাড়া ওদের চলবে কী করে?

নামচুম বলেন, কথাটা ঠিক। কিন্তু নুন আর আফিং ছাড়া ওরা কীভাবে চলেছিল সে খবর ইতিহাসে নেই। কিন্তু অবরোধ সৃষ্টি করে মুস্কিলে পড়েছিল ইংরেজ। শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর জঙ্গলে তারা আর তিষ্ঠোতে পারছিল না। বন্য মশা আর বিশাল বিশাল জোঁকের অত্যাচারে অবরোধ তুলে ডাফলাদের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল ইংরেজ। একটি পুরোপুরি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল তারা। ৪৪তম অসম লাইট ইনফ্যান্ট্রির ছয় শ' নিয়মিত সৈন্য নিয়ে মেজর আর্থার কোরির অধীনে সৈন্যদল গঠন করা হল। ১৮৭৪ সালের শরৎকালে মেজর কোরি অপহৃতদের উদ্ধারের জন্য ডাফলাদের রাজত্ব আক্রমণ করল।

—সরাসরি যুদ্ধ?

নামচুম বলে, হ্যাঁ। আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ সৈন্যদল তীরন্দাজ ডাফলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অবশ্য সেই সঙ্গে তাঁরা ঘোষণা করল, অপহৃতদের মুক্তি দিলে, কারও বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

কোনও জবাব এল না ডাফলাদের কাছ থেকে। নদীর ধারে ধারে ইংরেজ সৈন্য বিনা বাধায় পৌঁছে গেল ডিক্রাম-এর মুখ পর্যন্ত। কিন্তু কোনও ডাফলাদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হল না।

—কেন?

নামচুম আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, ইংরেজ সৈন্য রাস্তা আর নদী পার হয়ে চলে এল হরমতী। না, এবারও কোনও ডাফলাদের সঙ্গে দেখা হল না তাদের।

—ওরা গেল কোথায়?

নামচুম বলতে থাকেন, ইতিমধ্যে ইংরেজদের মনে বড় রকমের আশঙ্কার জন্ম নেয়। এই দুধর্ষ জাতের মতিগতি বোঝা মুস্কিল। তাই তারা কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সৈন্য সংখ্যা চার গুণ বৃদ্ধি করল। আর্থার কোরি মোট ২৪০০ সৈন্য নিয়ে ডিসেম্বরের শীতে হরমতীতে অপেক্ষা করতে লাগল। হরমতী থেকে অভিযান চালাবার মত রাস্তা নেই। সুতরাং রাস্তা তৈরির কাজ হাতে নিল তারা। ১৮৭৫ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি অপরাধী ডাফলাদের গ্রামে পৌঁছে গেল। দিন কয়েক অপেক্ষা করল সেখানে। একদল সৈন্য পৌঁছে গেল ডিলিং-এ কিন্তু কেউ কোথাও নেই। কয়েক হাজার ডাফলা-ফানুস হয়ে আকাশে উড়ে গেল নাকি!

নামচুম হাসলেন, ডাফলাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেল। ইংরেজদের ঘাড়ে চেপে বসল একটা বিশাল খরচ। রঙ্গাভ্যালির দিকে আর অগ্রসর না হয়ে ইংরেজ সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা হল।

—ফিরে এল?

হ্যাঁ। ডাফলাদের বুদ্ধির কাছে তারা অপমানিত হয়ে ফিরে এল।

বলি, কেমন করে এটা সম্ভব হল? নামচুম আমার কথার জবাব দিলেন না। নিজের

কথার রেশ নিয়ে নামচুম বললেন, ইংরেজ সৈন্য ফিরে আসার দিন কয়েক পরেই অপহৃত পঁয়ত্রিশ জনের মৃতদেহ ডাফলারা আনতোলার সমতলে ফেলে এসেছিল।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, ডাফলারা কোথায় পালিয়েছিল?

নামচুম বলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে অহম-এর রাজা উদয়াদিত্য সিং-এর প্রধানমন্ত্রী অতন বরগোহাঞি আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন—দুর্ধর্ষ ডাফলাদের তখনই ধরা সম্ভব, যখন হাতি কোনও বুদ্ধি বা কৌশলে ইঁদুরের গর্তে ঢুকতে পারবে। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ নামচুমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

সিমনা বাংলো থেকে ব্যাসগুহার দূরত্ব প্রায় একশ মিটার। কিছুক্ষণ আগেও আশ্রমে আলো জ্বলছিল। এখন অন্ধকার। ব্যাসগুহার ঘন্টা-ধ্বনি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। ভগবান ব্যাস এই প্রাকৃতিক গুহাকে তাঁর তপস্যার স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। সিদ্ধি লাভের পর কোন্ পথে কোথায় ফিরে গিয়েছিলেন আমরা তা জানি না। শুনেছি জাপানে একটি ব্যাসদেবের মূর্তি আছে। আমার প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধু শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী সেই মূর্তি ও তার গায়ে খোদিত কয়েকটি লিপির অর্থ উদ্ধার করেছিলেন। সুবনসিড়ির ব্যাসদেব আর পুরাণোক্ত ব্যাসদেব একই ব্যক্তি কিনা তাই বা কে জানে?

গুহার মধ্যে শিব আর পার্বতীর মূর্তি। খুব বেশি দিনের পুরনো বলে মনে হয় না। মূর্তি দুটির পিছনের দিকে একটি শিবলিঙ্গ। মন্দিরেরর অভ্যন্তরে সর্বদাই একটি প্রদীপ জ্বলে।

নামচুম বলেন, ব্যাসদেব কি শিবভক্ত ছিলেন? তিনি কি শিব সাধনা করতেন? নামচুমের প্রশ্নে ধাক্কা খাই। ব্যাসদেব ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন বলে জানি। নামচুমের প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না। অবশ্য উনিও জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করেন না। বলেন, নিশি বা ডাফলারা ব্যাসগুহাকে কী বলে, জানেন?

—আপনি বলুন।

নামচুম বলেন, বাদালি খ্রোম! মানে বাদুরদের বাসা। ওরা ঠিক নামই দিয়েছে। অসংখ্য বাদুড় এই গুহার মধ্যে আছে। নামচুম বলেন, আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলেন।

কী? কীসের প্রশ্ন?

নামচুম বলেন, আমি খাম্পতি সম্প্রদায়ের লোক হয়েও জানি, ব্যাসদেব ছিলেন শিবভক্ত। ব্যাসকাশী তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। হয়ত এখান থেকে সিদ্ধি লাভ করে ব্যাসদেব কাশী চলে গিয়েছিলেন। হতেও পারে। সে যুগের মানুষেরা পায়ে হেঁটে পৃথিবী পরিক্রমা করতেন। আর মুনি-ঋষিরা তো ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।

হেসে বলি, আপনি বরং ডাফলাদের গল্প বলুন। মার্শাল রেসের কথা তো শুনলাম, এবার ম্যারিটাল রেসের কথা বলুন। নামচুম বলেন, ঠাট্টা ভাববেন না। সত্যিই ডাফলারা

ম্যারিটাল রেস। এক বিয়েতে ওদের পৌরুষ প্রকাশ পায় না। একটি পুরুষ কম করে তিনটি এবং প্রয়োজনে আটটি বিয়ে করতে পেছ্‌পা হয় না।

—বিয়ের প্রতি এত দুর্বলতা কেন?

নামচুম বলেন, দুর্বলতা নয়। বৈচিত্র্যের সন্ধানী ওরা।

বৈচিত্র্যের জন্য একটি পঞ্চাশোর্ধ পুরুষ, দ্বাদশবর্ষীয়া মেয়েকেও বিয়ে করে। ডাফলাদের মধ্যে কী মেয়েদের সংখ্যা বেশি? তা না হলে, একটি পুরুষ গড়ে তিন-চারটে বউ পাবে কী করে? নিশ্চয়ই তাহলে অনেক পুরুষকে অবিবাহিত থাকতে হয়।

নামচুম মনে মনে কিছু ভাবেন। একটু পরে বলেন, সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাপারটা আমার জানা নেই। তবে ওদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে। নারী ওদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য। বলি, উত্তরাধিকার সূত্রে তো সম্পত্তি প্রাপ্য হয়! নামচুম বলেন, উপজাতি সমাজে নারীরা সম্পত্তি এবং সম্পদ। সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে কোনও বাধা নেই। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নামচুমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। আজ নামচুমের মুখ-চোখ খুব স্বাভাবিক। এখন পর্যন্ত তিনি অপাং ছোঁননি। আজ ছোঁবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। পাহাড়ের গায়ে ঘন অন্ধকার, মাঝে মাঝে নিশাচর প্রাণীর চিৎকারে আঁধারের স্তব্ধতা ভাঙে। নামচুম উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করে দেন।

বহুবিবাহ আর তার ভিন্ন স্বাদের কথা থাক। এ দুটি তো জীবনের একটি মাত্র অংশ। মানুষ ডাফলাদের কথা শুনতে আপনার খারাপ লাগবে না।

আপনিই তো বললেন, ডাফলা শব্দের অর্থ মানুষ। নামচুম বলেন, হ্যাঁ। কিন্তু ইংরেজরা একটা 'ওয়াইল্ড' শব্দ ব্যবহার করে ওদের বন্য আর বর্বর বলে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু মোটেই ওরা তা নয়। ডাফলাদের নিজস্ব রুচি আছে , সমাজ আছে আর একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সামাজিক বিধি আছে। এবং সেগুলো অনুপুঙ্খভাবে বিচার করলে দেখা যায়, তাতে বিজ্ঞান আছে , তাতে ন্যায় ও নীতি আছে।

কেউ কেউ মনে করেন, ওরা 'ককেশিয়ান ষ্টক'। আবার কোনও কোনও নৃ-তাত্ত্বিকের ধারণা, ওরা অবশ্যই মঙ্গোলয়েড। গায়ের রং ফর্সা-পীত। গোলাকৃতি মুখমণ্ডল। চওড়া চ্যাপ্টা নাক। সুঠাম স্বাস্থ্য ও টান টান শরীর। নির্মেদ দেহ। বয়েস কালেও কুঞ্চনরেখা অনুপস্থিত।

ডাফলা-কন্যাদের মিষ্টি মুখে সুন্দর হাসি। গোলাপের মত গাল। পুরুষের তুলনায় সামান্য বেঁটে হলেও শক্ত সমর্থ নির্ভাজ দেহ। সুন্দর পোশাকে মার্জিত। কৌতূহলী, হাসি-খুশি এবং সহজেই প্রমত্তা। তবে পবিত্রতা বিসর্জনে নিতান্ত কুণ্ঠিতা। নিজস্ব রীতিতে কেশ বিন্যাস ডাফলাদের রুচির পরিচয় বহন করে। অন্য কোনও উপজাতির মধ্যে এ ধরনের কেশ বিন্যাস নেই। নিজস্ব শৈলিতে এমনভাবে কেশ বিন্যাস করে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে মাথায় একটা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এ ধরনের কেশ বিন্যাস

শুধু পুরুষেরাই করে, মেয়েরা নয়। এই কেশ বিন্যাসের জন্য অন্যদের চোখে তাদের খারাপ দেখালেও স্বকীয় কেশশৈলী তারা বিসর্জন দিতে রাজি নয়।

প্রথম দৃষ্টিতে তাদের কঠোর ও রাগী বলে মনে হলেও ডাফলারা মোটেও তা নয়। তীরের মাথায় অ্যাকোনাইটের বিষ মিশিয়ে শত্রু নিধন করলেও অতিথিপরায়ণতায় তাদের তুলনা হয় না। অতিথির সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দায়িত্ব পালন করে ডাফলা রমণী। আপন বিশ্বাস দিয়ে তারা অতিথিকে বিশ্বাস করে।

—কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে!

নামচুম বলেন, তেমন কোনও ঘটনা আমার জানা নেই।

আধুনিক সভ্যতার কাছাকাছি থেকেও যুগ-সঞ্চিত ধ্যান-ধারণায় বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি। অশনে-বসনে ডাফলাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

নামচুম বলেন, জানেন, ডাফলাদের পা থেকে কোমর পর্যন্ত বেতের খারু দিয়ে আবৃত।

—বেতের খারু! বেতের খারু পরে কেন?

নামচুম বলেন, ওরা সর্বদাই যোদ্ধার বেশে নিজেদের আবৃত রাখে। শত্রুপক্ষের তরোয়ালের আঘাত থেকে ওই বেতের খারু তাদের বাঁচায়। আবার বনে-জঙ্গলে হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকেও রক্ষা করে। মিথুনের মোটা চামড়া দিয়ে তৈরি এক রকম ঢাল ওদের বুকে ও পিঠে থাকে। শত্রুর তীরের লক্ষ্য থেকেও যেমন রক্ষা পায়—আবার হিমশীতল ঠাণ্ডা থেকেও বাঁচে। যুগের পরিবর্তন হলেও ওরা এখনও পোশাকের পরিবর্তন করেনি।

মেয়েদের পায়ের পাতা, হাতের তালু আর মুখ ছাড়া দেহের কোনও অংশই অনাবৃত নয়। খাসি মেয়েদের মতোই ডাফলা রমণী সুন্দর পোশাকে আবৃতা।

রাত গভীর হয়। অরণ্যের গভীরে সিমনার বাংলোয় কেমন যেন গা ছম্‌ছম্‌ ভৌতিক স্তব্ধতা নেমে আসে। আমি ডাফলাদের বিবাহ-বিলাসের কাহিনী শোনার জন্য উদগ্রীব।

বলি, এবার ম্যারিটাল রেস ডাফলাদের কথা বলুন। নামচুম একটু হেসে বলেন, ডাফলাদের বিবাহ-বিলাস দিয়েই আমার গল্প শেষ করব।

ডাফলাদের মধ্যেও ধনী-গরীব আছে। যারা বিত্তশালী, গরীব ঘরের ফুটন্ত কুসুমের দিকেই তাদের লক্ষ্য বেশি। কনেপণের লোভে অনেক গরীব তাদের দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে পঞ্চাশোর্ধ বিত্তশালীর সঙ্গে বিয়ে দেয়।

বলি, শুধু বৈচিত্র্যের জন্যই ডাফলারা বিবাহ বিলাসী?

নামচুম বলেন, ওরা তাই মনে করে। শুধু মনে করে না, বিশ্বাস করে। বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের মধ্যে ওরা ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখতে পায়।

মেয়েরা প্রতিবাদ করে না কেন?

নামচুম বলেন, প্রশ্ন ওঠে না। যুগ যুগ ধরে যা দেখে আসছে , নির্বিবাদে এবং নিশ্চিন্ত মনে ওরা তাই মেনে নেয়। যদি প্রশ্ন করেন, ওরা সুখী অথবা অসুখী, আমি এ কথার জবাব দিতে পারব না।

ডাফলা সমাজে সব স্ত্রীর মর্যাদা সমান। সকলের জন্য আলাদা ঘর।

পোশাক-পরিচ্ছদে কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। নির্ধারিত দিনেই স্বামী-সঙ্গ লাভ প্রতিটি স্ত্রীর প্রাপ্য।

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কী যেন বলছিলেন। নামচুম বলেন, জমি ও জুমের মত স্ত্রীও পিতার সম্পত্তি। তাই পুত্রেরাও সেই সম্পত্তির উত্তারাধিকারী।

একটু থেমে নামচুম বলেন, ঘটনাটা একটু বিশদে বলি, একমাত্র গর্ভধারিণী ছাড়া যে কোনও পুত্র সৎ-মায়ের পাণি গ্রহণ করতে পারে। এবং ডাফলা সমাজে তা নিন্দনীয় নয়। ডাফলা সমাজে পিতৃধারায় বিবাহ নিষিদ্ধ। পিসি ও কাকার ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিয়ে হয় না কিন্তু মামা ও মাসির মেয়েকে বিয়ে করা প্রথাসিদ্ধ। মাসিকেও বিয়ে করা অসিদ্ধ নয়।

বাল্যবিবাহ ডাফলা সমাজে নেই। ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না। নামচুম বলেন, ডাফলারা বিবাহ-বিলাসী হলেও পরস্ত্রী প্রলুব্ধ নয়। একাধিক সতীনের সঙ্গে সংসার করতে ডাফলা রমণীদের আপত্তি নেই। গোপন অভিসার তাদের সমাজে বিরল ঘটনা।

দারিদ্র্য ডাফলা রমণীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ। অর্থবানের দৃষ্টি সর্বদাই গরীবের ত্রয়োদশী বা চতুর্দশী কন্যার উপর ঘোরাফেরা করে।

নামচুম আগেই বলেছেন—ডাফলা রমণীরা সমাজের সম্পদ ও সম্পত্তি। উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত বড় ভাইয়ের একাধিক বিধবাকে অবিবাহিত ছোট ভাই বিবাহ করতে পারে। সমাজ থেকেই তারা স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা পায়। কোনও বিধবা যদি পুনরায় বিবাহে অনাগ্রহী হয়—ডাফলা সমাজ তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না।

ত্রিপুরায় রিয়াংদের মধ্যে জামাইখাটার প্রথা প্রচলিত। ডাফলাদের সঙ্গে তাদের কোনও পরিচয় নেই। কিন্তু জামাইখাটা প্রথা তাদের সমাজেও প্রচলিত।

সতীনদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি যে না হয়, তা নয়। তবে পরস্পরের মধ্যে মিলে-মিশে থাকা তারা পছন্দ করে। বিশেষ কোনও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পক্ষপাতিত্ব থাকে না।

বড় বউ সংসারে সর্বময় কর্ত্রী। অন্যরা হাসিমুখে তার সঙ্গে সহযোগিতা করে। জুম থেকে অপাং তৈরি পর্যন্ত সকলের শ্রম সমানভাবে বন্টিত হয়। ডাফলা রমণীরা সংসারের সম্পদ। কিন্তু রাজনীতি ও ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের কোনও বক্তব্য নেই। এ দুটি বিষয়

থেকে ডাফলা সমাজ তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। শুধু রাজনীতি ও ধর্মীয় বিষয় ছাড়া ডাফলা রমণীদের সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে।

যৌন-অপরাধ ডাফলা সমাজে বিরল ঘটনা হলেও তাদের সমাজে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। নামচুম বলেন, ধর্ষণের ঘটনা আমার জানা নেই। সেরকম কিছু ঘটলে—অপরাধীকে শুধু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় না—প্রয়োজনে এবং অপরাধের তারতম্য অনুযায়ী সমাজ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। আপনাদের সমাজে তো ধর্ষণকারীর বিচারই হয় না!

তাকে বলা যায় না যে, আমাদের সমাজে ধর্ষিতার জীবন বড় বেদনাদায়ক। মা-বাবা মেয়ের ধর্ষণের ঘটনা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে চান।

ডাফলা সমাজ কোনও ধর্ষিতাকে অসতী বলে না। ধর্ষণ তাদের কাছে একটি দুর্ঘটনা মাত্র। ধর্ষিতা কন্যাকে বিয়ে করার পাত্রেরও অভাব ঘটে না।

নামচুম বলেন, পর-পুরুষের সঙ্গে বিবাহোত্তর সম্পর্ক ডাফলা সমাজে অমার্জনীয় অপরাধ। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও বিবাহিতা রমণীর স্তন স্পর্শের জন্য অপরাধীকে নিদেনপক্ষে দু'টি মিথুন অথবা তিব্বতে তৈরি মূল্যবান কাঁসার ঘন্টা জরিমানা দিতে হয়।

ডাফলা সমাজে অপরাধ দমনের অনেক বিধি আছে। কেবাং-এ মাঝে মাঝে বিচার হয়। খুনের জন্য ফাঁসি হয় না সত্য—কিন্তু খুনীকে সারা জীবন দাস হয়ে থাকতে হয়। ডাফলারা শুভ ও অশুভ শক্তিতে বিশ্বাসী। কারও অপঘাতে মৃত্যুর জন্য অশুভ শক্তি দায়ী। মাঝে মাঝে তারা অশুভ শক্তির তুষ্টি সাধনের জন্যে নারী-পুরুষ একসঙ্গে পূজা করে। ডাফলারা উই-ইয়াসকে সবসময় সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে।

নেফা যখন অরুণাচল হয়নি—এসব তখনকার কাহিনী। বর্তমানে কিছু পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। কিন্তু যুগ-সঞ্চিত প্রচলিত প্রথা আদৌ বরবাদ হয়ে যায়নি। পুরনো প্রথার সঙ্গে একটি আধুনিক প্রথার সংযোজন হচ্ছে। বিশেষ করে 'সতীন' প্রথার পরিবর্তন ঘটছে। নিশি মেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে। আর শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সতীন প্রথার বিলোপ ঘটছে। আজকাল নিশিরা বাসে পয়সা দিয়ে যাতায়াত করলেও শবদেহের বুকের উপর দু-বাটি ভাত আর এক চোঙ অপাং রাখবেই। এ দুটিই হল মৃত ব্যক্তির ওরাম যাবার পাথেয়।

৮

গ্যালং

সরকারী কাজে শিলং এসেছেন নামচুম। ইন্দ্রজিৎ নামচুমের সঙ্গে আমি তিরাপ গেছি। তিনিই আমাকে নিয়ে গেছেন তাওয়াং। মোন্-ইয়ুলের মোন্-পাদের জীবনের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। একদা মস্তক শিকারী ওয়ান্চোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।

মেঘালয়ের বালফাক্রাম আর অরুণাচলের নামডাফাকে জীবমণ্ডল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। জীবমণ্ডলের খুঁটিনাটি আলোচনার জন্য তাঁকে আসতে হয়েছে।

নামচুম জানেন, অরুণাচলের আদিদের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। যে কোনও উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবনচর্চা জানতে আমার খুব আগ্রহ।

তিনি বলেন, একটি শর্তে গ্যালংদের কাহিনী আপনাকে শোনাতে পারি।

শর্ত!

হ্যাঁ, সাদামাটা একটি শর্ত।

বলুন।

গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না। শেষ হবার পর আপনার প্রশ্নের জবাব দেব।

গ্যালংদের জীবনচর্চা শোনার লোভেই নামচুমের শর্তে রাজি হয়ে যাই। সব শৈলশহরের এক অবস্থা। সন্ধ্যার পর রাস্তা জনশূন্য হয়ে যায়। শীতের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝরা পাতার স্তূপের মধ্যে রাস্তার কুকুরগুলি ঘুমোবার চেষ্টা করে চলেছে। শহর জনশূন্য হলেও—অনেক রাত পর্যন্ত ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। 'ফায়ার প্লেসের' পাশে বসে পারিবারিক গল্প চলে।

নামচুম বলেন, কিছুদিন আগে হিমাচল গিয়েছিলাম। কিন্নরের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। বাধা দিয়ে বলি, আপনি তো গ্যালংদের গল্প শোনাবেন।

নামচুম বলেন, উহুঁ শর্ত ভাঙবেন না। আগে শুনুন—পরে আপনার কথার জবাব দেব। নামচুম শুরু করেন—

হিমাচলের কিন্নরী আর অরুণাচলের গ্যালং রমণীর ভাগ্যলিপি প্রায় একই অভিশাপে বিড়ম্বিত। উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ভৌগলিক দিক থেকে এই দুই উপজাতির মধ্যে দুস্তর দূরত্ব থাকলেও-সংসার আর জৈবিক জীবনে নৈকট্য আছে।

একজনের বাসভূমি তিব্বত সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিম হিমালয়ের তুষারে ঢাকা কিন্নর জেলায়। অপরজন থাকে পূর্ব হিমালয়ের পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা পশ্চিম সিয়াং জেলায়। তিব্বতের সঙ্গে অবশ্য এখানেও সীমান্ত রয়েছে। দেশের বিপরীত দুই প্রান্ত সীমায় বসবাসকারী এই দুই উপজাতি রমণীর জীবনদর্শন প্রায় একই গতিতে চলে। সংসারের কর্মধারা একই খাতে প্রবাহিত। প্রেম, বিবাহ ও বিচ্ছেদের বিষয়ে দুই উপজাতি রমণীর ভাগ্য প্রায় একই সূত্রে গাঁথা।

এক পরিবারের সব ভাইয়ের ভর্ত্রী, কিন্নর ও গ্যালং রমণী। উভয়েই দ্রৌপদী। কিন্নরী একগুচ্ছ ভাইকে বিয়ে করে সংসারে যেমন একক নায়িকা, তেমনি গ্যালং রমণীর উপর সব ভাইয়ের সমান যৌন অধিকার সমাজ স্বীকৃত। যার ঔরসেই সন্তান আসুক না কেন, কিন্নর সমাজে পিতৃত্বের দায়িত্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার। প্রায় একইরকম ব্যবস্থা উভয় সম্প্রদায়ের উপজাতির মধ্যে প্রচলিত। দ্রুপদ কন্যা না হয়েও কিন্নরীরা তাই দ্রৌপদী। এক মায়ের গর্ভজাত সব ভাইয়ের সহধর্মিণী ও শয্যাসঙ্গিনী একজনই। গ্যালং রমণী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্বীকৃত সহধর্মিণী হলেও—সে সব ভাইয়ের যৌথ ভোগ্যা। কিন্নরীদের বহু ভর্তার অভিশাপ বহু কথিত। কিন্তু গ্যালং রমণীদের এই জীবন-যন্ত্রণা খুবই স্বল্পবিদিত। কারণ, তাদের নিয়ে নৃ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা অত্যন্ত সাম্প্রতিক।

কিন্নরীদের মত গ্যালং রমণীর মূল্যও সমাজে স্বীকৃত। উভয়েই সমাজের কাছে 'মূল্যবান সম্পদ'। কেমন করে দুই প্রান্তের দুই উপজাতি রমণীদের জীবনের ধারা এক হয়ে গেল—সে রহস্য নিরসনের জন্য সামাজিক ও নৃ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা আজও হয়নি। হয়ত কোনও এক যুগে একটা ধারা থেকেই তারা বেরিয়ে এসেছিল। একটা ধারা চলে গেছে তুষারাবৃত পশ্চিম হিমাচলে, অপর ধারা নেমে এসেছে অরুণাচলের পাহাড় আর অরণ্যের ছায়া দুর্গে।

বড় ভাইয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিয়ে হলেও সেই কিন্নরী অপর ভাইদেরও সমাজ-স্বীকৃত স্ত্রীর মর্যাদা পায়। গ্যালংদের ক্ষেত্রে বিবাহ বড় ভাইয়ের সঙ্গেই হয়। কিন্তু সমাজের প্রচলিত রীতি অনুসারে অপর ভাইদেরও তার সঙ্গে সহবাস করার অধিকার থাকে। গ্যালং রমণীকে সেই অধিকার মেনে নিতে হয়। স্বামীর তরফের কোনও আত্মীয়েরও তার উপর পূর্ণ অধিকার আছে। তবে এইক্ষেত্রে গ্যালং কন্যার কিছু স্বাধীনতা

থাকে। সে ইচ্ছা করলে স্বামীর সম্পর্কিত কোনও আত্মীয়কে ফিরিয়ে দিতে পারে। সুখের বিষয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেয় না। কিন্নর কন্যাদের একাধিক স্বামী নিয়ে ঘর করার প্রথা বহুযুগ থেকেই চলে আসছে। তারা অত্যন্ত চাতুর্য ও কৌশলে প্রতি স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখে। মূলত বড় ভাইকে কেন্দ্র করে তার ভালবাসা আর আন্তরিকতা ঘুরপাক খায়। অবশ্য তারা অন্য স্বামীর প্রতি কর্তব্য-বিমুখ নয়। জ্যেষ্ঠ ভাইকে গৃহমুখী রেখে অন্যদের মাঠের কাজে বা ব্যবসার অজুহাতে দূরে দূরেই রাখে। তারা এমনভাবে স্বামীদের কাজকর্মের নির্ঘন্টি তৈরি করে যে, কখনই একাধিক স্বামী একসঙ্গে বাড়ি থাকে না! সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে কিন্নর সমাজে কোনও মাথাব্যথা নেই। যার ঔরসেই সন্তানের জন্ম হোক না কেন, সব সন্তানের পিতৃত্ব বর্তায় বড় ভাইয়ের উপর। গ্যালংদের মধ্যে পিতৃত্বের বিষয়ে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহিত স্বামী ছাড়া আর কারও ঔরসে কোনও সন্তানের জন্ম হলে সে সন্তানের জনক হবে 'পুরোহিত'—যিনি বিবাহ সম্পন্ন করিয়েছিলেন। গ্যালং সমাজে নারীর অভাব নেই। বরং পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। প্রশ্ন উঠতে পারে তবু এই ব্যবস্থা কেন? কিন্নরদের মতো গ্যালং সমাজও নারীদের মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করে। তাদের সমাজে বরপণের কোনও ঝামেলা নেই। বরং কনেপণের সাংঘাতিক চাহিদা।

গ্যালং সমাজে নারীর সংখ্যা বেশি। গত আদমসুমারী অনুযায়ী প্রতি হাজার পুরুষের জন্য ১০১২ নারী। নারীর আধিক্য থাকা সত্ত্বেও গ্যালং রমণীদের বহুভর্তার সঙ্গে ঘর করতে হয়।

যারা অর্থবান কেবল তারাই কনেপণ দিতে পারে। কনেপণ হিসাবে বরের পিতাকে কয়েকটি মিথুন, গরু ও কিছু পেতলের বাসন দিতে হয়। কনেপণের চাহিদা মেটানো সব গ্যালং পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয় না বলেই একাধিক পুত্র অবিবাহিতই থাকে। বিবাহযোগ্য অন্য পুত্রদের দৈহিক চাহিদা পূরণের উপায় হিসাবেই তারা সমাজে যৌথ-বধূর ব্যবস্থা প্রচলিত রেখেছে। সমগোত্রীয়দের নিয়েই গ্যালং বসতি। সেখানে প্রাক্‌বিবাহ ও গোত্রবহির্ভূত কোনও নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক অসামাজিক। গ্যালংরা অসামাজিক কিছু মেনে নেয় না। তাই গ্যালং গ্রামের প্রজননক্ষম সব পুরুষকেই মুষ্টিমেয় বিবাহিতা রমণীর সঙ্গেই যৌন-সম্পর্ক রাখতে হয়। বর্তমানে প্রচলিত রীতি-নীতিতে কিছু পরিবর্তন দেখা দিলেও- আজও সেই পৌরাণিকী ব্যবস্থা চলেছে। গ্যালং রমণীরা তাই অরুণাচলের দ্রৌপদী হিসাবে চিহ্নিত।

গ্যালংরা অরুণাচলের পশ্চিম সিয়াং জেলার অধিবাসী। মূলত অরণ্য ও চাষভিত্তিক অর্থনীতি প্রচলিত। কেউ কেউ এখনও জুমচাষে বিশ্বাসী। পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা পশ্চিম সিয়াং-এর বুক চিরে বয়ে গেছে সাংপো নদী।

তিব্বত থেকে জন্ম নিয়ে সিয়াং নামে ধীরে বয়ে অবশেষে পবিত্র ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলেছে। অরুণাচলের অত্যন্ত উদ্দীপ্ত অংশ এই পশ্চিম সিয়াং। এই জেলায় আদি ও

বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী উপজাতি মানুষের বাস। আদমসুমারী অনুযায়ী সংখ্যায় গ্যালংরা বেশি। আদিদের মধ্যে গ্যালং, কোর, পাঙ্গি, লিবো, পসি, পৈলিবো, মিনিয়ং, করকা প্রভৃতি। তাদের সঙ্গে সহ্-অবস্থান করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দুটি উপজাতি। গ্যালংরা আদিদের একটি উপশাখা। কিংবদন্তি পুরুষ 'আবোগনী'র বংশধর বলে তারা নিজেদের মনে করে। চন্দ্র সূর্য ছাড়াও আদিদের উপশাখা গ্যালং ও অন্যরা কিছু উপকারী ও অপকারী শক্তির আরাধনা করে। অরুণাচলের দ্রৌপদীদের বিশদ বুঝতে হলে গ্যালংদের আর্থ-সামাজিক দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়।

গ্যালংদের পুরুষ শাসিত সমাজ। পিতৃধারায় সন্তানের পরিচয়। পুরুষ শাসিত সমাজ হলেও, সমাজে এবং সংসারে গ্যালং রমণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষিকাজই গ্যালংদের মূল উপজীবিকা। কৃষিকাজেও গ্যালং রমণী পুরুষদের সঙ্গে সমান ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্যালং কন্যা গোত্রীয় ভোগ্যা হলেও নারীর মূল্যবোধের প্রতি গ্যালংরা বিশ্বাসী। গ্যালং রমণীরা সব সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

নারীর গতি-বিধি ও চলাফেরায় গ্যালং সমাজে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা খর্ব করা হয়নি। এমন কী প্রাক্ বিবাহ যৌন সম্পর্ক গ্যালং সমাজে বিশেষ কোনও আলোড়ন ও আলোচনার বিষয় নয়। নীতিগতভাবে গ্যালং রমণী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারে। এমন কী ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার অধিকারও তাদের আছে।

নিজের আয়ের উপর গ্যালং রমণীর অধিকার সম্পূর্ণ নিজস্ব। স্বামী বা অন্য কেউ সেই আয়ের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না ও অংশও দাবি করতে পারে না। বিধবা বিবাহ গ্যালং সমাজে প্রচলিত। তবে পুনর্বিবাহ নির্ভর করে তার মত ও মর্জির উপর। পুরুষ শাসিত সমাজ হলেও-সেখানে জুলুম চলে না।

এই সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও গ্যালং সমাজে নারীর স্থান পুরুষের নীচে। সামাজিক ব্যবস্থা অনুযায়ী গ্যালং কন্যারা পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীল। আমাদের সমাজের মতই গ্যালংরা মনে করে, পিত্রালয় নারীদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। পিত্রালয় মেয়েদের কাছে সাময়িক তাঁবু। এই তাঁবু থেকে একদিন তাকে অন্য ঘরে যেতেই হবে। পিতৃশাসিত সব সমাজের মত গ্যালং সমাজেও মেয়েরা পিতার সংসারের চিরস্থায়ী সদস্যা নয়।

আকাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত বিবাহের জন্য গ্যালং কন্যারা মনে মনে প্রস্তুতি নেয়। যে কোনও সমাজের মত বিবাহ গ্যালং সমাজে পবিত্র বিষয়। তাদের সমাজে বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ প্রথা প্রচলিত। যোগাযোগ করে যে বিবাহ স্থির হয়, গ্যালংরা তাকে বলে, 'নিধাতনাম'। গ্যালংদের ভাষায় গোপন বিবাহ 'কাইম হিনাম'। অপহরণ করে বলপূর্বক বিবাহের নজির গ্যালং সমাজে অনুপস্থিত নয়। তবে বেশির ভাগ বিবাহ অভিভাবকেরা যোগাযোগ করেই দিয়ে থাকেন।

আপনাদের সমাজে মেয়ের বিয়ের জন্য বাবা-মায়ের চোখে ঘুম থাকে না। গ্যালং সমাজে ঠিক তার উলটো। বরপক্ষ কনের সন্ধানে হা-পিত্যেশ করে বেড়ায়, যদিও গ্যালং সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি।

বিয়ের প্রস্তাব প্রধানত আসে বরের পক্ষ থেকে। তারা কিছু উপঢৌকন নিয়ে কনের পিতার দ্বারস্থ হয়। আপনাদের সমাজে কনের পিতা অপরাধী মুখ করে যেমন বরের বাবার সামনে বিনত হয়ে থাকে, গ্যালং সমাজে বরের পিতাকে অনুরূপ অবস্থায় থাকতে হয়।

অভিভাবকদের মধ্যে বিবাহের কথা চললেও কনের বাবা যথার্থ গণতান্ত্রিক। বিবাহযোগ্য কন্যার মতামত নেওয়া গ্যালং সমাজে একটা স্বীকৃত ব্যবস্থা। তবে কনের মতের বিরুদ্ধে বিবাহ যে অনুষ্ঠিত হয় না, তা নয়। মতের বিরুদ্ধে অনেক কনেকে অভিভাবকের নির্দেশে বিবাহ করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থারাও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটছে। সে প্রসঙ্গ পরে।

বরের বাবার যৌতুকের চাহিদা মেটাতে অপারগ পিতা আপনাদের সমাজে অনেক কন্যাকে অনূঢ়া রাখতে বাধ্য হয়। গ্যালং সমাজে কনেপণের চাহিদা এত বেশি যে, বহু আর্থিক সঙ্গতিহীন মানুষ ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনতে পারে না—সেই জন্যেই যৌথ স্ত্রীর ব্যবস্থা।

গ্যালং সমাজে যে কোনও বিবাহেই কনেপণ অপরিহার্য। ভালবেসে বা অপহরণ করে বিয়ে করলেও কনেপণ থেকে রেহাই নেই। যদি কোনও গ্যালং যুবতী নিজের সমাজ বহির্ভূত অন্য কাউকে বিয়ে করে, সেখানে অবশ্য কনেপণের প্রশ্ন থাকে না। কনেপণ নির্ধারিত হয় বিবাহের সঙ্গে সমন্বয় রেখে। সবচেয়ে কম কনেপণ অন্তত একটি মিথুন ও একটি গরু। সর্বোচ্চ কনেপণ কুড়িটি মিথুন কুড়িটি গরু এবং পিতলের বাসন-সামগ্রী। অপারগ হলে বরের পিতা কিস্তিতেও কনেপণ শোধ করতে পারে। তবে তা নির্ভর করে কনের পিতার মর্জির উপর। যৌতুক ঠিকমত না দিতে পারলে, আপনাদের সমাজে মেয়েকে অনেক দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। বধূ নির্যাতন এমন কী হত্যা এখন প্রায় দৈনন্দিনের ঘটনা। গ্যালংরা ঠিক সময় মত কনেপণের কিস্তি শোধ করতে না পারলে অনেক ক্ষেত্রে ঘর ভেঙে যায়।

সামাজিক প্রথানুযায়ী শ্বশুরালয়ে পাঠাবার সময় কন্যার পিতা কিছু গহনা দিয়ে থাকে। সে গহনা তার নিজস্ব। এই গহনার উপর শ্বশুরালয়ের কারও অধিকার নেই। পূর্বেই বলেছি , গ্যালং সমাজে নারী মহামূল্যবান সম্পদ। সম্পদ হস্তান্তরের ক্ষতিপূরণ হিসেবেই কনেপণের ব্যবস্থা তাদের সমাজে প্রচলিত।

কিন্নরদের মধ্যেও প্রায় একই রকম ব্যবস্থার প্রচলন আছে। বিয়ের সময় বরের পিতাকে কনেপণ হিসাবে কিছু জমি ও সম্পত্তি কনের নামে লিখে দিতে হয়। এই কন্যা-যৌতুককে কিন্নরদের ভাষায় বলা হয় 'বেথাউপনো'। প্রদত্ত সম্পত্তি কনের নিজস্ব।

অর্থনৈতিক দিক থেকে কন্যাকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই কিন্নর সমাজে কনেপণের প্রচলন। যদি কোনও কিন্নর বধূকে নিগ্রহ ও বলপূর্বক বহিষ্কার করে দেওয়া হয়, তাহলে প্রদত্ত সম্পত্তির আয় সেই বধূর জীবন-যাপনে সাহায্য করে।

যদি কোনও দুষ্ট প্রকৃতির বরের পিতা পুত্রবধূ পরিত্যাগের পর প্রদত্ত সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে, তাহলে গ্রামের পঞ্চায়েত পরিত্যক্তা বধূর সমর্থনে এগিয়ে আসে। যদি কোনও কিন্নরী স্ব-ইচ্ছায় স্বামীদের পরিত্যাগ করে চলে যায়, সেক্ষেত্রে প্রদত্ত সম্পত্তির উপর তার কোনও অধিকার থাকে না। কিন্নর ও গ্যালংদের সমাজে কন্যার ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্যেই এই কনেপণের ব্যবস্থা।

বিবাহের মাধুর্য অনেক সময় বিচ্ছেদ-বেদনায় বিধুর হয়ে ওঠে। বিবাহ-বিচ্ছেদ গ্যালং সমাজে প্রচলিত। তবে বিচ্ছেদ চাইলেই সহজে বিচ্ছেদ পাওয়া যায় না। উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে স্বামী বা স্ত্রী কেউ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে না। নানা কারণে বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ আসে। তার মধ্যে ব্যাভিচার, নিষ্ঠুরতা, জুয়া, স্বামী বা স্ত্রীর দীর্ঘদিন অনুপস্থিতি ও দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ প্রভৃতি কারণে গ্যালং সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

বিচ্ছেদের পর গ্যালংরা সন্তানদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। পিতার ভাগে থাকে পুত্র, আর কন্যাকে সঙ্গে নেয় মা। যদি কোনও স্ত্রী বিচ্ছেদ চায় এবং তা যদি কার্যকর হয়, তাহলে স্বামীর পিতা-মাতা বিয়ের সময় প্রদত্ত কনেপণ ফিরে পায়। তাছাড়া জরিমানা হিসাবে স্ত্রীকে একটি মিথুন স্বামীকে দিতে হয়। বিচ্ছেদ প্রাপ্তা কোনও স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী নয়— এমন কী দাবিও করতে পারে না। বিচ্ছেদের পর গ্যালং সমাজে কোনও নারীকে ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয় না। আপনাদের সমাজে বিচ্ছেদ প্রাপ্তা রমণীর জীবন খুব নিরাপদ ও সহজ নয়। আইন অনুসারে সে স্বাধীন হলেও সমাজের বক্রদৃষ্টি তার উপর থেকেই যায়। কিন্তু গ্যালং সমাজে এ-সব অনুপস্থিত। কোনও সামাজিক কলঙ্ক তার উপর আরোপিত হয় না। আপনাদের সমাজে বিচ্ছেদপ্রাপ্তা রমণীর পুনর্বিবাহ একটি বিশেষ সমস্যা। কিন্তু গ্যালং সমাজে এটা আদৌ কোনও সমস্যা নয়। সেখানে স্বামী সস্তা এবং দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণে কোনও বাধা নেই। তাদের মধ্যে বিচ্ছেদেও যেমন বেগ নেই—পুনর্বিবাহেও তেমন আবেগ নেই। বিচ্ছেদ প্রাপ্তা কোনও গ্যালং রমণী ইচ্ছা করলে পিতৃগৃহে ফিরে যেতে পারে। পিত্রালয়ে অনেক আদর ও সোহাগের সঙ্গেই তার স্থান হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা সন্তান নিয়ে পুনর্বিবাহ করে।

বিধবাদের সম্পর্কে গ্যালং সমাজে আরও কিছু শিথিল ব্যবস্থা আছে। সে ইচ্ছা করলে নিজের পছন্দ মত কাউকে বিয়ে করতে পারে। গোত্র বর্হিভূত কাউকে বিয়ে করলে, সে ক্ষেত্রে সমস্ত কনেপণ, যা সে প্রথম বিয়ের সময় পেয়েছিল, ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। সাধারণত তার নতুন স্বামী এই কনেপণ ফিরিয়ে দিয়ে থাকে।

কেউ যদি পুনর্বিবাহ না করে বৈধব্য পালন করতে চায়, গ্যালং সমাজে তা সে নিরুপদ্রবে করতে পারে। তবে প্রথানুযায়ী স্বামীর ভাই তার উত্তরাধিকারী হয়। পূর্বের

সম্মান নিয়েই সে নতুন স্বামীর ঘর করতে পারে।

খাসিদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক গ্যালং সমাজে মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হয় না। যদি কোনও ব্যক্তি একমাত্র কন্যা সন্তান রেখে মারা যায়, সে ক্ষেত্রেও সম্পত্তি পিতৃধারায় চলে যায়, মেয়ে সেই সম্পত্তির মালিক হতে পারে না।

সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে গ্যালং রমণীর বিশেষ কোনও ভূমিকা নেই। প্রতিটি গ্যালং গ্রাম পঞ্চায়েতকে বলে কেবাং। গ্রামের প্রতিপত্তিশালী লোকেরাই কেবল কেবাং-এর সদস্য হয়। অলিখিত সংবিধান অনুসারে মেয়েদের অবশ্য কেবাং-এর সদস্য হতে কোনও বাধা নেই। তারা কেবাং-এ বসতে পারে কিন্তু আলোচনায় অংশ নিতে পারে না। নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে জড়িত কেবাং-এ মেয়েদের আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে। কেবাং-এর নির্বাচনে তারা ভোট দেয় কিন্তু প্রার্থী হয় না। তবে বর্তমানে পুরনো ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে গ্যালং রমণী শুধু নিজেদের কেবাং নয়, অঞ্চল সমিতি, বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচনে অংশ নেবে। বর্হিজগতের আধুনিক ধ্যান-ধারণা, ধীরে ধীরে গ্যালং সমাজে স্থান করে নিচ্ছে। ধর্মীয় উৎসবে মেয়েরা নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে। সামাজিক রীতি অনুযায়ী কোনও গ্যালং রমণীর পূজারিণী হতে বাধা নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও পূজারিণীর সন্ধান মেলেনি। গ্যালং ভাষায় পূজারীকে বলা হয় 'নাইবোস'। পুরুষেরাই নাইবোসের কাজ করে। অবশ্য পূজোর উপাচার তৈরি ও প্রসাদ বিতরণে মেয়েদের একচেটিয়া অধিকার।

প্রত্যেক সমাজে আমোদ-প্রমোদ ও অন্যান্য উৎসব থাকেই। গ্যালং সমাজে কিছু বেশি আছে। অভাব-অনটন কখনই তাদের মুখের হাসিকে ম্লান করে দেয় না। বরং উল্টো করে বলা যায়, হাসি ও আনন্দ দিয়ে তারা দুঃখকে জয় করে।

ঘরে তৈরি মদ্য পান উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এই মদকে তারা বলে 'অপাং'। পোনাঙ্ নৃত্য ও গানের জন্য গ্যালংরা জনপ্রিয়। ওরা মুখ্য গায়ককে বলে, 'মিরি'। প্রথমে মিরি গান শুরু করে। তারপর নারী ও পুরুষ সমবেত কণ্ঠে সেই গান গায়। গানের সঙ্গে চলে নাচ। মিরিকে ঘিরে নারী-পুরুষ একটি বৃত্ত তৈরি করে। মিরিকে মাঝখানে রেখে পুরুষ ও রমণী পরস্পরের কোমর ধরে বৃত্তাকারে নাচে। সেই নাচের সময় যদি সমাজ বহির্ভূত কোনও অতিথি উপস্থিত থাকে, যোগ্য সম্ভ্রম দিয়ে তাকে অংশ নিতে অনুরোধ করে।

গ্যালংরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। অতিথিকে তারা তাদের আদি পুরুষ আবোতানির দূত বলে মনে করে। অতিথি সেবার দায়িত্ব থাকে গ্যালং রমণীর উপর। অতিথিকে সর্বতোভাবে খুশি করাই গ্যালং রমণীরা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে। গ্যালং বসতি এক গোত্রীয়। অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা ডার্মিটারি থাকে। বিভিন্ন উপজাতিরা সেই ডার্মিটারিকে তাদের ভাষায় একটা নাম দিয়ে থাকে। কিন্তু গ্যালং গ্রামে কোনও মোরাং নেই। কারণ গ্রামের ছেলে-মেয়েরা ভাই-বোনেদের মতই একসঙ্গে বড় হয়ে ওঠে।

বহির্বিশ্বের প্রভাব গ্যালং সমাজের ওপর ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করেছে। আধুনিক শিক্ষা তাদের প্রচলিত সামাজিক রীতি ও ধ্যান- ধারণার পরিবর্তন আনছে। এই পরিবর্তন গত দু-দশকের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মেয়েরা আজকাল নিয়মিত স্কুলে যায়। নিজেদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আর সমাজে পুরুষদের যৌথভোগ্যা হয়ে থাকতে চাইছে না। পুরাতনী ব্যবস্থাকে তারা সমাজের দুষ্টক্ষত হিসাবে ভাবতে শুরু করেছে। তারা বুঝতে শিখেছে যৌথ যৌন ব্যবস্থা নারীর স্বাধীনতা ও স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। শিক্ষিত গ্যালং ছেলে-মেয়েরা বাল্য বিবাহ ও কনেপণের বিরোধী। শিক্ষা তাদের পোশাক, আচার ও অভ্যাসের পরিবর্তন এনেছে। সম্প্রদায় বহির্ভূত বিবাহ এখন গ্যালং সমাজ মেনে নিতে শুরু করেছে। অরুণাচলের দ্রৌপদীরা প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে। সময় লাগলেও জয় তাদের অনিবার্য। আমি আর প্রশ্ন করি না। অরুণাচলের দ্রৌপদীর কথা ভাবতে ভাবতে লোয়ার লাসুমিয়ারে নিজের ঘরে ফিরে আসি। কুয়াসায় ঢাকা শিলং-এ শুধু পাইনের পাতায় মর্মর ধ্বনি ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

৯

শেরডুকপেন

নামচুমকে এমন অফমুডে আমি কখনও দেখিনি। গারো পাহাড়ের বালফাক্‌রাম থেকে ফিরে আসার পর তিনি কেমন যেন হয়ে উঠেছেন। অবশ্য নামডাফা জীবপরিমণ্ডলের অফিসার ইন্দ্রজিৎ নামচুম পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযা কখনও দার্শনিক, কখনও সমাজ বিজ্ঞানী আবার কখনও বা মানববিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন।

বালকাক্‌রামও নামডাফার মত জীবপরিমণ্ডল। কিন্তু বালফাক্‌রামে 'বায়োডাইভারসিটি' নামচুমকে কিছুক্ষণের জন্য দার্শনিক করে তুলেছিল। বালফাক্‌রামের সঙ্গে জড়ানো কিংবদন্তি নিয়ে সারা পথ ভাবতে ভাবতে ফিরেছেন তিনি। আমি জানি শিলং ফিরে আসার পরেই নামচুমের পরিবর্তন ঘটে যাবে। শিলং ক্লাবে ঘন্টা দুই বসলেই নামচুম আবার নামচুমে ফিরে আসবেন।

আমার মাথায় ঘুরছিল শেরডুকপেন বিধবাদের কথা। তুরার সার্কিট হাউসে বসে শেরডুকপেন বিধবাদের কথা বলতে শুরু করেছিলেন নামচুম। কিন্তু তাদের জীবনের গভীরে প্রবেশের আগেই তিনি বালফাক্‌রামের গহন বনে ঢুকে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে আর শেরডুকপেন বিধবাদের কাহিনীতে ফিরিয়ে আনতে পারিনি।

মানুষটি আপনভোলা হলেও, বড়ই কর্তব্যপরায়ণ। বন্ধুবাৎসল্যে তাঁর কোনও জুড়ি নেই। প্রয়োজনে তিরাপের মিঁয়াও থেকে রাতারাতি শিলং চলে আসা তাঁর কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। ধর্মে বৌদ্ধ ইন্দ্রজিৎ নামচুম আমাকে অরুণাচলের অনেক আদি ও উপজাতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

যা ভেবেছিলাম তাই হল। শিলং ক্লাব থেকে লোয়ার লাসুমিয়ারের বাড়িতে ফিরে নামচুম বললেন, আজ আর ঘুমাবো না।

—কেন?

নামচুম বলেন, শেরডুকপেন বিধবাদের কাহিনী বলা হয়নি। আজ রাতে তাদের কাহিনী বলব।

ইলেকট্রিক হিটারের সামনে বসে নামচুম বললেন, শেরডুকপেনদের কথা আজ রাতেই শেষ করতে হবে। ভোরেই আমি ফিরে যাব তিরাপ। অনেকদিন নোয়াডিহিং-এর গান শোনা হয়নি। বলেই মৃদু হাসেন নামচুম। আমি জানি শেরডুকপেনদের গল্প আজ রাতে না শুনলে, হয়ত আর কোনও দিনই শোনা হবে না। নামচুমেরও 'প্রাইওরিটি লিষ্ট' থেকে শেরডুকপেনদের নাম কাটা যাবে।

নামচুম বলেন, অকাল বৈধব্য শেরডুকপেন রমণীর কাছে এক অভিশাপ।

—প্রথমেই বিধবাদের নিয়ে শুরু করলেন।

—হ্যাঁ, শেরডুকপেন সমাজে বিধবারাই সবেচেয়ে বিষন্ন নায়িকা।

—বিষন্ন নায়িকা!

নামচুম বলেন, বিধবা উত্তরাধিকার প্রথা অরুণাচলের কম-বেশি সব উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শেরডুকপেনদের সমাজে এই প্রথা অনুপস্থিত।

—পাশাপাশি থেকেও এমন বৈষম্য কেন?

নামচুম বলেন, বৈষম্যের কারণ মানব বিজ্ঞানীরা এখনও খুঁজে চলেছেন। কবে যে এর সন্ধান পাওয়া যাবে—তা একমাত্র মহাকারুণিক বুদ্ধই জানেন।

কেন?

জানি, বার বার প্রশ্ন করলে নামচুম বিরক্ত বোধ করেন। চুপ করে তাঁর গল্প শোনাই ভাল। রাতের শিলং শীতে কুঁকড়ে গেছে। ঘন কুয়াসায় ছবির মত শহরটি ঝাপসা হয়ে গেছে। রাস্তার আলোর ঔজ্জ্বল্য কুয়াসার আস্তরনে ম্লান।

নামচুম বলেন, শেরডুকপেন সমাজ বিধবা-বিবাহ বিরোধী। তারা বিধবা বিবাহকে কার্যত ঘৃণার চোখে দেখে। নারীকে তারা পুরুষের ভোগ্যবস্তু হিসাবে ভাবতে পারে না।

—নারীদেরও তো আশা-আকাঙক্ষা আছে।

নামচুম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। বলেন, আমি শুধু শেরডুকপেনদের সমাজ ব্যবস্থার কথা বলছি। সামাজিক অনুশাসন ভেঙ্গে যদি কোনও বিধবা স্ব-গোষ্ঠী বা গোষ্ঠী বহির্ভূত কাউকে পুনরায় বিবাহ করে, শেরডুকপেন সমাজ তার ভাল-মন্দ ও নিরাপত্তার কোনও দায়িত্ব নেয় না।

সাধারণত প্রয়াত পতি অথবা পিতৃগৃহে তাকে আমরণ বৈধব্য পালন করতে হয়। প্রতিবেশীদের মধ্যে যেখানে বিধবা উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত, সেখানে শেরডুকপেনেরা শুচিবাই গ্রস্ত হয়ে উঠল কেমন করে, সমাজ বিজ্ঞানীরা এখনও তার হদিশ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অকালে বিধবা হলে শেরডুকপেন রমণীরা নিজেদের জৈবিক সত্তার গলা টিপে রাখে।

নামচুম বলেন, অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে খাদ্যাখাদ্যের বাছ-বিচার না থাকলেও- শেরডুকপেন সে বিষয়ে একটি ব্যতিক্রমী জনগোষ্ঠী।

পরপুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা গোপন অভিসার শেরডুকপেন সমাজ সহ্য করে না। পরপুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা রমণীর অবৈধ প্রণয় তাদের সমাজে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। অবশ্য এই অপরাধে পুরুষেরাও সমান অপরাধী।

স্বেচ্ছাচার শেরডুকপেন সমাজ কখনই প্রশ্রয় দেয় না।

—যদি কেউ এই অপরাধ করে ফেলে—

নামচুম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে মেয়েরা দৈহিক নির্যাতন থেকে মুক্তি পেলেও—সমাজ জীবনে তাদের বিড়ম্বিত হতেই হয়।

—আর পুরুষের ক্ষেত্রে?

—শাস্তির মাত্রা অনেকক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে লজ্জা দেয়। গোষ্ঠী ও সমাজ বিরোধী অপরাধের জন্য গোম্‌ফার একটি অন্ধকার কক্ষে (লাগং) বন্ধ করে রাখা হয়। গ্রামের প্রতিটি ব্যক্তি সেই অপরাধীকে একবার করে বেত্রাঘাত করে। প্রতিদিন প্রত্যেককে নূতন বেত নিতে হয়। প্রথমদিন বেত্রাঘাত করে থিক্‌ অসখাও বা গ্রাম প্রধান। অপরাধের তারতম্য বিচার করে অপরাধীকে কোমড়ে দড়ি বেঁধে গ্রাম ঘোরানো হয়। মুখে চোঙ্গা লাগিয়ে একদল মানুষ অপরাধীর অপরাধ ঘোষণা করে।

মনে মনে ভাবি এমন ঘটনা যে আমাদের সমাজে না ঘটে তা নয়। মাঝে মাঝে শোনা যায়, অমুক গ্রামের অমুককে ধর্ষণের অভিযোগে মাথান্যাড়া করে, মুখে চুণ-কালি মাখিয়ে পথে পথে ঘোরানো হয়েছে।

কথাটি মনে এলেও প্রকাশ করি না। চুপ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। বাইরে পাইনের পাতা বেয়ে টুপ-টাপ শিশির ঝরার শব্দ।

নামচুম বলেন, সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসের জন্যই হোক, শাস্তির ভয়াবহতার আতঙ্কের জন্যই হোক অথবা গুরু পদ্মসম্ভাবের প্রভাবেই হোক, শেরডুকপেন সমাজে অপরাধ প্রবণতা নেই বললেই চলে। নারী পুরুষ উভয়েই ভদ্র, বিনয়ী, বন্ধুবৎসল ও অতিথি-পরায়ণ।

শেরডুকপেন পুরুষেরা কিন্নর,-- নারীরা অপ্সরা। ইংরেজ নৃ-তাত্ত্বিকেরা তাদের 'চার্মিং পিপল্' বলে আখ্যায়িত করেছেন। শেরডুকপেন-'চার্মিং লেডি' অদৃষ্টদোষে বিধবা হলেও দ্বিতীয়বার ভার্য্যার মর্য্যাদা পায় না। আমরণ তাকে বৈধব্য পালন করতে হয়।

—ওদের সমাজে একজন বিদ্যাসাগর থাকলে ভাল হত। নামচুম মৃদু হেসে বলেন, কিছুই হত না। শেরডুকপেন সমাজের শিকরের সঙ্গে এই প্রথা জড়িয়ে আছে। একে তুলে ফেলা খুবই শক্ত।

নামচুম থামেন। কাঁচের সার্সি দিয়ে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। লোয়ার লাসুমিয়ার কুয়াসায় ঢাকা। কুয়াসার আস্তরণ ভেদ করে দু'গজ দূরের জিনিসও দেখা যায় না। মুখ ঘুরিয়ে নামচুম বলেন, শুধু বিধবা নয়, বিবাহ বিচ্ছিন্ন রমণীরাও শেরডুকপেন সমাজে আদরণীয়া নয়। বৈধব্য রোধ করা সম্ভব নয় বলে তারা অদৃষ্টকে দোষারোপ করে চুপ করে থাকে কিন্তু দাম্পত্য বিচ্ছেদ কেউ সহজে ঘটাতে চায় না। বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রাপ্ত কোনও রমণীর দ্বিতীয়বার বিবাহ শেরডুকপেন সমাজে অত্যন্ত বিরল ঘটনা।

বাল্‌ফাক্‌রামে ফসিল হয়ে যাওয়া নারীমূর্তির কিংবদন্তি শুনে নামচুম বলেছিলেন, শেরডুকপেন রমণীরা দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদকে বড় ভয় পায়। দাম্পত্য জীবন সাধারণত সুখের। যদি কোনও কারণে সেই সুখে চিড় ধরেও—তা হলে স্বামী বা স্ত্রী—কেউই শেষ সর্বনাশটি দেখতে চায় না। তাই তারা পরস্পরকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য মানবিক পন্থাই অনুসরণ করে।

বাল্‌ফাক্‌রামের 'কালো তালাবের' পাশে বসে নামচুম বলেছিলেন, অরুণাচলের কামেং জেলায় শেরডুকপেনদের বাসস্থান। পাহাড়ে ঘেরা বৃষ্টি ভেজা উপত্যকায় তাদের ঘর-বাড়ি। বন আর পাহাড়ের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে শহুরে দূষণ এখনও তাদের উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েনি। উপত্যকার উত্তরে বমডি-লা, দক্ষিণে বোমপু-লা এবং পশ্চিমে নারিং-লা। এতগুলি লা বা পাসের মধ্যে গোটা কয়েক শেরডুকপেন গ্রাম। হাজার ছয়েক ফুট উপরে অবস্থিত যে কোন লা বা পাস দিয়ে তাদের গ্রামে পৌঁছানো যায়।

নৃ-তাত্ত্বিকদের মতে তারা তিব্বতীয় মঙ্গোলয়েড। কবে তাদের পূর্বপুরুষ অরুণাচলে বসতি স্থাপন করেছিল—উত্তরপুরুষেরা তার হিসাব রাখতে পারেনি। শেরডুকপেনদের অমায়িক ব্যবহার, অহিংস আচরণ ও আতিথেয়তা অরুণাচলে সুপরিচিত। গুরু পদ্মসম্ভাবের শিষ্য শেরডুকপেনদের প্রতি গ্রামে বৌদ্ধ মন্দির অবশ্যই থাকবে।

গ্রামের মাঝখানে দিবা-রা বা ধর্মধ্বজা উড়িয়ে রাখে। সত্যের প্রতি আস্থার প্রতীক এই ধর্মধ্বজা। নামচুম বলেন, ধর্মের কথা থাক। শুরু করেছিলাম বৈধব্য দিয়ে, ফিরে আসি বিবাহে। বিবাহ না হলে বৈধব্যের প্রশ্ন ওঠে না।'

আদিদের মত রাশেং বা নক্‌টেদের মত ইয়ান-পোহ্ না থাকলেও-রঙ্‌বঙ্‌ বা কুমারী নিলয় প্রতি গ্রামেই আছে। এই কুমারী-নিলয় থেকেই শুরু হয় তাদের জৈবিক জীবন। এখানেই নিহিত থাকে ভালবাসার বীজ আর যৌনরহস্য উদ্‌ঘাটনের চাবি কাঠি। অনেক স্তব্ধ রাত অতিক্রান্ত হবার পর, সেই বীজ কোনও এক সময় অঙ্কুরিত হয়। তারপর একদিন প্রস্ফুটিত প্রেয়সীর হাত ধরে তারা সংসার জীবনে প্রবেশ করে। এই পথটুকু পাড়ি দিতে তাদের অনেকগুলি সামাজিক বেড়া ডিঙ্গোতে হয়। রীতি-নীতি মেনে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে পরস্পরের প্রতি চিরদিন অনুগত থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হয়।

—আদিদের রাশেং-এর সঙ্গে রঙ্‌বঙে্‌র কি বিশেষ তফাৎ আছে? দু'টি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য তো একই, তাই না?

নামচুম বলেন, ঠিক তাই, রাশেং আর রঙ্‌বঙে্‌র মধ্যে বিশেষ কোনও অমিল নেই। আমি বস্তারের ঘটুল দেখিনি। তবে এলউইনের বই পড়ে মনে হয়েছে, শেরডুকপেনদের কুমারী-নিলয়ের সঙ্গে মুড়িয়াদের ঘটুলের সামান্য সাদৃশ্য আছে। শেরডুকপেন কন্যাদের বার বছর অতিক্রান্ত হলেই তারা রঙ্‌বঙে্‌ চলে যায়। মুড়িয়া কন্যারাও প্রায় একই বয়সে ঘটুল থেকে জীবনের শিক্ষা নেয়। মুড়িয়াদের ঘটুলের মত গ্রামের মাঝখানে ঘর নেই সত্য, তবে তারা ছোট পরিবারের বড় বাড়ির অতিরিক্ত ঘর রঙ্‌বঙে্‌র কাজে ব্যবহার করে।

যদিও রঙ্‌বঙে্‌র আভ্যন্তরীণ রহস্য গ্রামের কারও কাছে অজ্ঞাত নয়, তবুও যুবকেরা সেখানে যাবার জন্য রাতের নিস্তব্ধ প্রহরকে বেছে নেয়।

হঠাৎ নামচুম হেসে ওঠেন। অনাবিল হাসি অনেকক্ষণ তাঁর ওষ্ঠে ঝুলে থাকে। ধীরে ধীরে বলেন, ভাল লাগলেই কাছে পাওয়া যায় না। সম্মতির প্রয়োজন হয়। অসম্মতিতে রাতের সোহাগের চেষ্টা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। যুবকেরা তাদের প্রেয়সীর প্রিয় জিনিসটি সঙ্গে নিতে ভোলে না।

এমনি করে একদিন মনের সম্পর্ক দেহে সঞ্চারিত হয়। নামচুম মনে করিয়ে দেন, কোনও ছেলে তার নিজের গোত্রের কোনও মেয়েকে ভালবাসতে পারে না। শেরডুকপেন সমাজে সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। একবার যদি ছেলে-মেয়ের মধ্যে আংটি বিনিময় হয়ে যায়— তা হলে সে আংটি কেউ আর ফিরিয়ে নিতে পারে না। বিয়েটা তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই প্রথম দিনেই তারা পরস্পরের গোত্র জেনে নেয়।

শেরডুকপেন সমাজেও শ্রেণী বিভাগ আছে। তবে সে শ্রেণী বৈষম্য তথাকথিত আধুনিক সমাজের রক্তক্ষয়ী জাতপাতের লড়াই নয়। তারা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও কারিগর। শেরডুকপেন ভাষায় অভিজাতদের বলা হয় খং, আর মধ্যবিত্তদের পরিচয় 'ছায়োস'। কারিগর শ্রেণীকে বলা হয় ইয়ান-লো। শ্রেণী বহির্ভূত বিবাহ নিষিদ্ধ না হলেও—শেরডুকপেন সমাজ আন্তঃশ্রেণী বিবাহ পছন্দ করে না। তবে সমাজের অন্যান্য বিষয়ে এই শ্রেণী বিভাগ আদৌ কোনও অন্তরায় নয়। যে কোনও ছেলে তার মামাতো বোনকে বিয়ে করতে পারে। তেমনি কোনও মেয়ের পক্ষে তার পিসতুতো দাদাকে বিয়ে করা কোনও বাধাই নয়। বরং এই ধরনের বিবাহ শেরডুকপেন সমাজে অধিকতর প্রচলিত।

শ্যালিকাকে বিবাহ শেরডুকপেন সমাজে নিষিদ্ধ নয়। অরুণাচলের উপজাতিদের মধ্যে এই বিবাহ প্রথা প্রচলিত। স্ত্রীর ছোট বা বড় বোনকে বিবাহে বাধা নেই। কিন্তু স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় কোনও ব্যক্তি যদি ছোট বা বড় শ্যালিকাকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে সেই ব্যক্তিকে দ্বিগুণ কনেপণ দিতে হয়।

নামচুম বলেন, আপনার তো জানা আছে , কনেপণ প্রথা অরুণাচলের প্রায় সব উপজাতির মধ্যেই প্রচলিত।

কিন্তু—

নামচুম থামেন। তাঁকে প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। কারণ নামচুম নিজের মত করে গল্প বলেন। প্রশ্নের জবাব দিয়ে গল্পকে গতিচ্যুত করেন না।

নামচুম বলেন, শেরডুকপেন সমাজ তার ব্যতিক্রম। তাদের মধ্যে কনেপণ প্রথা যেমন নেই, তেমনি নেই যৌতুকের কড়াকড়ি। কনেপণ ও যৌতুকমুক্ত শেরডুকপেন সমাজ বিবাহকে কখনই কেনাবেচার দৃষ্টিতে দেখে না। বরং আত্মীয়তা নিবিড় করতে কনে ও বরের বাবা পরস্পরের মধ্যে এণ্ডির চাদর বিনিময় করে। আর্থিক অবস্থা ভাল হলে মিথুন বিনিময়েও বাধা নেই।

প্রাচ্যের স্কটল্যাণ্ড শিলং-এ রাত গভীর হয়। কুয়াসা আরও ঘন হয়। পাইনের পাতায় মর্মরধ্বনি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। নামচুম ঘরে তৈরি অপাং গলাধঃকরণ করে বলেন, জানেন তো, অরুণাচলের অনেক উপজাতির মধ্যে উল্কি কাটার প্রচলন আছে। তিরাপের ওয়ান্‌চো আর নক্‌টেদের মধ্যে উল্কির প্রচলন বেশি। নক্‌টে নারী-পুরুষ উভয়েই উল্কি কাটে। কিন্তু ওয়ান্‌চো সমাজে উল্কির প্রচলন শুধু মেয়েদের মধ্যে সীমিত। শেরডুকপেন সমাজে উল্কি কাটার প্রচলন নেই। প্রকৃতির করুণায় শেরডুকপেন পুরুষ যথার্থই রূপবান, এবং রমণীরা রূপসী। উল্কি কেটে তারা প্রকৃতিদত্ত দৈহিক সৌন্দর্যের হানি ঘটায় না।

নামচুম বলেন ধর্ম শেরডুকপেনদের ধমনীতে ধাবমান। ধর্মের সঙ্গে শেরডুকপেন সমাজের স্পর্শ বড় নিবিড়। মূলত বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুশাসনে তাদের সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতি গ্রামেই গোম্ফা বা স্তূপ রয়েছে। প্রতি গোম্ফা ও স্তূপের গায়ে লেখা থাকে 'ওম্ মণি পদ্মে হুম'। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকাল-সন্ধ্যায় গোম্ফায় প্রার্থনা বাধ্যতামূলক। গোম্ফায় পুরোহিত আছে। তাঁকে বলা হয় জি জি। অবশ্যও কোনও বড় অনুষ্ঠান জি জি পরিচালনা করেন না।

বড় অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য তাওয়াং ও ডিরাংজং থেকে লামারা আসেন। স্থানীয় জি জি তাঁদের সাহায্য করেন। শ্রেণী বিভাগ থাকলেও বুদ্ধের চরণাশ্রিত শেরডুকপেনেরা গোম্ফায় বসে এক সঙ্গে 'মণি-পদ্মে হুম' উচ্চারণ করে। পাশাপাশি বসে পুরুষ ও রমণীরা প্রার্থনা করে।

প্রার্থনা সভায় কোনও বৈষম্য নেই।

কিছু প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে এলেও নামচুমকে বাধা দিই না। তিনি বলতে থাকেন, বড় ধর্মীয় ধ্বজাকে শেরডুকপেনেরা বলে দরসিং। ডিরাংজং বা তাওয়াং-এর লামাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কোনও শুভ দিনে দরসিং ওড়ানো হয়। নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা সেই শুভ অনুষ্ঠানে গ্রামের এক জায়গায় সমবেত হয়। পূজা শেষে লামা বুম্মা

বা কমণ্ডলু থেকে পবিত্র বারি সমবেত সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেন। এই সময় সমবেত কণ্ঠে নারী-পুরুষ বলে ওঠে—ইহাস-হালো অর্থাৎ পরম করুণাময় তুমি আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ কর।

পূজা শেষে সকলেই একসঙ্গে ঘরে ফেরে। ঘরে ফেরা না পর্যন্ত সকলের মুখেই উচ্চারিত হয়, 'ওঁম্ মণি-পদ্মে হুম'।

এই মন্ত্রের মধ্যেই তারা খুঁজে পায় জীবনের সুখ-শান্তি আর সমৃদ্ধি।

নামচুম থামেন। তিনি নিজেও বৌদ্ধ। আপন মনে কয়েকবার উচ্চারণ করেন, 'ওঁম্ মণি পেমা হুম'। কিছুক্ষণ-চুপ করে থেকে নামচুম আবার ফিরে আসেন কুমারী-নিলয়ে। বলেন, কুমারী-নিলয় থেকে জীবন-সঙ্গিনী ঠিক করার পর শেরডুকপেন সমাজ আনুষ্ঠানিক বিবাহের অনুমতি দেয়। বর ও কনেপক্ষ দিন-তারিখ ঠিক করার জন্য ডিরাংজং বা তাওয়াং-এর লামাদের সঙ্গে পরামর্শ করে।

নামচুম বলেন, মোন্-পা-দের লিমোর মত শেরডুকপেনদের পঞ্জিকা আছে। গোম্ফার মধ্যে সেই পঞ্জিকা সযত্নে রক্ষিত থাকে। পঞ্জিকা দেখে বিবাহের দিন-তারিখ ঠিক করেন লামা। জি জি তাকে সাহায্য করে। বিবাহের পূর্বে কতগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। শেরডুকপেন সমাজে কনেপণ ও যৌতুক প্রথার প্রচলন নেই। তবে বিবাহের দিন কনের পিতা গ্রামবাসীদের ভোজে আপ্যায়িত করে।

ধর্মসূত্রে মোন্-পা-রা শেরডুকপেনদের কাছের মানুষ। তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক খুব বেশি না ঘটলেও-সামাজিক কোনও অন্তরায় নেই।

হঠাৎ নামচুম প্রশ্ন করেন, আপনি কর্মফলে বিশ্বাস করেন?

সহসা তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না। আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই নামচুম বলেন, শেরডুকপেনেরা কর্মফলে বিশ্বাসী। তারা চুন্‌গা স্যানংজে বা স্বর্গ ও স্যানং গো থং বা নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। পাপী-বিশেষ করে নারী ঘটিত পাপীরা স্যানংগো থং বা নরকে স্থান পায়। এই পাপ-ভয়ের জন্যেই শেরডুকপেন সমাজে ধর্ষণের ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। পোশাকে শেরডুকপেন পুরুষ ও রমণী খুবই সাদাসিধে। পুরুষেরা বৌদ্ধ ভিক্ষুকের মত সুতি বা এণ্ডির বাকু জড়িয়ে রাখে। শীতের সময় বুকখোলা একটি পশমের জ্যাকেট পরে নেয়। মাথায় দেয় ইয়কের লোম দিয়ে তৈরি টুপি। মেয়েদের অবশ্য অন্তর্বাস থাকে। বান দিয়ে মেয়েরা শক্ত করে চুল বেঁধে রাখে। কিন্তু অবিবাহিতা কন্যাদের খোঁপা বাঁধার নিয়ম নেই। অনেকে দীর্ঘ চুল মুখের উপর ফেলে ওড়নার প্রয়োজন মেটায়।

শেরডুকপেনেরা অত্যন্ত ভাল শিল্পী। তাদের তৈরি কাপড়ের নকশা ও রং অরুণাচলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হোঙ্ চঙ্ আর হোঙ্‌চি নামক একশ্রেণীর গাছের বাকলের আঁশ দিয়ে তারা সুতো তৈরি করে। সেই সুতো খুব মজবুত ও টেকসই। কাপড় বোনা, নকশা ও রং

এগুলি শেরডুকপেন মেয়েদের জন্মগত অধিকার। এ অধিকারের উপর পুরুষ হস্তক্ষেপ করে না।

বাজারের কসমেটিক শেরডুকপেন রমণীরা ব্যবহার করে না। তাই বলে কি শেরডুকপেন সুন্দরীরা প্রসাধনে বিমুখ?

নামচুম বলেন, আদৌ নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রসাধন সামগ্রী তৈরি করে নেয়। পাইন গাছের আঠা দিয়ে একরকমের ভেসেলিন তৈরি করে। সেই ভেসেলিন দিয়েই পাতলা ওষ্ঠ আর কোমল চিবুক রাঙ্গায়।

নামচুম বলেন, শেরডুকপেন সমাজে আহারের উপর নিষেধাজ্ঞা নেই। আমিষ ও নিরামিষ দুই-ই চলে। তরে নিরামিষের প্রতি তাদের আসক্তি একটু বেশি। বনের সংগৃহীত মধু দিয়ে তারা একরকমের পানীয় তৈরি করে। তার নাম চাট।

সব কথা শুনিয়ে নামচুম আবার ফিরে আসেন বিধবাদের কথায়। বমডি-লা, বোমপু-লা আর নারিং-লা দিয়ে ঘেরা শেরডুকপেন উপত্যকা। কর্মফলে বিশ্বাসী শেরডুকপেন বিধবারা ভগবান বুদ্ধের চরণাশ্রিত হয়ে থাকে। প্রতিবেশীদের ভালবাসায় বৈধব্যের যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে জীবনের প্রতি প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে।

১০

ইদু মিশমী

কনেপণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত ইদু মিশমী কন্যা পতি গৃহে যেতে পারে না। নববধূর স্বপ্ন না দেখে বিরহী স্বামীপণ মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব উপজাতির মধ্যেই কনেপণ-প্রথা প্রচলিত। কম হোক আর বেশি হোক কনেপণ বাধ্যতামূলক। কারণ কনেপণ না দিলে কন্যা সম্পদকে নিজের সম্পত্তি করা যায় না। কনেপণ দিতে অপারগ গ্যালং সম্প্রদায়ের অনেক পরিবার সব ভাই মিলে এক কন্যার পাণিগ্রহণ করে। অরুণাচল প্রদেশের লোহিত জেলার ডিবাং ভ্যালির ইদু মিশমীদের মধ্যে এই প্রথার কড়াকড়ি বড় বেশি। ফেল কড়ি মাখো তেল—নইলে পথ মাপো—প্রায় এই নীতিতে তারা বিশ্বাসী।

আমাদের সমাজে মেয়ে জন্মাবার পর থেকে বাবা-মা যেমন যৌতুকের চিন্তা করতে শুরু করে, উপজাতিরা ছেলের জন্মের পর তেমনি কনেপণের কথা ভাবতে থাকে।

ইদু মিশমীরা বিয়েকে বলে ব্রী। তাদের অলিখিত সংহিতায় ছ'রকমের বিবাহের প্রচলন আছে।

ইদু মিশমী সমাজে সমগোত্র ও রক্তের সম্পর্কে বিবাহ নিষিদ্ধ। কোনও ছেলে নিজের গোত্রের কোনও মেয়েকে বিবাহ করতে পারে না। আমাদের সমাজেও গোত্রান্তর অপরিহার্য। ইদু মিশমীরা তের পুরুষ পর্যন্ত গোত্রধারার বিচার করে পুত্র কন্যার বিবাহ স্থির করে। তারা বিশ্বাস করে, প্রচলিত ব্যবস্থার পরিপন্থী বিবাহ আদৌ সুখের হয় না এবং সন্তান-সন্ততি দুরারোগ্য রোগে আজীবন কষ্ট পায়। তাই তারা ভিন্ন গোত্র ও রক্ত সম্পর্কহীন অন্তরঙ্গ পরিবারের মধ্যেই পাত্র-পাত্রীর সন্ধান করে।

অলিখিত বিবাহ-বিধিতে এক স্ত্রীর ফতোয়া থাকলেও ইদু মিশমী জোয়ান একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। তবে পরস্ত্রী গমন আর পর পুরুষে আসক্তি ইদু মিশমী সমাজে শুধু

নিন্দনীয় নয় নিষিদ্ধও বটে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নেরা সামাজিক আভিজাত্য প্রকাশের জন্যে যথেচ্ছ স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে।

কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর অধিকার ও কর্তৃত্ব বিন্দুমাত্র খর্ব করে না। অন্যান্য সতীনেরাও বিনা বাক্য ব্যয়ে বড় সতীনের অনুগত থাকে। তাই বলে পরবর্তী স্ত্রীরা রক্ষিতা নন। যথারীতি কনেপণ দিয়েই অভিজাত ইদু মিশমী পুরুষ তাদের পাণি গ্রহণ করে। এবং যথাযোগ্য স্ত্রীর মর্য্যাদা দেয়। কারণ ইদু মিশমী সমাজ নারী-পুরুষের অবৈধ ও অনিয়ম মিলন বরদাস্ত করে না।

ইদু মিশমী সমাজেও ঘটক আছে, ঘটকালি প্রথাও প্রচলিত। ইদুরা ঘটককে বলে 'আবেয়া'। বিয়ের যোগাযোগ আবেয়ার মাধ্যমেই হয়। ঘটকালি করা বিয়েকে ইদু মিশমীরা বলে 'ইয়াকু ব্রী চিচাগা'। শুধু সংখ্যায় নয়, 'ইয়াকু ব্রী চিচাগাই' সামাজিক বিবাহের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। কিন্তু সকলের মন সব সময় নিয়মের সরণি বেয়ে চলাফেরা করে না। কখনও সখনও এদিক সেদিক চলে যায়। প্রচলিত বিধি-বহির্ভূত হলেও, ইদু মিশমী সমাজ তাকে মেনে নেয়। তবে তারা এসব বিষয়ে বেশি উৎসাহ দেখায় না। আগেই বলেছি, ইদু মিশমীরা গোত্র বহির্ভূত অন্তরঙ্গ পরিবারের মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে। এমন কি সন্তান মাতৃগর্ভে থাকাকালীন বিয়ে ঠিক করে রাখে।

বিয়ে স্থির হবার পর পাত্রপক্ষ আবেয়ার মাধ্যমে হাজার খানেক নগদ টাকা ও সমমূল্যের মিথুন আয়ুজেবা বা কনেপণ হিসেবে অগ্রিম দেয়। আবেয়ার পারিশ্রমিকও পাত্রপক্ষকে তখনই মিটিয়ে দিতে হয়। কনেপণের অর্ধেক মিটিয়ে দেবার পর বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু কনের পতিগৃহে যাওয়া হয় না। বাকি টাকা মিটিয়ে দেবার পর কনের উপর বরের পূর্ণ অধিকার জন্মায়।

পতিগৃহে যাবার আগে অথবা পতিগৃহে যাবার পর যদি সন্তানহীনা কনের মৃত্যু ঘটে, তাহলে কনের বাবা সম্পূর্ণ আয়ুজেবা বা কনেপণ বরের বাবাকে ফিরিয়ে দেয়। অবশ্য সম্পর্ক ভাল থাকলে। আর যদি মৃতা কনের কোনও বোন থাকে তাহলে তাকেই সেই বরের হাতে সমর্পণ করে। এরজন্য বরকে দ্বিতীয়বার পণ দিতে হয় না।

'আন্না ব্রী' বা শ্যালিকাকে বিবাহ করার প্রথা ইদু মিশমী সমাজে প্রচলিত। বড় বা ছোট শ্যালিকাকে যথারীতি কনেপণ দিয়ে বিয়ে করার ব্যবস্থা ইদু মিশমীর বিবাহ-বিধিতে আছে। সাধারণত স্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্যালিকাকে বিবাহ করে। এক্ষেত্রে আয়ুজেবার পরিমাণ অর্ধেক হলেই চলে। কিন্তু স্ত্রী জীবিতাবস্থায় শ্যালিকার পাণিগ্রহণ করলে আয়ুজেবার পরিমাণ দ্বিগুণ হয়।

যুবক-যুবতীর মন দেয়া নেয়া সব সময় সামাজিক অনুশাসনে শাসিত হয় না। পরস্পরের সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা অনেক সময় তাদের বে-পরোয়া করে তোলে। তারজন্য অবশ্য তারা গ্রাম ছেড়ে পালায় না। বনে জঙ্গলে গিয়ে মিলনের স্বর্গ রচনা করে না।

মেয়ের হাত ধরে ছেলে সরাসরি বাবার সামনে হাজির হয়। তাদের বাবা-মা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। গালি-গালাজ করে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দেয় না। কনের বাবা ছেলের বাবাকে ডেকে এনে চার হাত মিলিয়ে দেয়। এক্ষেত্রেও কনেপণ মাপ হয় না। এই বিবাহকে বৈধ করার জন্যে কনের পিতা একটা বড় রকমের ভোজের আয়োজন করে।

অতীতে ইদু মিশমী সমাজে প্রেমজ বিবাহ আদৌ জনপ্রিয় ছিল না। বর্তমানে তাদের সমাজেও পালা-বদলের পালা শুরু হয়েছে। অভিভাবকেরা মুখে কিছু না বললেও যুবক-যুবতীর মন দেয়ানেয়াকে আর সামাজিক রীতি-নীতির পরিপন্থী ভাবে না। ইদু মিশমীরা প্রেমজ বিবাহকে বলে 'আচিপু লোকজেন'।

বলপূর্বক অপহরণ করে বিয়ের ঘটনা ইদু মিশমী সমাজে ঘটে থাকে। যদিও তা সংখ্যায় কম। আবেগে উদ্বেল যুবক সুযোগ বুঝে অনিচ্ছুক মেয়েকে অপহরণ করে। সাধারণত মেয়ের বাবা জোর করে মেয়েকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে না। তখন সে আবেয়ার সাহায্য নেয়। এই বিয়েতে কনেপণ দ্বিগুণ দিতে হয়।

বিবাহের প্রকারভেদে কনেপণের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। মধ্যস্থতা করে আবেয়া। অপহরণকারীকে সবচেয়ে বেশি কনেপণ দিতে হয়। সম্ভবত অপহরণ করে বিবাহকে নিরুৎসাহিত করার জন্যেই ইদু মিশমী সমাজ এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কনেপণ বাধ্যতামূলক হলেও মেয়েকে যৌতুক দেওয়া আদৌ আবশ্যিক নয়। তবে সব মেয়েই বিয়ের সময় জন্মদাতার কাছ থেকে উপহার পায়।

কনেপণ মিটিয়ে দিলেও অনেক সময় সব কিছু ঠিকঠাক চলে না। মাঝে মাঝে মেয়ের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে। সে আর পতিগৃহে যেতে চায় না। কনেপণ সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেবার পর যদি কোনও মেয়ে এক বছরের মধ্যে পতিগৃহে না যায়, তাহলে মেয়ের বাবাকে দ্বিগুণ পরিমাণ কনেপণ ফিরিয়ে দিতে হয়। ইদু মিশমীরা অনিচ্ছুক কন্যাকে জোর করে পতিগৃহে পাঠায় না। তারা বিশ্বাস করে, সে সংসার সুখের হয় না।

এদের কনেপণ কিন্তু সামাজিক ব্যাধি নয়। ইদু মিশমী সমাজ কনেপণকে মেয়ের অর্থনৈতিক রক্ষাকবচ বলে মনে করে। যৌতুক প্রথা প্রচলিত না থাকলেও 'ইয়াকু অসো অরা' বা পিতৃ-উপহারের প্রচলন আছে। পিতৃহৃদয় চিরকালই কন্যা-কেন্দ্রিক। তাই পিতৃ-উপহার সব মেয়েরাই পেয়ে থাকে। মেয়েকে সে সাধ্যমত উপহার দেয়। সে উপহার প্রায় কনেপণের সমান। একটি মূল্যবান পুঁতির 'লকেপো' (হার) এক জোড়া কানের দুল, কিছু নগদ টাকা, একটি মিথুন ও একটি শুয়োর।

জীবনের পাশে যেমন মৃত্যু—বিবাহের পাশে তেমনি বিচ্ছেদ। বন্ধ্যাত্ব ও পরপুরুষের সঙ্গে সহবাস বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ। স্বামী অথবা স্ত্রী যে কেউ 'আবেলা' বা গ্রাম পঞ্চায়েতের দরবারে বিচ্ছেদের আবেদন জানাতে পারে।

বিচ্ছেদ চাইলে স্বামী-স্ত্রীকে কতগুলি শর্ত পালন করতে হয়। স্ত্রী যদি বিচ্ছেদের আবেদন করে, তাহলে তাকে প্রদত্ত কনেপণের দ্বিগুণ পরিমাণ মূল্য স্বামীকে ফিরিয়ে

দিতে হয়। আর যদি স্বামী বিচ্ছেদ চায়, তাহলে কনেপণ সে আর ফেরৎ পায় না। স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় যদি কোনও কারণে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে সেই সন্তানের উপর স্বামীর পিতৃত্বের অধিকার থাকে না।

অরুণাচলের ডিবাং ভ্যালীর অধিবাসী ইদু মিশমী। তারা মঙ্গোলীয়। ডিবাং-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মত ইদু মিশমীদের দৈহিক সৌন্দর্য্যও আকর্ষণীয়। মেয়েরা দীর্ঘাঙ্গী। গায়ের রং ঈষৎ তামাটে এবং অবশ্যই সুন্দরী। কিন্তু কেউ জানে না—কেন যে তারা নিজেরাই নিজেদের সৌন্দর্য্যের হানি ঘটায়। বদখত ভাবে চুল কেটে মুখশ্রীকে দৃষ্টিকটু করে। ছেলেরাও তাই। কপাল থেকে কানের পাশ দিয়ে চুল কামায়। বাঁ দিক কামানো, ডানদিকে লম্বা চুল। সমতলের অসমীয়ারা সম্ভবত এই জন্যেই তাদের 'চুল কাটিয়া' বলে।

মেয়েরা মাথার সামনের চুল ভুরু পর্যন্ত টেনে এনে গোল করে ছাঁটে। এলোমেলো চুলে সম্পূর্ণ কপাল ঢাকা থাকে। দু গালে পাতলা করে কাদার প্রলেপ দেয়। পিছনের লম্বাচুল এলো খোঁপা বেঁধে ঘাড়ের উপর এলিয়ে রাখে। সেই এলানো খোঁপায় গুঁজে দেয় সজারুর গোটা কয়েক রংবাহারি কাঁটা। এমনভাবে সেজে হয়ত তারা নিজেদের আরও সুন্দরী ভাবে।

ইদু মিশমী পুরুষ ও রমণীর পোশাক মোটামুটি ঝলমলে। মেয়েরা ঢোলা ব্লাউজ দিয়ে বুক ঢাকে। কোমড়ে জড়িয়ে রাখে এমব্রয়ডারি করা চোখ ঝলসানো রঙ্গিন ঘাগড়া। নিজেরাই তৈরি করে। ইদু মিশমী মেয়েরা আজন্ম তন্তুশিল্পী। কালো কাপড়ে লাল ডিজাইন তারা পছন্দ করে। হলুদ ও সাদা রংও তাদের পছন্দ। গলায় থাকে একনড়ি পুঁতির মালা—আর কানের লতি ফুটো করে বাঁশের কঞ্চি ঢুকিয়ে রাখে।

অন্যান্য আদিদের মত ইদু মিশমীদের মোরাং বা রাশেং নেই। বিবাহযোগ্য মেয়েরা বাড়ির আলাদা ঘরে ঘুমায়। প্রচলিত মোরাং বা ব্যাচিলর ডর্মিটরি না থাকলেও যুবকদের একসঙ্গে থাকার ক্লাব হাউস আছে। অবশ্য তার কোনও বিশেষ ছিরি-ছন্দ নেই।

সব উপজাতিরাই নানারকম সংস্কারে আচ্ছন্ন। ইদু মিশমীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। কোনও অতিথি বাড়ির মালিকের শয়ন ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। তাদের ধারণা এতে গৃহকর্তার অমঙ্গল হয়। গাছ কাটার পর কোনও ইদু মিশমী পুরুষ স্নান না করে ঘরে প্রবেশ করে না। ঋতুস্নানের সময় মেয়েরা মদ তৈরি করে না। স্বামী শিকার থেকে না ফেরা পর্যন্ত তারা মাথার চুলে চিরুণী দেয় না।

ইদু মিশমী সমাজ নারী পুরুষ নির্বিশেষে অনৈতিক কাজ বরদাস্ত করে না। নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে যৌন সংসর্গ তাদের সমাজে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। 'আবেলায়' এই সব অপরাধের বিচার হয়। অপরাধীকে কঠিন 'আনিপী' বা জরিমানা দিতে হয়। নিষিদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে মিলনে যদি কোনও সন্তানের জন্ম হয়—তাহলে সেই সন্তান মাতৃধারায় পরিচিত হয় কিন্তু 'জারজ' নামক কলঙ্কে তার জীবন অভিশপ্ত হয় না।

সব উপজাতি সমাজে নারী সমাজের সম্পদ ও সংসারের সম্পত্তি। এই সম্পত্তি হস্তান্তরে অনেক বাধা-বিপত্তি। অরুণাচলের অন্যান্য আদিদের মত ইদু মিশমীদের মধ্যে বিধবা বিবাহ সমাজ সিদ্ধ। ইদু মিশমীরা বিধবা বিবাহকে বলে 'ইয়াকু অসোম ব্রী।' যেহেতু ঘরের বৌ সংসারের সম্পত্তি সেইহেতু তাকে সেখানেই থাকতে হয়। ভাইয়ের বিধবাকে অন্য যে কোনও ভাই পুনরায় বিবাহ করে। এক্ষেত্রে কনেপণের প্রশ্ন ওঠে না। পিতার মৃত্যুর পর নিজের জন্মদাত্রী মা ব্যতীত সৎমায়ের পাণিগ্রহণ তাদের সমাজে স্বীকৃত প্রথা। সংসারে বিধবাকে বিয়ে করার মত কেউ না থাকলে, গোষ্ঠীর অন্য যে কোনও ব্যক্তি তাকে বিবাহ করতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে কনেপণ আবশ্যিক।

গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে ইদু মিশমী সমাজ পছন্দ করে না। সমাজবিধি ভেঙ্গে কোনও বিধবা যদি গোষ্ঠী বহির্ভূত কাউকে বরমালা দিতে চায়, তাহলে সেই নির্দিষ্ট পুরুষকে দ্বিগুণ কনেপণ দিতে হয়। প্রথম বিয়ের সময় পিতার কাছ থেকে সে যে উপহার পায়—তাতেও তার কোনও অধিকার থাকে না।

ইদু মিশমীরা বিশ্বাস করে, সকলকেই কিছু না কিছু হারাতে হয়—এক ব্যক্তি এক জীবনে সবকিছু পেতে পারে না।

১১

মোন্-পা

মন চল মোন-ইয়ুল। বুদ্ধ-ভক্ত মোন্-পাদের বাসভূমি মোন-ইয়ুল। অরুণাচলের বৌদ্ধ-তীর্থ তাওয়াং আর পশ্চিম কামেং জেলার অপর নাম মোন-ইয়ুল। পরম কারুণিক গৌতম বুদ্ধের অনুগামী মোন্-পা অধ্যুষিত মোন-ইয়ুল। পবিত্র তাওয়াং বৌদ্ধ মন্দিরকে কেন্দ্র করে মোন-ইয়ুল-এ গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ বিহার, গোম্ফা, সাংস্কৃতিক আর ধর্মীয় কেন্দ্র।

সু-উচ্চ তুষারাবৃত পর্বত-প্রহরী দিয়ে রক্ষিত এই পবিত্র ভূমি তাওয়াং বাদে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত। তাওয়াং-এর অপর নাম সোক্সুমনেঙ্। লুমলাকে বলা হয় ডাকপোনেঙ্। জেমিয়াং প্যাঙ, জ্যাঙ্ন্যাঙ্ নামে পরিচিত আর মুক্তোকে বলা হয় রোওলা স্যাঙ্সুম্। থিঙ্বুককে ডাকা হয় মাকথিঙ্লুগসুম।

মোন-ইয়ুল-এ না গেলে এসব কথা জানা যায় না। অজানা থেকে যায় তাওয়াং আর পশ্চিম কামেং জেলার মোন্-পাদের কথা। অরুণাচলের উপজাতিদের মধ্যে বৌদ্ধ ভক্ত মোন্-পারা অন্যতম বৃহৎ গোষ্ঠী। এই মোন-ইয়ুলে যাবার মন হয়েছে ইন্দ্রজিৎ নামচুমের। যাকে আমি নেমু সাহেব ব'লে জানি। তিরাপের নামডাফা জীবমণ্ডলের একজন পদস্থ কর্মী।

নেমু সাহেব যাবেন মোন্-ইয়ুল। নিজেও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। অরুণাচলের খাম্পতি গোষ্ঠীর উপজাতি মানুষ। ব্যবহারে বিনীত। কথা বলেন নরম সুরে। বুদ্ধের প্রেমের বাণীতে তার মন বন্দী। তাই তিনি কখনোই রাগেন না। কোনও সময়ই বিরক্ত হন না। নিজের বিবেক বুদ্ধি মত চলেন। মতান্তর হ'লে তর্ক করেন না। চুপ ক'রে থাকা মন্ত্রে বিশ্বাসী এই মানুষটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে মোন-ইয়ুল যাবেন। পশ্চিম কামেং জেলার কালাকতাঙ্ এলাকার মোন্-পাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। মোন-ইয়ুলের মন্দিরে এক সঙ্গে

তীর্থ করবেন। দেউলে দীপ জ্বালাতে আমি রাজি। কিন্তু তার আগে জানতে চাই দেউলের কথা। জানা দরকার মোন-ইয়ুলের ইতিহাস। জানতে চাই বৌদ্ধ-ভক্ত মোন-পাদের জীবন কাব্য।

নেমু সাহেব পুরাতাত্ত্বিক নন। উনি মোন্-পাদের বেন্‌ফা (পূজারী) নন। কিন্তু ওঁর একটা জিজ্ঞাসু মন আছে। সব জানার কৌতুহল আছে। তাঁর কৌতুহলী মন নিয়ে মোন-ইয়ুলে খুঁজবেন মোন্-পাদের জীবন কাব্য।

—মোন-ইয়ুলে যাবার আগে তার ইতিহাস জানা চাই। মোন্-পাদের জীবন বৃত্তান্ত না জেনে সেখানে যাওয়া যায় না।

নামডাফার বনকর্মী নেমু সাহেব মৃদু হাসেন। বলেন, আমার সঙ্গে পশ্চিম কামেং-এর তাকলুঙ্ গোম্ফার লামার পরিচয় আছে। আমি কালাকতাঙে মোন্-পাদের চিনি। সুতরাং মোন-ইয়ুলের মোন্-পাদের ইতিহাস আপনি জানতে পারবেন। তার আগে মোন-ইয়ুলের পবিত্র গোম্ফার কথা জানা দরকার। গোম্ফার মধ্য দিয়েই জানা যাবে মোন্-পাদের জীবনের কথা।

তাওয়াং ব্যতীত মোন-ইয়ুলে রয়েছে আর দশটি গোম্ফা। প্রতিটি গোম্ফার নিজস্ব ইতিহাস আছে। প্রতিটি গোম্ফা আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। গোম্ফাগুলির নাম হল — তাওয়াং, তাকট্‌সাঙ্, জিকট্‌স্যাঙ্, ব্যাগাজোঙ্, কিমনাস্, তারমাবুমগন, বিঘা, কামেফুক, গড়চাম, চাকখাম্ এবং উড়গেইলিং।

নদীর নাম তুয়াঙ্চু। তাওয়াং উপত্যকাকে বিভক্ত ক'রে পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেক পথ চলার পর প্রবেশ করেছে ভুটানে। সমভূমিতে তুয়াঙ্চুর নাম মানস। উত্তর-পূর্বে অবস্থিত গোরিসান্ পর্বতমালায় তুয়াঙ্চুর জন্ম। ১৪০০০ ফুট উঁচু বিখ্যাত সে-লা পাস থেকে তাকালে তুষারের টুপি পরিহিত ত্রিশূল পর্বতের চোখ জুড়ানো দৃশ্য দেখা যায়। এই সে-লা পাস মোন্-ইয়ুল বিভক্ত ক'রেছে — একদিকে তাওয়াং, অপর দিকে পশ্চিম কামেং। মোন-ইয়ুলকে ভৌগলিক সীমারেখা ভাগ ক'রলেও — তাওয়াং ও পশ্চিম কামেং-এর মোন্-পাদের ধর্ম ও ধ্যান-ধারণা ভাগ হয়নি। শীতের সময় সে-লা তুষারে ঢাকা থাকে আর গ্রীষ্মে পুষ্পিত রডডেনড্রনে্ ভরে যায়। শীতের সময় লেকের জল জমে সৃষ্টি হয় বৃহৎ বরফের পাত —গ্রীষ্মে সেই জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ।

— মোন-ইয়ুলের মোন্-পাদের কথা বলুন।

নেমু সাহেব আবার মিষ্টি ক'রে হাসেন। তার এই হাসি ভালুকপুঙ্-এ দেখেছি। তিনি এমনি ক'রে হেসেছেন ভীষ্মকনগরে। ইটাফোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে কেন জানিনা — হাসি আর অশ্রু এক সময় নেমু সাহেবকে অপরূপ ক'রেছিল। বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী খাম্পতি সম্প্রদায়ের এই মানুষটির মনে প্রেম আছে — ভালবাসা আছে। কিন্তু কিসের যেন একটা দুঃখ তাকে মাঝে মাঝে উন্মনা করে। তখন তিনি নামডাফা থেকে বেরিয়ে হয় চলে আসেন শিলং, নয় উন্মনা মন নিয়ে চলে যান মোন - ইয়ুল।

অষ্টম শতাব্দীতে মোন-ইয়ুলের মোন্-পারা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়। সে-লা পাস অতিক্রম ক'রে পশ্চিম কামেং জেলায় বুদ্ধের বাণী ছড়িয়ে পড়ে।

অষ্টম শতাব্দীতে মোন-ইয়ুলে প্রথম পা রাখেন বৌদ্ধ গুরু তান্ত্রিক পদ্মসম্ভাভ। বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহা-পণ্ডিত পদ্মসম্ভাভ তিব্বত থেকে অনেক পাহাড়-পর্বত অতিক্রম ক'রে মোন-ইয়ুলে পৌঁছান। তিনি এসে দাঁড়ান স্বর্গসম শার-তাকসুম-এ। মহান পর্বত দিয়ে ঘেরা একটি স্বর্গীয় উপত্যকা। নদীতে দুধের মত জল। উপলভাঙা পথে নিম্নগামী। পাখিদের কলরব — হরিণের নির্ভয় বিচরণ। মনকে ধ্যানস্থ করার উপযুক্ত স্থান।

মহাগুরু পদ্মসম্ভাভকে মোন্-পারা-লোপোন্ রিমপোচ ব'লে শ্রদ্ধা করে। মোন্-ইয়ুলে অনেকগুলি বৌদ্ধ মন্দির গ'ড়ে ওঠার ভবিষ্যৎ বাণী ক'রেছিলেন তিনি।

তুয়াঙ্চুর তীর থেকে আরও উত্তরে চলে যান লোপন্ রিমপোচ্। তাকট্সাঙ্-এ ধ্যানস্থ হন। পাঞ্চং এলাকার তাকট্সাঙ্-এ যে গুহায় ব'সে গুরু পদ্মসম্ভাভ ধ্যান করেছিলেন সেই গুহা নানা পাথরের মূর্তিতে বিমূর্ত। গুহার মধ্যে মহাগুরুর পদ-চিহ্নে শ্রদ্ধা জানাতে মোন্-ইয়ুলের তাকট্স্যাঙ-এ যাবেন নেমু সাহেব।

নেমু সাহেব বলেন, পাঙ্চেন-এ মহাগুরুকে স্বাগত জানিয়েছিল একটি বাঘ। আবার কেউ কেউ মনে করে মহাগুরু বাঘটিকে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাঘের নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় তাকট্সাঙ্। তাক মানে বাঘ। স্যাঙ্ হ'ল স্থান। পরে সেখানে একটি বৌদ্ধ দেউল গড়ে ওঠে। নাম দেওয়া হয় তাক্-স্যাঙ্ গোম্ফা।

মোন-ইয়ুলের মোন্-পাদের কথা ভুলে যান নেমু সাহেব। মহাগুরু লোপন - রিমপোচের চিন্তায় তিনি কেমন যেন ইমোশনাল হ'য়ে ওঠেন। তাকে বাধা দিতে ইচ্ছে করে না। জানি তাঁর এই বুদ্ধ বিভোর মন এক সময় মোন্-পাদের কথায় ফিরে আসবে।

তাকস্যাঙ্ থেকে মহাগুরু চলে যান জিত্স্যাঙ্। তাওয়াং থেকে পূর্ব দিকে দু'দিনের পথ। পদ্মসম্ভাভ জিত্স্যাঙ্-এ পৌঁছুলে একটি চিতা তাকে অভ্যর্থনা জানায়। ধ্যানস্থ গুরুকে পাহারা দেয় সেই চিতাটি। আর চিতাটির নাম অনুসারে জায়গায় নাম হয় জিত্স্যাঙ্। জিত্ মানে চিতা আর স্যাঙ্ হ'ল স্থান। পরবর্তী কালে সেখানে গড়ে ওঠে একটি বৌদ্ধ মন্দির। মানুষের কাছে সবং গোম্ফা নামে মন্দিরটি পরিচিত। একটি শিলাখণ্ডের উপর বসেছিলেন মহাগুরু পদ্মসম্ভাভ। যে শিলা খণ্ডের উপর ভর দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সেই শিলা খণ্ডে লোপন রিমপোচের হাতের ছাপ আজও স্পষ্ট দৃশ্যমান।

নেমু সাহেব এখন মনে মনে মোন-ইয়ুলের তীর্থ পরিক্রমা ক'রে চলেছেন। তার সেই মনকে এখন আর মোন-ইয়ুল থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। পূর্ব কামেং-এ নকশা পর্বতের ধ্বংসাবশেষ দেখে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলেন নেমু সাহেব। ধ্বংসস্তূপ তাঁকে ব্যথিত ক'রেছিল। অনেকক্ষণ তিনি নিঃশব্দে কেঁদেছিলেন। নেমু সাহেব আবার চলে যান মোন্-ইয়ুলের ব্যাগাজাঙ্-এ। গুরু পদ্মসম্ভাভ জিত্-স্যাঙ থেকে এখানে এসেছিলেন।

তাওয়াং থেকে দক্ষিণ-পূর্বে দু'দিনের পায়ে হাঁটা পথ। এখানে আছে বিশাল হ্রদ। অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য — এই হ্রদের জলে বিশেষ বিশেষ সময়ে জ্বলন্ত প্রদীপের প্রচ্ছায়া দেখা যায়। কোথায় এই প্রদীপ জ্বলে এবং কারা এই প্রদীপ জ্বালায় এ রহস্যের কিনারা এখনো হয়নি। মহাগুরুর পরিক্রমার পরে ব্যাগাজাঙ্-এ বৌদ্ধ দেউল তৈরি হ'য়েছিল। তাওয়াং বৌদ্ধ বিহার থেকে একজন সন্ন্যাসী গ্রীষ্মকালে এসে পূজা অর্চনা করেন। শীতে দেউলটি বরফে ঢাকা থাকে।

গুরু পদ্মসম্ভাভ জ্যাং গ্রামের সন্নিকটে কিম্‌নি পাহাড়ে ধ্যান ক'রেছিলেন। মোন্-ইয়ুলে কিম্‌নি তাই মোন্-পাদের কাছে তীর্থাঙ্গন। তাওয়াং-এর পূর্বে একদিনের পায়ে চলা পথে সেখানে পৌঁছানো যায়।

করমা-পা উপ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রং-চুত ডোরজি কিমনিতে দ্বাদশ শতাব্দীতে এসেছিলেন। তিনি এখানে একটি বৌদ্ধ গোম্ফা তৈরি করেন।

জানি, নেমু সাহেব তীর্থ পরিক্রমা শেষ না ক'রে থামবেন না। পরিক্রমণে উনি শান্তি পান। তাঁর স্ত্রী খাসি-কন্যা সুজুকির অকাল মৃত্যুর পর নেমু সাহেব আপন ধর্মে বড় বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছেন। সুজুকির মৃত্যুর সময় তাঁর কানে মুখ লাগিয়ে নেমু সাহেব ব'লে ছিলেন, 'ওম্ মণি পদ্মে হুম্'।

পয়দার গ্রামে তারমাবুমগণ হ'ল পঞ্চম স্থান যেখানে মহাগুরু তার পদচিহ্ন রেখে গেছেন। তাওয়াং থেকে মাত্র ছ'কি মি দক্ষিণে তারমাবুমগণ। গুরুর পদচিহ্ন ও টুপির ছাপ এখানে এখনও বিদ্যমান। মহাগুরুর সঙ্গে ছিল একটা মাথার খুলি। একটি শিলাখণ্ডের উপর সেই খুলিটিকে এখনো দেখতে পাওয়া যায়। মহাগুরুর পাদস্পর্শে পবিত্র বুমগণেও পরবর্তী কালে একটি বৌদ্ধ দেউল নির্মাণ করা হ'য়েছে।

এবার নেমু সাহেব বিঘা চলে যান। গুরু পদ্মসম্ভাভ-এর পরিক্রমণের ষষ্ঠ স্থান হ'ল বিঘা। মোন-ইয়ুলের মোন্-পাদের পবিত্র তীর্থ ভূমি। তারমাবুমগণের মত এখানেও গুরুর পদচিহ্ন রয়েছে। নেমু সাহেব তুয়াঙচুকের তীরে যান। মোন-ইয়ুলের পবিত্র স্রোতস্বিনী তুয়াংচুকের দক্ষিণ তীরে একটি বড় গুহা আছে। বাইরে থেকে সেই গুহা দেখা যায় না। গুহার মুখ অত্যন্ত অপ্রশস্ত। হামাগুড়ি দিয়ে কোনও রকমে ঢোকা যায়। এই গুহার অভ্যন্তরে ধ্যান ক'রেছিলেন গুরু পদ্মসম্ভাভ। প্রবাদ, মহাগুরু যখন ধ্যানরত তখন একটি বিরাট অজগর সেই গুহায় প্রবেশ করে। মহাগুরু তপোবলে শূন্যে উঠে পড়েন। গুহার ছাদের সঙ্গে তার মাথার ঠোক্কর লেগে একটি ছিদ্রের জন্ম হয়। এবং ওই ছিদ্রই হ'ল কোমফুক গুহার একমাত্র আলো প্রবেশের পথ। সর্পাকৃতি একটি ছাপ এখনো গুহার মেঝেতে দৃশ্যমান। এখনো নাকি কোমফুকে বিচিত্র ধরনের সাপ দেখা যায়। কোনও এক বিশেষ পার্বণে তারা বেরোয়।

পশ্চিম কামেং জেলার শেরডুকপেন এলাকায় মহাগুরু পরিক্রমা ক'রেছিলেন। সেখানেও ন'টি বৌদ্ধ-দেউল গড়ে উঠেছে।

নেমু সাহেব কি শেরডুকপেন পরিক্রমা করবেন নাকি? না। নেমু সাহেব বলেন, এবার আপনাকে নিয়ে যাব পশ্চিম কামেং জেলার কালাকতাঙ্ এলাকায়। সেখানে মহাযানপন্থী মোন্-পাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। এবার নেমু সাহেব মোন-ইয়ুলের মোন্-পাদের কাহিনী শোনাবেন। মোন্-পাদের কাহিনী শুরু করার আগে নেমু সাহেবকে বলি, শ্রী-হা-নোমার কথা বললেন না?

নেমু সাহেব মৃদু হেসে বলেন, বছর খানেক আগেই আপনাকে শ্রী-হা-নোমার গল্প বলেছিলাম। মনে ক'রে দেখুন-শ্রী-হা-নোমা মানে জংলী ছাগলের রক্ত রেখা। বর্তমানে জায়গাটির নামই হ'য়ে গেছে—শ্রী-হা-নোমা। পশ্চিম কামেং জেলার রূপা গ্রাম থেকে প্রায় চার কি.মি পথ।

গুরু পদ্মসম্ভাভ রূপা গ্রাম থেকে ওই পথে যাচ্ছিলেন। পথে বাধা দিয়েছিল ছাগলবেশী একটি দানব। আত্মরক্ষার্থে সেই জংলী ছাগলের ছদ্মবেশী দানবকে একটি পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত করলেন। ক্ষতস্থানে দিয়ে রক্তের ধারা বেরিয়ে এল। আর সেই থেকে জায়গাটির নাম হ'য়ে গেল জংলী ছাগলের রক্ত রেখা।

মহাগুরু সম্পর্কে মোন-ইয়ুলে অনেক কিংবদন্তি শোনা যায়। নেমু সাহেব মনে করেন সব কিংবদন্তির পিছনে একটি করে সত্য আছে। লোপন রিমপোচের পাঁচটি ডাকিনী বা আধ্যাত্মিক সঙ্গী থাকত। ধ্যানস্থ গুরুকে তারা আকস্মিক বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করত। এই পাঁচটি ডাকিনীর মধ্যে একজন ছিল মোন-ইয়ুলের। তার নাম ক্রা-শীস-খাইড্রেন। মোন্-পা-রা উচ্চারণ করে তাসি খাইড্রেন।

নেমু সাহেব আগেই বলেছিলেন গুরু পদ্মসম্ভাভ শেরডুকপেন এলাকায় গিয়েছিলেন। শ্রী-হা-নোমা ওই শেরডুকপেন এলাকায় অবস্থিত। মহাগুরু শেরডুকপেন এলাকায়ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ক'রেছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে শেরডুকপেনবাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ ক'রেছিলেন। এবার নেমু সাহেবকে মনে করাতে হয়, উনি কালাকতাঙ্ এলাকার মোন্-পাদের কাহিনী বলছিলেন।

বুদ্ধাশ্রিত হৃদয়ের প্রশান্তি নেমু সাহেবের মুখে মৃদু হাসিতে ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, মোন-ইয়ুলের মোন্-পারা ত্রি-ধারায় বিভক্ত। তাওয়াং-এ যারা থাকে তাদের বলা হয় উত্তরের মোন্-পা। ডিরাং-এর মোন্-পাদের বলা হয় মধ্য মোন্-ইয়ুলের মোন্-পা। আর কালাকতাঙ্-এর মোন্-পাদের বলা হয় দক্ষিণী। এই মোন্-পাদের কথাই তো আপনি জানতে চাইছেন?

হাসি মুখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। নেমু সাহেব বলেন, দক্ষিণী মোন্-পাদের কথা কিভাবে শুরু করব, বুঝতে পারছি না। দক্ষিণী মোন্-পা-রা মহাযানী। এক ধর্মাবলম্বী হ'লেও আচার, আচরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতিতে এই ত্রি-ধারার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

কালাকতাঙ্ মোন্-পা রঙ্নাম-পা· মোন্-পা নামেও পরিচিত। কালাকতাঙ্-এর আশে পাশে অনেক ঝোরা আর নদী পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেছে। মূল নদী নরগুম ও ডোমখারঙ্। রঙ্নাম-পা মোন্-পাদের কাছে অতি পবিত্র। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আর নদীর ধারে এসে কালাকতাঙ্ মোন্-পারা বুদ্ধ প্রশস্তিতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। কখনো একক কণ্ঠে, কখনো বা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে, 'মনে পেমা হুম'।

পাহাড়ের ঢালু আর শিখর সমভূমিতে কালাকতাঙ্ মোন্-পাদের বাসস্থান। পাথরের তৈরি ঘর। বসতি স্থাপনের আগে ওরা পানীয় জলের সন্ধান করে। সেই সঙ্গে-খোঁজ করে চাষের জমি। এখনো রঙ্নাম-পারা জুম চাষ করে। জুমের জমিতে ত্রিপুরার রিয়াংদের মত টং-ঘর তৈরি করে। শস্য পাহারা দেবার জন্যেই এই টংঘর।

কালাকতাঙ্ মোন্-পাদের গায়ের রং ফর্সা। দেহ সুগঠিত এবং চোখ জুড়ানো মন ভোলানো মুখশ্রী। মাথার চুল কালো, আর টানা চোখের মণি দুটো কিছুটা বাদামী। ধর্মে, ভাষায় আর সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য দেখে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, কোনও এক সময় পূর্ব ভূটান থেকে রঙ্নাম-পারা মোন্-ইয়ুলের কালাকতাঙ্ এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে এসেছিল।

নেমু সাহেব বলেন, খুব মজার কথা কি জানেন? কালাকতাঙ্ এলাকার মোন্-পাদের সঙ্গে আমাদের কাছারীদের একটা দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক আছে। কাছারী এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠরা এখনো রঙ্নাম-পাদের রাজার বংশধর ব'লে শ্রদ্ধা করে।

দেশ জুড়ে জাত-পাত আর সম্প্রদায়গত বিভেদের যে ভয়ঙ্কর সমস্যা দেখা দিয়েছে, মোন্-পাদের মধ্যে সেই সমস্যা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সবার উপরে মানুষ সত্য—মোন্-ইয়ুলের মোন-পা-রা এই সত্যকে মনে প্রাণে উপলব্ধি ক'রেছে।

নেমু সাহেব বলেন, মোন্-পাদের এই আদর্শ দেশের সর্বত্র ছাড়িয়ে দিতে পারলে জাত-পাতের লড়াই থেকে দেশ মুক্তি পেতে পারে। মোন্-পাদের সমাজে জাতের উঁচু-নীচু ভেদ নেই। কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়। সব এক আত্মার আত্মীয়।

নেমু সাহেবের কথা শুনে বড় বিস্ময় লাগে। আমরা মানুষকে এক আত্মার আত্মীয় ভাবতে ভুলে গেছি। নীচতা আর স্বার্থপরতা আমাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি ক'রেছে।

নেমু সাহেব কারণ খোঁজেন না। তিনি শুধু কর্তব্য করেন। সবাইকে সমান ভাবাটাই মানুষের কর্তব্য। দম্ভ, অহংকার আর ক্ষমতা এক শ্রেণীর মানুষকে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদের নায়ক ক'রে তুলেছে।

নেমু সাহেব বলেন, রঙনাম-পারা শ্রদ্ধাবানকে শ্রদ্ধা করে। গুণীকে সমাজের শিরোমণি ক'রে রাখে।

মোন-ইয়ুলের মোন-পাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। রক্তের সম্পর্ক ব্যতীত যে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটতে পারে। আপন সমাজের বাইরে কেউ বিয়ে করলে, মোন্-পা সমাজ তাকে সাদরে গ্রহণ করে।

বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী মোন-ইয়ুলের মোন্-পা-রা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। অনিয়ম তাদের কাছে অসহ্য।

ধর্মে বৌদ্ধ হ'লেও মোন্-ইয়ুলের মোন্-পা-রা অলৌকিক শক্তিকে অস্বীকার করে না। নিজের গ্রামের মঙ্গলের জন্য বনফা (পূজারী) দিয়ে পূজা করায়। অলৌকিক ও দৈব-দুর্দৈবকে দূরে রাখতে বনফা পূজা করে, কিন্তু লামা ছাড়া বৌদ্ধ দেউলে পূজা হয় না।

কোনও কোনও বুদ্ধ বিহারে দিবা রাত্র বুদ্ধ কীর্তন হয়। মোন্-পারা দেহ ও আত্মার শুদ্ধির জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা বুদ্ধ নাম শরণ করে।

বারোয়ারী পূজার আতিশয্যে আমরা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠি। আমাদের পূজা হয় কিনা জানিনা, তবে ইয়ারীদের নিয়ে ইয়ার্কী হয়। কিন্তু মোন্-ইয়ুলের মোন্-পা-রা মাসের প্রতি দশ তারিখ সমবেত প্রার্থনার আয়োজন করে। দৈব-দুর্বিপাক ও অসুখ-বিসুখের হাত থেকে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনায় বসে। এই প্রার্থনা সভায় গ্রামের সকলেই উপস্থিত থাকে।

নেমু সাহেব বলেন, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, ধর্মীয় ব্যাপার। এই ধর্মীয় ব্যাপারকে কেন্দ্র করে মস্ত বড় সামাজিক মিলন ঘটে যায়। পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ, গ্রামের আত্মীয় বোধকে আরও দৃঢ় করে।

পারস্পরিক সাহায্যবোধ সমতল থেকে বিদায় নিচ্ছে। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হ'চ্ছে হিংসা আর শত্রুতা দিয়ে। সমভূমির এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মোন্-ইয়ুলের মোন্-পারা মুক্ত। মুক্ত ওদের মন। অমলিন ওদের ভালবাসা। ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকে।

মোন্-পাদের সমাজে ভাড়া করা মজুরের প্রচলন নেই। পারস্পরিক শ্রমদান মোন্-পা সমাজে আবশ্যিক। কেউ একটা ঘর তৈরি করলে গ্রামের সব মানুষের হাত সেই ঘর তৈরির কাজে লেগে যায়। চাষ-বাসে একই প্রথা প্রচলিত। শতাব্দীর বিবর্তনে এই প্রথার পরিবর্তন হয়নি।

নেমু সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিৎ নামচুম বলেন, মোন্-পাদের ঘরোয়া জীবন, প্রেম, ভালবাসা ও বিয়ের কথা নিশ্চয়ই বলব। পোশাকের প্রতি তো আপনার দুর্বলতা আছে। খাসীদের জেম্সেম্কে আপনি বলেন, মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক।

নেমু সাহেব বলেন, মোন্-পাদের পোশাকও ভারি সুন্দর।

নেমু সাহেবকে মনে করিয়ে দিই—আপনি আমাকে একটা জামুক দিতে চেয়েছিলেন।

নেমু সাহেব বলেন, এবার আপনাকে অবশ্যই জামুক দেব।

জামুক প্রায় ওয়াটার প্রুফ। প্রতিটি মোন্-পা পুরুষ জামুক মাথায় রাখে। জামুকের পাশে থাকে দু'টি পাখা। বৃষ্টির জল পাখা বেয়ে বাইরে গড়িয়ে যায়। ইয়কের লোম দিয়ে

জামুক তৈরি হয়। লম্বা কোটকে ওরা বলে 'আলিপুটুঙ্'। এণ্ডির মত সূতো দিয়ে তৈরি পায়জামা পরে। তাকে বলা হয়—'ডোবনা'। মোন্-পারা গরুর চামড়ার তৈরি জুতো পরে। জুতোকে ওরা বলে—'বিদার'। বুকখোলা কোট খুব জনপ্রিয়। 'চুপা' সব পুরুষ মোন্-পাদের গায়ে থাকবেই।

মোন্-পা রমণীরা খাসী রমণীদের মত সর্বাঙ্গ ঢাকা পোশাক পরে। মেয়েদের পোশাকের নাম 'সিন্‌ফা'। নীচে সায়া বা পেটিকোট থাকে। মোন্-পা রমণীরা কানে এবং নাকে কোনও গয়না পরে না। কিন্তু কোমরে রূপার তৈরি 'চো' থাকা চা-ই। নিজেদের সিন্‌ফা মোন্-পা রমণীরা নিজেরাই তৈরি করে নেয়। বয়নে তারা সিদ্ধহস্ত।

নববর্ষকে মোন্-পা-রা বলে লো-সার। লো-মানে বছর আর সার মানে পরিবর্তন। আমাদের মতই নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে উৎসব করে। কিন্তু নতুন বছরের প্রথম দিন ওরা নিজেদের গৃহবন্দী ক'রে রাখে। স্নান শেষে নতুন পোশাক বছরের প্রথম দিন পরবেই। বুদ্ধের সামনে নত মস্তকে প্রার্থনা করবেই। পরের দিন মোন্-পা-রা ঘর থেকে বেরোবে। গ্রামের সকলেই পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, সহযোগিতার আশ্বাস দেবে। এই পারস্পরিক আশ্বাস আর বিশ্বাসের উপর ভিত্তি ক'রেই ওরা সারাটা বছর কাটায়।

নেমু সাহেব বলেন, বিয়ের মধ্য দিয়েই ওদের সংসার জীবনের শুরু। নতুন জীবনের ভিত্তি।

মোন্-পাদের দু'রকমের বিবাহ প্রচলিত। সাধারণত যোগাযোগ ক'রেই বেশির ভাগ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রেমজ বিবাহ সংখ্যায় কম হ'লেও—মোন্-পা সমাজে প্রচলিত। বিয়ে পরিচালনা করেন লামা। পবিত্র 'লিথো' বা পঞ্জিকা দেখে শুভক্ষণ ঠিক করেন তিনি। প্রেমজ বিবাহ শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেশি। জীবন-সঙ্গী তারা নিজেরাই ঠিক ক'রে নেয়।

মোন্-পা সমাজে কনেপণ প্রচলিত। বরের পিতাকে কনেপণ দিতেই হয়। নগদ টাকা কেউ দেয় না। কেউ নেয় না। বরের পিতা কনেপণ হিসাবে, ভেড়া, গরু এবং পোশাক দিয়ে থাকে। কনেপণের কোন জুলুম নেই। কনেপণের মাত্রা নির্ধারিত হয়, বরের পিতার আর্থিক অবস্থার উপর। অবশ্য কনের পিতা তার কন্যাকে খালি হাতে শ্বশুরালয়ে পাঠায় না। নিজের সাধ্যমত মেয়েকে সাজিয়ে দেয়। বহু-বিবাহ মোন্-পাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। গ্যালং রমণীদের যেমন একাধিক স্বামী থাকে—মোন্-পাদের মধ্যে তার কোনও দৃশ্যত নজির নেই।

নেমু সাহেব বরফে ঢাকা সে-লা গিরিপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আপন মনেই বলেন, যে গণতন্ত্রের জন্য সারা দেশ জুড়ে সংগ্রাম চলেছে—বহু শতাব্দী আগেই মোন-পা সমাজে সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। মোন্-ইয়ুলের মোন-পা-রা সর্বান্তকরণে গণতান্ত্রিক।

কোমফুকের বৌদ্ধ বিহারে সমবেত কণ্ঠে বুদ্ধ-বন্দনা ভেসে আসে। নেমু সাহেব চোখ বুজে ওদের সঙ্গে- উচ্চারণ করেন—'মণি-পেমা হুম'।

১২

গারো

গারো সমাজে যৌতুক একটা কৌতুকের বিষয়। বরপণ বা কনেপণ কোনওটাই গারো সমাজে প্রচলিত নেই। যদিও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য আদি ও উপজাতিদের মধ্যে কনেপণ বাধ্যতামূলক। অনেক উপজাতি সম্প্রদায় কনেপণ মেটাতে না পেরে বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে সব ভাইয়েরা ভাগ করে নিয়ে থাকে। অবশ্য বউ বাটাবাটিতে ভাইয়ে-ভাইয়ে কোনওদিন লাঠালাঠি হয়েছে বলে শোনা যায়নি। বউ-এর নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি অন্যের চোখে বিস্ময়ের বিষয়।

জোনেল শিরা বলেন, গারো সমাজে ছেলে-মেয়ে বেচা-কেনার প্রচলন নেই। মানুষের জীবনকে গারোরা পণ্য ভাবে না।

বালফাক্‌রাম থেকে সবে ফিরেছেন জোনেল শিরা। বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা বাগমারার ডাক বাংলোতে বসে গারোদের জীবনচর্চার কাহিনী শোনাচ্ছিলেন তিনি! জীবনচর্চার কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে বালফাক্‌রামের কথায় ফিরে যাচ্ছিলেন জোনেল। বালফাক্‌রাম যাবার আগেই তার মানে বলে দিয়েছিলেন জোনেল শিরা। বালুয়া-ফাক্‌রাম। অর্থাৎ যেখানে সর্বদাই ঝড় বয়ে যায়।

অত্যন্ত খাঁটি কথা। সিজুতে যখন গাছের পাতা নড়ে না, তুরাতে যখন কিশলয় নিষ্কম্প তখন বালফাক্‌রাম জীবমণ্ডলে ঝড়ের মতো শোঁ-শোঁ শব্দ তুলে বাতাস বয়ে চলে।

বালফাক্‌রাম নিয়ে গারোদের মধ্যে অনেক কিংবদন্তি আছে। গারোরা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর সব আত্মাকেই বালফাক্‌রাম যেতে হয়। সেখানে পাপ-পুণ্যের বিচারের পর অপরাধের তারতম্য অনুসারে স্বর্গ বা নরক দর্শন হয়।

অর্থাৎ বালফাক্রাম হল বিদেহী আত্মার অভয়ারণ্য! বিদ্যালয়ের শিক্ষক জোনেল শিরা হাসেন। উনি কখনই শব্দ করে হাসেন না। নিঃশব্দ হাসিতে তাঁকে বড় উজ্জ্বল দেখায়।

বালফাক্রাম প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য। উত্তর-পূর্ব ভারতে মানুষের প্রথম পদার্পণ ঘটেছিল এই গারো পাহাড়ে। গারো পাহাড়ে রণগ্রামে আজকের মানুষের পূর্বপুরুষ প্রথম পা রেখেছিল। বালফাক্রামের অবস্থান তারও অনেক আগে থেকে।

শিরা বলেন, আজ আপনাকে গারোদের অনরিকা প্রথার কথা বলব। এই অনরিকাকে কেউ কেউ বলেন, অনসোঙ্গা। গারোদের কাছে দুটো শব্দের অর্থই এক।

বালফাক্রামের অরণ্যের ছায়া দূর্গে শিরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীদের কাছে বালফাক্রাম একটি জীবপরিমণ্ডল হলেও গারোদের কাছে মেমাং আসং অর্থাৎ বিদেহী আত্মার বাসভূমি। অনরিকা বা অনসোঙ্গায় আমার মন আটকে থাকে না। বালফাক্রামকে কেন্দ্র করে বারবার ঘুরতে থাকে।

গারোদের মতে সেখানে আছে প্রেতদের আদালত। তারা নিজেদের ভাষায় বলে মিটি আদালত। অর্থাৎ 'Court of Ghosts'। বালফাক্রামে ছিদামক বা কালো জলাশয়ের ধারে বসে জোনেলের কাছে মিটি আদালতের কাহিনী শুনেছি। বিদেহী আত্মারা পথ ভোলা পথিকের মতো ঘুরতে ঘুরতে এক সময় হাজির হয় মেমাং আন্তে অর্থাৎ আত্মার বাজারে।

জোনেল বলেন, অনরিকা প্রথা গারো ছাড়া অন্য কোনও আদি ও উপজাতি সমাজে নেই। অন্তত আমার জানা নেই।

ছায়াছবির মত বালফাক্রাম আমার চোখের সামনে দিয়ে তখনও ভেসে চলেছে। অনন্য অনবিকাকে মাথায় রাখতে পারছি না। জোনেল বলেন, বালফাক্রামের প্রভাব থেকে এখনও আপনি মুক্ত হননি। আপনার মনে এখনও 'মেমাং নক পান্ত' ঘুরপাক খাচ্ছে।

অবিবাহিত আত্মার ঘরকে বলা হয় মেমাং নক পান্ত। জোনেল বলেন, মেমাং নক পান্ত-এ কোনও গারো যেতে চায় না। লক্ষ্য করে দেখবেন কোনও গারো ছেলে-মেয়েই অবিবাহিত থাকতে চায় না।

গারো পাহাড়ে শতাধিক বছর ধরে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচলিত। কিন্তু শত বছরের মধ্যে কোনও গারো ছেলে পাদ্রি হয়নি। তেমনি কোনও গারো সন্ন্যাসিনীও খুঁজে পাবেন না।

ধর্মান্তরিত হলেও যুগবাহিত সংস্কার থেকে তারা মুক্ত নয়। মেমাং নক পান্ত-তে রাত কাটাবার ভয়ে গারো ছেলে-মেয়েরা প্রথম সুযোগেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

অস্বীকার করে লাভ নেই। বালফাক্রামের আরণ্যক সৌন্দর্যে একটা চুম্বক আছে। সে চুম্বক শুধু অরণ্যচারিকে মুগ্ধ করে না—অরণ্য প্রেমিককেও মোহগ্রস্ত করে। কিংবদন্তিতে ঠাসা বালফাক্রামে অনেক প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

একটি নারীমূর্তি ও তার পাশে শায়িত শিশুমূর্তি বালফাক্‌রামের ইতিহাসকে অনেক পিছনে ঠেলে দিয়েছে। জোনেল বলেন, দরকার হলে আবার আপনাকে বালফাক্‌রাম নিয়ে যাব। এবার সেখানে গিয়ে 'শকুন সরম' ভাল করে দেখে আসবেন।

এ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! একটা গুহার নাম 'শকুন সরম'। কবে কোন্ অনাদিকাল থেকে একদল শকুন গুহাটি পাহারা দিয়ে চলেছে। মুহূর্তের জন্যেও গুহার মুখ প্রহরীহীন থাকে না। কি আছে সেখানে? কেউ তা জানে না। দু-একবার জানবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রহরারত শকুনেরা নির্মম হয়ে উঠেছিল। চঞ্চু আর নখ উঁচিয়ে অভিযানকারীদের অভিযান ব্যর্থ করে দিয়েছিল। ভয়ে এখন আর কেউ 'শকুন সরম' অভিযানের কথা ভাবে না। জোনেল বলেন, এবার মনোযোগ দিয়ে অনরিকা বা অনসোঙ্গার কথা শুনুন। অনুপ্রাসে বন্দী যমজ বোনের মত শব্দ দুটি শোনাবার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছেন জোনেল শিরা। শিক্ষক বলেই সম্ভবত তাঁর অপিরিসীম ধৈর্য। অনরিকা বা অনসোঙ্গার মানে আগে বলুন। জোনেল হেসে বলেন, মানে না বলে দিলে, গোটা ব্যাপার আপনার বোধগম্য হবে না।

অনরিকা বা অনসোঙ্গার মানে হল—শূন্যস্থান পূরণ করা। অর্থাৎ 'A custom of replacement'।

জোনেলের কথা শুনে মনে হয়, অনরিকার মধ্যে তিনি একটা রোমান্টিক প্রথার অবতারণা করবেন। বলি আপনি কিন্তু যৌতুক দিয়ে শুরু করেছিলেন। জোনেল বলেন, অনরিকা প্রথার সঙ্গে জীবন ও যৌতুকের কিছু সম্পর্ক আছে।

গারোদের মধ্যে ক্রস-কাজিন ম্যারেজ প্রথা প্রচলিত। মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনে বিয়ে খুবই বাঞ্ছনীয়। কোনও মামা ছেলের জন্য তার বোনের কাছ থেকে বরপণ চাইতে পারে না—তেমনি বোনও তার মেয়ের জন্য ভাইয়ের কাছ থেকে কনেপণ দাবি করে না।

তবে নিজেদের ইচ্ছামত উপহার দিতে বাধা নেই। কোনও বাবা তার পুত্রবধূর জন্য যে কোনও জিনিস উপহার দিতে পারে। কনের বাবার অবস্থা ভাল হলে—সে তার জামাইকে একটা বোরাং (জুমের পাহারা ঘর) তৈরি করে দিতে পারে। বিয়ের পর বাবার কাছ থেকে এক খণ্ড কাপড় পায় মেয়ে। বড় আদরের সঙ্গে সেই কাপড়টি গ্রহণ করে সে। সন্তান হবার পর সন্তানকে সেই কাপড়ে শুইয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে জুমে যায়—ঘর-সংসারের কাজ করে। পিতৃদত্ত কাপড়ের পুঁটলিতে নিশ্চিন্ত আরামে বড় হয় সন্তান। জোনেল শিরা আবার ফিরে আসেন অনরিকার কথায়। কেউ বিধবা হলে—মাচং বা স্বামীর গোষ্ঠী থেকে সেই বিধবাকে নতুন স্বামী দেওয়া হয়। ঠিক তেমনি কোনও ব্যক্তির স্ত্রী মারা গেলে—মাহারি বা মাতৃগোষ্ঠী থেকে তাকেও স্ত্রী দেওয়া হয়, সম্ভব হলে মৃতা পত্নীর অবিবাহিত ছোট বোন সেই স্থান পূরণ করে। অভাবে প্রয়াত পত্নীর নিকটতম আত্মীয়া সেই বিপত্নীকের বক্ষলগ্না হয়। কোনও বিপত্নীক বা কোনও বিধবাকে

নিজে খোঁজ করে দ্বিতীয় জীবনসঙ্গী খুঁজতে হয় না। এ দায়িত্ব পালন করে মাচং ও মাহারি। আর এই প্রথাকে বলা হয় অনরিকা।

বড় ভাইয়ের বিধবাকে ছোট ভাই বিয়ে করতে পারে। আবার তেমনি মৃতা স্ত্রীর ছোট বোনকে দ্বিতীয়া ঘরণী করা সমাজসিদ্ধ। তবে কোনও ক্রমেই ছোট ভাইয়ের বিধবাকে বড় ভাই বিয়ে করতে পারে না এবং কোনও বিপত্নীক তার স্ত্রীর দিদিকেও বিয়ে করতে পারে না।

কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই জোনেল বলেন, এই প্রথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক আদি এবং উপজাতি সমাজে প্রচলিত। অরুণাচলের কোনও কোনও আদি সমাজে এই উত্তরাধিকার প্রথা বাধ্যতামূলক। শাশুড়ি অনেক সময় জামাইয়ের পাটরানী হয়ে যায়, জানেন?

জোনেলের প্রশ্নে অবাক হতেই হয়। শাশুড়ি আর জামাইয়ের মধ্যে বিয়ে কি কখনও সম্ভব? কোনও আদি ও উপজাতি সমাজেও এমন প্রথার কথা আমি শুনিনি। অবিশ্বাস্য মনে হলে জোনেলকে অবিশ্বাস করার কারণ নেই। তিনি শিক্ষিত এবং একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। নিজের সমাজের প্রচলিত বিধি-নিয়মের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত। সুতরাং বিশদ শোনার জন্য অপেক্ষা করতেই হয়।

জোনেল বলেন, গারোদের মধ্যে নক্‌না বা উত্তরাধিকারিণী প্রথার প্রচলন আছে। খাসি জয়ন্তিয়ার মত গারো সমাজ মাতৃধারায় পরিচালিত এবং মাতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বা নক্‌না সাধারণত ছোট মেয়েকেই করা হয়। অবশ্য অন্য কোনও মেয়েকে নক্‌না নির্বাচনের বাধা নেই। গৃহকর্তা যদি তার স্ত্রী, নক্‌না ও নক্‌নার স্বামী নক্রোমকে রেখে মারা যায়—সেক্ষেত্রে অনসোঙ্গা প্রথা অনুযায়ী সেই বিধবা গৃহস্থালী ও সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং নক্রোমের জিক মামিং-এর (প্রধানা মহিষী) ভূমিকাও পালন করে। তখন শাশুড়ি হয়ে যায় জিক মামিং বা প্রধানা স্ত্রী। আর নক্‌নার স্থান নেমে আসে জিক জাইত-এ বা সহ স্ত্রীতে। জোনেল বলেন, বিষয়টি আপনার জটিল মনে হচ্ছে? সম্ভবত খুব অবাক করে দিয়েছে আপনাকে তাই না? জোনেল আশ্বস্ত করে বলেন, এই প্রথা আদৌ বহুল প্রচলিত নয়। অ-খ্রিষ্টান গারোদের মধ্যে দু-চারটে ঘটনা ঘটে থাকে। তবে ধর্মান্তরিত গারোদের মধ্যে এই প্রথা সম্ভবত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নক্রোমের জিক মামিং হওয়া আদৌ বাধ্যতামূলক নয়। তবে সমাজসিদ্ধ।

গারো সমাজে আর একটি প্রথার কথা শোনা যায়, বলেই জোনেল শিরা থামেন। অদূরেই বাংলাদেশের সীমানা। সীমান্ত ঘেঁষা সমভূমিতে যারা থাকে—তাদের বেশির ভাগ হিন্দু। মিশনারিরা পাহাড় এলাকায় খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারে পুরোপুরি সমর্থ হলেও সমতলের কোচ, রাভা ও হাজংদের ধর্মান্তরিত করে উঠতে পারেনি।

গারো পাহাড়ে খ্রিষ্ট ধর্মের শতবর্ষ উদযাপন হয়ে গেছে ১৯৮৪ সালে। ধর্মের প্রভাবে আর মিশনারিদের তৎপরতায় ব্যবহারিক জীবনচর্চায় কিছু পরিবর্তন এলেও

সামাজিক বিধিনিষেধ ও যুগবাহিত প্রথা অপ্রচলিত হয়ে যায়নি। মিশনারিরাও অবশ্য 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করেছে।

জীবনের সঙ্গে জড়িত যে সংস্কার যুগ যুগ ধরে গারো সমাজে প্রচলিত—রাতারাতি তাকে বদলে ফেলার বিশেষ কোনও চেষ্টা মিশনারিরা করেনি। চার্চে বিয়ে হলেও অনরিকা বা অনসোঙ্গার নির্দিষ্ট বিধি ব্যবস্থা গারো সমাজ পরিত্যাগ করেনি। ব্যক্তি বিশেষের নামের পরিবর্তন ঘটলেও পরিবারিক পদবি কেউ বর্জন করেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে গারো পাহাড়ে বাংলা ভাষার প্রচলন ছিল। সমভূমির মানুষ ছাড়াও পাহাড়ীরাও বাংলা ব্যবহার করত। মিশনারিরাও প্রথমে বাংলাকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এমনকী বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করে গারোদের মধ্যে বিতরণ করা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে মিশনারিরা রোমান লিপির প্রচলন করে। গারো, খাসি ও জয়ন্তিয়াদের নিজস্ব কোনও লিপি নেই। তিনটি জায়গায় প্রথমে বাংলা লিপি প্রচলিত ছিল। কু-চক্রীদের ষড়যন্ত্রের ফলে এখন এই তিনটি উপজাতির লিপি হল রোমান। মিশনারিদের ইতিহাস শুনতে খারাপ লাগছিল না। শিরাকে অনরিকাতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি না। কারণ নব্যপ্রস্তরযুগের সংস্কার ও সংস্কৃতিতে শিরাকে এখনই ফিরে আসতে হবে। মিশনারিদের ইতিহাস এই তো সেদিন শতবর্ষ অতিক্রান্ত করেছে।

জোনেল বলেন, আরও একটি প্রথার কথা শোনা যায়। প্রথাটি এখনও বেঁচে আছে—কিন্তু ব্যবহৃত হয় কিনা আমার জানা নেই। প্রথাটিকে বলা হয়—'সৎ মেয়ে বিবাহ'। এবার আর অবাক হই না। কারণ এই প্রথার কথা অনেক দিন আগে জেফারসন মারাকের মুখে শুনেছিলাম। তার ব্যাখ্যা ছিল অন্য রকম।

তিনি বলেছিলেন—সম্পর্কে সৎ মেয়ে হলেও আদৌ নিজের ঔরসজাত নয়। সুতরাং 'সৎ মেয়ে বিবাহ'-এ কথাটি বলা যথাযথ নয়।

জোনেল বলেন, জেফারসন ঠিক বলেছেন। প্রথাটির বিশদে গেলে আপনিও বুঝতে পারবেন।

যদি কোনও ব্যক্তি স্ত্রী ও অবিবাহিত কন্যা রেখে মারা যায়, তাহলে সেই ব্যক্তির মাহারি বিধবাকে নতুন স্বামী দেয়। বিধবাটি হয় প্রধানা স্ত্রী এবং তার নক্‌না হয় স্ত্রীর পর্যায়ে উন্নীত।

জোনেল বলেন, অনরিকা বা অনসোঙ্গা প্রথাটি গারো সমাজকে পরিচালিত করে। মৃত্যুতো বটেই। যদি কোনও কারণে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তখন স্ত্রীর মাহারি সেই স্বামীকে নতুন স্ত্রী সংগ্রহ করে দেবেই এবং তা প্রথমা স্ত্রীর ঘনিষ্ঠজন থেকেই বাছাই করা হয়। তবে গারো সমাজে বিচ্ছেদের ঘটনা বড় একটা বেশি ঘটে না।

জোনেল বলেন, গারো সমাজে দত্তক বা গারো ভাষায় যাকে বলা হয়—'দেরাগত' প্রথার প্রচলন আছে। তবে নিজের মাচং বা মাহারির বাইরে থেকে দত্তক নেওয়া যায় না।

মূলত মাতৃধারা থেকেই দত্তক নিতে হয়। কারণ এই দত্তক কন্যাকেই করা হয় নক্না বা উত্তরাধিকারিণী। দত্তক নেবার পর জিক্ মামিং যদি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়-তখন কি হয়?

জোনেল বলেন, কিছুই হয় না। দত্তক কন্যাই নক্না থাকে। কারণ নক্না নির্বাচন গৃহকর্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। জোনেল বলেন, গারো সমাজ ও জীবন চর্চার আর একটি বড় দিক হল নক্মা। —নক্মা?

জোনেল বলেন, খাসিদের যেমন সিয়েম—গারোদের তেমনি নক্মা। অর্থাৎ সমাজ শিরোমণি! অবশ্য সিয়েম ও নক্মার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। নক্মাকে গারো রাজাও বলা যেতে পারে।

নক্মা একটি প্রতিষ্ঠান। গারো ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। একটি এলাকা বা আখিঙ্-এর সর্বময় প্রভু নক্মা। শুধু আখিঙ্-এর উপর প্রভুত্ব করাই নক্মার কাজ নয়। এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগও তাকে নিতে হয়। উৎসবে ও অনুষ্ঠানে তাকে যেমন প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয়—তেমনি অসামাজিক ও মাচং বা মাহারী বিরোধী কাজের ফয়সালাও তাকেই করতে হয়। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষাও নক্মার অন্যতম কর্তব্য। অবশ্য এর জন্য আখিঙ্-এর সব বাসিন্দারা তাকে সহযোগিতা করে।

কোনও সামাজিক উৎসবের পুরোধার কাজ তাকেই করতে হয়। এবং উৎসবে তার অবদান সকলের চেয়ে অবশ্যই বেশি। আখিঙ বা এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলাার জন্য নক্মার নিজস্ব 'বাহিনী' থাকে। অন্তত প্রশাসনিক পরিবর্তনের আগে সে 'বাহিনীর' কর্তৃত্ব নক্মাকেই করতে হত। অবশ্য প্রাচীন প্রথানুযায়ী নক্মার কর্তৃত্ব বর্তমান প্রশাসনও খাটো করে দেখে না।

উত্তরাধিকার সূত্রে নক্মা দায়িত্ব পায়। আজকের নক্রোম—আগামীকালের নক্মা। নক্মাত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য নক্রোমকে বেশ কয়েক বছর প্রশিক্ষণ নিতে হয়। আখিঙ--এ শুধু শান্তি-শৃঙ্খলা নয়, বাসিন্দাদের আর্থ সামাজিক উন্নতির জন্যও নক্মাকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। অনুষ্ঠানে আখিঙবাসীদের যথাযোগ্য আপ্যায়ন না করলে-জনসাধারণের চোখে সেই নক্মা হেয় প্রতিপন্ন হয়। গারোরা সেই নক্মাকে আড়ালে-আবডালে মেগরি নক্মা বা কৃপণ নক্মা বলে অভিহিত করে।

জোনেল বলেন, আমি জানি, নক্মার চেয়ে নক্নার কাহিনী শুনতে আপনার ভাল লাগবে। জিক মামিং-এর কথাও আরও বিশদে জানতে চাইছেন ; তাই না? জবাব দেবার দরকার হয় না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক জোনেল শিরা হেসে বলেন, নক্মার পরিচয় না দিলে গারো সমাজ চর্চার কথা সম্পূর্ণ হয় না। তাই নক্মাত্বের একটি রূপরেখা তুলে ধরলাম মাত্র।

মাতৃধারায় পরিচালিত গারো সমাজে উত্তরাধিকারিণী নির্বাচন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই নির্বাচন নক্‌মা পরিবার ও সাধারণ গারো সমাজেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরাধিকারিণী নির্বাচনে জিক মামিং মুখ্য দায়িত্ব পালন করে। সাধারণত কনিষ্ঠা কন্যা নক্‌না নির্বাচিত হয়। তবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে জিক মামিং-এর ভূমিকাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। সে ইচ্ছে করলে, তার একাধিক কন্যার মধ্যে যে কোনও একজনকে নক্‌না ডংগিপা মেচিক হিসাবে নির্বাচিত করতে পারে।

ঠিক একইভাবে নক্রোম নির্বাচিত হয় পিতৃধারা থেকে। গৃহকর্তার মাচং বা গোষ্ঠী থেকে উপযুক্ত নক্রোম নির্বাচন করা হয়। লক্ষ্য করে দেখবেন, মাতৃধারার কর্তৃত্ব থাকলেও পিতৃধারাকেও উপেক্ষা করা হয় না। বরং নক্‌মা ও নক্রোম নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দুটি ধারার বন্ধনকে শক্তিশালী করা হয়।

জোনেল আগেই শুনিয়েছিলেন—বিধবা কর্ত্রীকে অনরিকা অনুযায়ী নক্রোমের জিক্ মামিং হতে হয়। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিধবার বয়স ও মানসিক অবস্থার উপর। আগেই বলেছি, এই প্রথা সমাজসিদ্ধ হলেও আদৌও বাধ্যতামূলক নয়। আপনারা যাকে ঘর জামাই বলেন—অর্থাৎ গারোদের নক্রোম হল তাই। জোনেল বলেন, নক্রোমের বাংলা করতে পারেন ঘরজামাই।

নক্‌মা ছাড়া অন্য মেয়েরা পিতৃ মাচং-এর যে কোনও ছেলেকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু মাতৃধারায় কখনই নয়। মাতৃধারায় বিয়েকে গারোরা বলে ম্যাডং। এ বিয়েকে তারা প্রথাবিরোধী বলে মনে করে এবং সমাজ থেকে কোনও স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

পাশ্চাত্যের লিভ টুগেদার, বহু দশক আগে থেকেই গারো সমাজে প্রচলিত। বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকাকে বলা হয় হয় 'ন্যাপেটুয়া'। এই ন্যাপেটুয়া বিষয়টি গারোরা একদম পছন্দ করে না। তাদের সন্তান-সন্ততি সমাজে অপাঙক্তেয় না হলেও মাচং বা মাহারির কাছে অন্যদের মত আদরণীয় নয়।

জোনেল শিরা বলেন, নাগাদের মতো মোরাং ও অরুণাচলিদের মত মসুপের ব্যবস্থা গারো সমাজে ছিল। ব্যাচেলার ডর্মিটরী বা কুমারালয়কে গারোরা বলত নক্‌পান্তে। দূরান্তের দু-একটি গ্রামে বর্তমানে নক্‌পান্তের সন্ধান মিললেও-খ্রিষ্ট ধর্মাম্বলীদের মধ্যে এ প্রথা এখন অপ্রচলিত। জোনেল শিরা নিজে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। নক্‌পান্তে প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে কোনও কথা বলেন না। বলেন, গারো সমাজেও যুগের পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। গারোরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের যুগোপযোগী করে তুলছে।

তবু শিরা স্বীকার করেন, খ্রিষ্টধর্ম বহুল প্রচার হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন উৎসব অনুষ্ঠান হারিয়ে যায়নি। গারোরা অনেক উৎসব অনুষ্ঠান করে থাকে। তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব-ওয়াংগালা। একে বলা যেতে পারে নবান্ন উৎসব। শস্য খামারে তোলার পর এই উৎসবের সূত্রপাত। প্রায় মাসখানেক আগে থেকেই এই উৎসবের প্রস্তুতি চলে। ওয়াংগালার বৈশিষ্ট্য শত মাদল। নক্‌মা ও ধনী ব্যক্তিরা প্রায় এক মাস আগে থেকেই মদ তৈরির

কাজ শুরু করে। নবান্নের সঙ্গে সঙ্গে সকলের গায়ে ওঠে নতুন পোষাক। মেয়েরা গড়ায় নতুন গয়না। উৎসব শুরু হয় নক্‌মার বাড়ি থেকে। এক সঙ্গে বেজে ওঠে শত মাদল। মাসব্যাপী চলে নারী ও পুরুষের সমবেত গান-বাজনা আর নাচ। ওয়াংগালায় নোকাল (চাকর) আর নক্‌মার মধ্যে সব পার্থক্য মিলিয়ে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রাচীন গারো সংস্কৃতি আর সংহতি।

১৩

খাসি

বিবাহে উৎসব আর বিচ্ছেদে অনুষ্ঠান। জনসমক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছেদ ঘোষণা মেঘালয়ের খাসি উপজাতির সামাজিক রীতি। মুক্ত অঙ্গনে অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘোষণা আবশ্যিক। বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোর্ট-কাছারি করতে হয় না। খোরপোষের ঝামেলা নেই। মনের অমিল আর হৃদয়ে চিড় ধরলে স্বামী-স্ত্রীর যে কেউ বিচ্ছেদ চাইতে পারে। দিতেও হয়। এর জন্য তাদের দুঃখ হয় কি না, পরস্পরের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য সরে যাওয়ার বেদনা অনুভব করে কি না, তা কেবল বিচ্ছেদ প্রার্থীরাই জানে। অন্য কোনও মন নিয়ে দাম্পত্য বিচ্ছেদের সুখ-দুঃখ বিচার করা যায় না। সম্ভবত কেউ পারে না।

বিবাহবাসরে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের উপস্থিতি যেমন প্রয়োজন, তেমনি বিচ্ছেদের অনুষ্ঠানে তাদের হাজির থাকা অপরিহার্য।

খাসি উপজাতির সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিচ্ছেদ-প্রার্থীবা একটি মুক্ত অঙ্গনে মুখোমুখি দাঁড়ায়। উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত থাকে। মামার উপস্থিতি আবশ্যিক। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পাঁচটি কড়ি হাতে নিয়ে আসে। বর্তমানে কড়ির অভাবে পাঁচটি পয়সা বা পাঁচটি টাকা নিতে হয়। স্ত্রী ওই পাঁচটি কড়ি অথবা পাঁচটি টাকা স্বামীর হাতে দেয়। স্ত্রীর অর্থের সঙ্গে সমান অঙ্কের অর্থ যোগ করে স্বামী আবার স্ত্রীর হাতে ফিরিয়ে দেয়। স্ত্রী তখন সম্পূর্ণ অর্থ স্বামীর হাতে আবার ফিরিয়ে দেয়। স্বামী সেই অর্থ স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে না দিয়ে উঠানে ছুঁড়ে দেয়। ঠিক সেই সময় একজন 'উ নঙ্ পিড়িয়া সঁঙ্' বা হল্লাকারী গ্রামের মধ্যে চিৎকার করে বলে, গ্রামের মাননীয়গণ, যুবক ভাইয়েরা ও গ্রামবাসীরা, আপনারা শুনুন—আজ থেকে উ সুমের এবং কা-সিনটিউর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেল। এই বিচ্ছেদ অনুষ্ঠান গ্রামের প্রবীণেরা চাক্ষুষ করেছেন। এই মুহূর্ত থেকে উ সুমের অবিবাহিত ও কা সিনটিউ 'খিরাও'—কুমারী হয়ে গেল।

হল্লাকারী আরও জানান দেয়, গ্রামের যুবকগণ, এবার আপনারা ইচ্ছা করলে, কা-সিনটিউর সঙ্গে প্রেম করতে পারেন। যুবতীগণ, উ সুমেরকে ভালবাসতে আর কোনও বাধাই থাকল না।

খাসিদের মধ্যে বিচ্ছেদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। নানা কারণেই দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। মনের অমিল, সন্তান ধারণে অক্ষমতা ও পরকীয়া প্রেম-বিবাহ বিচ্ছেদের মূল কারণগুলির মধ্যে অন্যতম। খাসি সমাজের নিয়ম অনুসারে বিচ্ছেদ কখনই একতরফা হয় না। স্বামী বা স্ত্রী দু-জনের কেউ গররাজি হলে, সেক্ষেত্রে দাম্পত্য বিচ্ছেদ ঘটতে পারে না। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উভয় পক্ষই রাজি হয়ে যায়। কারণ, কেউই চিড়ধরা হৃদয় নিয়ে জীবন যাপন করতে চায় না। ব্যতিক্রমী দু-একটি বিরল ঘটনা বাদ দিলে, উপরোক্ত কারণগুলিই খাসিদের দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ নিয়ে আসে। অবশ্য ওয়ার শ্রেণীভুক্ত খাসি সমাজে একতরফা বিচ্ছেদ হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্য গররাজি পক্ষ যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ পায়।

আগেই উল্লেখ করা ভালো—খাসি সম্প্রদায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। খাসি, ওয়ার, ভৈ ও লিঙ্গম্। সিন্টেঙ্ জয়ন্তিয়া পাহাড়ে থাকে। তাদের আচার-আচরণ ও সামাজিক রীতি-নীতির সঙ্গে খাসি সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনও অমিল নেই।

উভয়ে রাজি না হলে যেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে না, কা মিনরেন বা ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। ভাঙা আয়নায় খাসিরা মুখ দেখে না। জোড়াতালি দিয়ে হৃদয়ের ফাটল বন্ধ করতে কোনও পক্ষই রাজি হয় না।

সাধারণত স্ত্রীর পক্ষ থেকেই বিচ্ছেদের দাবি বেশি ওঠে। স্বামী না চাইলেও স্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ওয়ার গোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভবত কা মিনরেন বা ক্ষতিপূরণের লোভে স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদের দাবি আগে ওঠে। একবার বিচ্ছেদের দাবি উঠলে, খাসি রীতি অনুযায়ী দাম্পত্য জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

বিচ্ছেদ ঘটার পর, উভয়ের মধ্যে পুনরায় বিবাহ খাসি অনুশাসন বিরোধী। অনুতপ্ত হয়েও দু-জনেই যদি পুনরায় ঘর বাঁধতে চায়—সে আশাও তাদের পূর্ণ হয় না। বিচ্ছেদের পর স্ত্রীর পিত্রালয়ের অন্য কাউকে স্বামী বিয়ে করতে পারে না। একই নিয়ম স্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা-বিরুদ্ধ। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলেই বিচ্ছেদের পর সন্তানের দায়-দায়িত্ব মায়ের উপর বর্তায়। সন্তানেরা মাতৃ-উপাধিতে পরিচিত। বিচ্ছেদ-প্রাপ্ত পিতৃ পরিচয়ের কথা কোনও সন্তান ভাবেও না, সম্ভবত মনেও রাখে না।

বিয়ের আগেই বিচ্ছেদের কথা বলা হল। বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়েই মাতৃশাসিত খাসি সম্প্রদায়ের একটি সামাজিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। দেশের অন্য কোথাও সম্ভবত মাতৃশাসিত সমাজ নেই। সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত পিতৃতন্ত্র। মেঘালয়ের খাসি উপজাতিই একমাত্র ব্যতিক্রম। মাতৃশাসিত সমাজ ব্যবস্থার বয়স কত—তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। স্মরণাতীত কাল থেকেই খাসি সমাজে মাতৃশাসন প্রতিষ্ঠিত। সম্পদে এবং সম্পত্তিতে মায়ের

কর্তৃত্ব। সংসারে তার নিরঙ্কুশ অভিভাবকত্ব। বিয়ের পর তারা স্বামীর পদবি গ্রহণ করে না। সন্তানেরা পরিচিত হয় মাতৃ পদবিতে। বিচ্ছেদ প্রাপ্ত কোনও স্বামী আর কোনওদিন তার সন্তানের কাছে আসতে পারে না। কোনও সন্তানও পিতৃ পরিচয়ের কথা মনে রাখে না। বিচ্ছেদের মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি হলেও—বিয়ে বন্ধ থাকে না।

বিচ্ছেদে অনুষ্ঠান ও বিবাহে উৎসব মাতৃশাসিত খাসি-সিন্‌টেঙ্‌ সমাজের উল্লেখযোগ্য সামাজিক প্রথা। বিচ্ছেদের অনুষ্ঠান যেমন মনে রাখার মত—খাসি সম্প্রদায়ের বিবাহও তেমনি উল্লেখযোগ্য। যে ব্যবস্থা জাতি বা উপজাতি কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই—খাসি সমাজের বিবাহে তাই ঘটে থাকে। বিয়ের পর বধূ শ্বশুরালয়ে যায় না। বরকেই যেতে হয় শাশুড়ির গৃহে। অন্য সমাজে বধূবরণ আর খাসি সমাজে বরবরণ। মাতৃশাসিত সমাজে আবহমান কাল থেকে এই রীতি চলে আসছে। বর থাকে শাশুড়ির গৃহে। তার আয় ব্যয়িত হয় সেই সংসারে। তাকে হতে হয় পরিবারের একজন সদস্য। সংসার বড় হলে, আলাদা বাসগৃহ নির্মাণ করে সন্তান নিয়ে স্বামী-স্ত্রী সেখানে চলে যেতে পারে। অবশ্য সেক্ষেত্রেও শাশুড়ি ও মামার একচেটিয়া অভিভাবকত্ব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না। খাসি সমাজ-বিধি অনুযায়ী প্রশ্ন তোলা যায় না।

অবশ্য সিন্‌টেঙ্‌দের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। বিয়ের পর সিন্‌টেঙ্‌ কন্যা মাতৃগৃহেই থাকে। সিন্‌টেঙ্‌ স্বামী শুধু রাতে সেই গৃহে যায়। অবশ্য সেখানে কিছু গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। এমন কী একটা পান ও কোয়াইও মুখে দিতে পারে না। তারা মনে করে, স্বামীর আয় যে সংসারে ব্যয়িত হয় না—সেখানে স্বামীর পক্ষে কিছু গ্রহণ করা অনৈতিক।

সিন্‌টেঙ্‌রা বিশ্বাস করে মাতৃতন্ত্রের ধারাকে খাসি সম্প্রদায়ের চেয়ে তারা অনেক বেশি সম্মান দেয়। বস্তুত তারা এই ধারাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে রক্ষা করে। তাদের দাবি সিন্‌টেঙ্‌দের নিয়ম ও ধর্মীয় আচরণ খাসিদের চেয়ে বেশি পবিত্র।

আপন গোত্রে বিবাহ খাসি সমাজে শুধু নিষিদ্ধই নয়—অমার্জনীয় সামাজিক অপরাধ বা খাসি ভাষায় স্যাঙ্‌ — অখণ্ডনীয় পাপ। এ ধরনের পাপ খাসি সমাজে বিরল ঘটনা। তবুও যদি কেউ পাপ করে, তাহলে সে সমাজচ্যুত হয়। ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়ে যায়। শ্মশানে কেউ সহযাত্রী হয় না। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পর মৃতের হাড় অস্থি ভাণ্ডারে রাখতে দেওয়া হয় না। মৃতের অস্থি সংরক্ষণ খাসি সমাজে প্রচলিত।

খাসি ও সিন্‌টেঙ্‌দের মধ্যে অস্থি সংরক্ষণের প্রথা আছে। মৃত্যুর পর স্বামীর স্মৃতি স্মরণে রাখার জন্য স্ত্রী অস্থিধারে অস্থি রাখে। যে সব খাসি রমণী পুনর্বিবাহ না করে স্বামীর স্মৃতিকে হৃদয়ে জাগরুক রাখতে চায়—আমৃত্যু তারা স্বামীর অস্থি সযত্নে রক্ষা করে। কিন্তু কেউ যদি বিবাহ করে, তাহলে পূর্ব স্বামীর অস্থিকে গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য। পুনরায় বিয়ের পরেও কেউ যদি অস্থি রাখে, তাহলে তার সন্তানেরা সেই অস্থি গোষ্ঠীর অস্থিধারে জমা দিয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে, খাসি রমণীরা স্বামীর মৃত্যুর পর এক বছর অশৌচ ও সংস্কার পালন করে। এই এক বছরের মধ্যে সে পুনর্ভূ হতে পারে না। এই সংস্কারকে উপেক্ষা করে যদি কোনও আবেগ তাড়িত খাসি রমণী অন্যের

ঘরণী হয়, খাসি সমাজ তাকে নিম্নস্তরের জীব বলে মনে করে। খাসিরা তাকেই বলে জিং স্যাঙ্। সন্তানেরাও পিতৃ-অস্থি তার কাছে রাখতে দেয় না। সেই অস্থি নিয়ে গোষ্ঠীর অস্থি-ভাণ্ডারে জমা দেয়। এমন কী পুনর্ভূ স্ত্রী সেই পবিত্র অস্থি-ভাণ্ডারে যেতেও পারে না। খাসি সমাজে বহুকামিতার নিদর্শন যে নেই—তা নয়। কিন্তু সমাজের চোখে তা অবশ্যই স্যাঙ বা পাপ। মূলত খাসি রমণীরা একাধিক পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয় না। বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহে বিশেষ কোনও বাধা না থাকায় হয়ত বহুকামিতা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। পুরুষদের বহু বিবাহ খাসি সমাজে অনুপস্থিত। মাতৃশাসিত সমাজ বলেই পুরুষদের বহুবিবাহ খাসি সমাজে প্রচলিত নেই। রক্ষিতা রাখার প্রথাও তাদের সমাজে একটি ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা। এটাকে তারা কোনও মতেই সমাজসিদ্ধ প্রথা বলে মনে করে না।

তবে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনও রমণীর সঙ্গে ভাব-ভালোবাসার ঘটনা ঘটে থাকে। এমন কী সেই সব রমণীর গর্ভে সন্তানও হয়। ওই সব সন্তানেরা প্রথা-বিরুদ্ধ মিলনের ফসল হলেও, মানবিক কারণে তারা সমাজের স্বীকৃতি পায়। অর্থাৎ খাসি সমাজ কোনও সন্তানকে অবৈধ মনে করে না। ব্যতিক্রমী মিলনের সন্তানেরা পিতৃ-অর্জিত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না।

আগেই বলেছি, স-গোত্রে বিবাহ খাসি সমাজে অমার্জনীয় অপরাধ বা স্যাঙ্। এমন কী কিছু নিয়ম পালন না করলে, লতায়-পাতায় সম্পর্কের বিবাহও নিষিদ্ধ। কোনও কোনও বিষয়ে খাসি সম্প্রদায় সামাজিক বিধি-নিষেধ কিছুটা শিথিল রেখেছে। মামার মৃত্যুর পর, কোনও খাসি মামাতো বোনকে বিয়ে করতে পারে। মামার জীবদ্দশায় সেটা কোনও ক্রমেই সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি, বাবার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার বোনের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। এ ধরনের বিয়ে খাসি রীতি বিরুদ্ধ না হলেও—সমাজ খুব একটা ভালো চোখে দেখে না। খাসি উপজাতির ওয়ার সম্প্রদায় এই ধরনের বিবাহকে কোনও রকমেই মেনে নেয় না। তাদের সম্প্রদায়ে এই বিবাহ অসামাজিক অতএব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সমাজবিধি অনুসারে কোনও খাসি এক সঙ্গে দুই বোনকে বিয়ে করতে পারে না। তবে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক বছর সামাজিক আচরণ পালন করে মৃত স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করতে পারে। অবশ্য তার জন্য তাকে জিঙ্-স্যাঙ্ বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

খুড়তুতো বোন খাসিদের ভাষায় 'পারা খা'-অর্থাৎ বংশ সূত্রে বোন। সুতরাং তার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ। খাসি, লিঙ্গম, ওয়ার ও সিন্‌টেঙ্‌দের মধ্যে আন্তর্বিবাহে কোনও বাধা নেই।

নংখলর সিয়েম বা রাজপরিবারে রাজকন্যার জন্য, ওয়ার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে স্বামী বাছাই আবশ্যিক। বর্তমানে রাজত্ব চলে গেলেও—প্রথার অবসান ঘটেনি। বদল বিবাহ খাসি সমাজে নিষিদ্ধ। তাদের সমাজের বিবাহ অনেক বিধি-নিষেধ ডিঙিয়ে অনুষ্ঠিত

হয়। বিবাহের সমাজ শুদ্ধতা-অনেক ধারা ও উপধারায় বিভক্ত। নিজ গোষ্ঠীর রক্তের পবিত্রতা রক্ষায় খাসি সমাজ খুবই সচেতন। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সচেতনা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দু-এর দশক থেকে শহরাঞ্চলে সামাজিক বিধি-নিষেধের পাঁচিলে ভাঙন শুরু হয়েছে। খ্রিস্ট-ধর্ম গ্রহণ ও প্রচারের ফলে চিরাচরিত প্রথায় ভাঙন ধরেছে। প্রথা সচেতন খাসি সমাজে সম্প্রদায় বর্হিভূত রক্তের মিশ্রণ ঘটতে শুরু করেছে। খ্রিষ্ট-ধর্ম প্রসারের সঙ্গে শিক্ষারও প্রসার ঘটেছে। নগর-সভ্যতা শহরাঞ্চলে খাসিদের সামাজিক বন্ধনকে অনেক শিথিল করে দিয়েছে। ইংরেজ শাসনের সময় বহু খাসি রমণী ধর্মান্তরিত হবার পর ইংরেজ যুবকের পাণিগ্রহণ করে ইঙ্গো-খাসি মিশ্র সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে। পরবর্তী কালে, বাঙালি, নেপালি এমন কী মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। গ্রামাঞ্চলে অবশ্য প্রথার পবিত্রতা শহরের মত এতটা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

একটি বিষয় উল্লেখ না করলে-মাতৃতান্ত্রিক খাসি সমাজে পিতার প্রতি অবিচার করা হবে। যদিও মাতৃশাসিত খাসি সমাজে মাতুলের স্থান প্রশ্নাতীত—কিন্তু পিতার স্থানও হেলাফেলার নয়। বিচ্ছেদের পর সন্তানেরা পূর্ব পিতার কথা মনে রাখে না সত্য—কিন্তু অবিচ্ছেদ্য পরিবারে পিতা সংসারে অবিসংবাদিত পরিচালক। ঠিক অভিভাবক নয়। সন্তানের অভিভাবকত্ব মায়ের উপরই ন্যস্ত। সংসারে মাতুলের স্থান যেমন উঁচুতে তেমনি মাতুলকেও অনেক সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে হয়। মাতুল সম্পর্কে খাসি সমাজে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে-'উ পা উবা লাহ্ ব্যান ইয়াই-উ-নি উবা ট্যাঙ্ হা কা ইয়াপ কা ইম্'—বাবা দিনের তাপ ও দায়িত্ব বহন করে আর জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নে মাতুলকে আসতেই হয়। বাবার মৃত্যুর পরে খাসিরা শ্রাদ্ধ করে। এই শ্রাদ্ধকে খাসিরা বলে—উথওল্যাঙ্। এর মাধ্যমেই অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি সাধান হয়। বিয়ের আগে বিচ্ছেদের কথা যেমন বলেছি, তেমনি জন্মের আগে মৃত্যুর কথা বললে কেমন হয়?

মানুষটি প্রকৃতপক্ষে মরেছে কি না সেটা ওঝা বা কবিরাজ বললে হবে না। খাসি বিধি অনুযায়ী পরিবারের কেউ কানের কাছে মুখ নিয়ে তিনবার তারস্বরে ডাকবে। জবাব না এলে কান্নার রোল উঠবে।

বিয়েতে যেমন উৎসব বিচ্ছেদে অনুষ্ঠান তেমনি মৃতদেহ সৎকারে আড়ম্বর। নারী-পুরুষ ভেদে উপকরণের কিছু পরিবর্তন হয় মাত্র।

মৃত্যুর পর মৃতদেহকে গরম জলে স্নান করিয়ে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে পাগড়ি ও ওয়েস্ট কোট বাঁ দিক থেকে ডান দিকে রাখা হয়। অর্থাৎ ঠিক জীবিত অবস্থার উল্‌টো। একটা উ-লেঙ্ পো বা ডিম মৃতের পেটের উপর রাখা খাসি সমাজের রীতি। ন'টি খৈ দিয়ে মালা গেঁথে (রিউ হাদ্রেম) মৃতের মাথায় জড়িয়ে দেওয়া হয়। বিবাহের সময় অলংকার দিয়ে বর ও বধূকে সাজানো সব সমাজের মত খাসি সমাজেও আছে। কিন্তু মৃতদেহকে অলংকারের সজ্জিত করা অন্য কোনও সমাজে বড়

একটা দেখা যায় না। অবশ্য সকলেই সোনার অলংকার দিতে পারে না। যারা ধনী, কেবলমাত্র তারাই মৃতদেহকে বিশেষ ভাবে তৈরি সোনার অলংকার দিয়ে সাজিয়ে দেয়। কানে মাক্‌ড়ি, গলায় মালা ও দেহের অন্যান্য স্থানকে অলংকার দিয়ে অলংকৃত করা হয়।

মৃতদেহ তিনদিন ঘরে থাকে। শেষ যাত্রার প্রাক্কালে পুরুষের ক্ষেত্রে একটি মোরগ ও মহিলার ক্ষেত্রে একটি বলদ উৎসর্গ করা হয়। খাসিরা বিশ্বাস করে, উৎসর্গীকৃত মোরগ বা বলদ আত্মাকে পথ দেখিয়ে অমর্ত্যলোকে নিয়ে যায়। এখানেই মৃত্যুর আড়ম্বর শেষ নয়। একটি ছোট কৌটো (কা-শাঙ্‌) মৃতদেহের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। কৌটার মধ্যে থাকে উৎসর্গীকৃত প্রাণীর অংশ বিশেষ। একটি ডিশে কিছু খাবার, কয়েকটি কোয়াই আর এক কলস জল মৃতের আত্মার উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। প্রতিদিন সকাল-সন্ধায় পঞ্চ ব্যাঞ্জন দিয়ে খাবার পরিবেশন করা হয়। মৃতদেহ্ দাহ্ ও সমাধি উভয় প্রথাই্ খাসিরা পালন করে। দাহ্ করার জন্য জিঙ্‌থ্যাঙ্‌ বা চিতা রচিত হলে আরও একটি ষাঁড় উৎসর্গ করতে হয়। যদি মৃতদেহকে কা-শাইনগেড্‌ বা কফিনে রেখে সমাধি দেওয়া হয়, তাহলে একটি শূকর বলি দিতে হয়। অমৃতলোকের পথে যাতে মৃত ব্যক্তির খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পেতে অসুবিধা না হয় তার জন্য তার সঙ্গে কিছু টাকা-কড়ি দেওয়া হয়। যে তিনরাত মৃতদেহ ঘরে থাকে, সেই তিনরাত খাসিরা পালাক্রমে মৃতদেহ পাহারা দেয়। প্রতি সন্ধ্যায় বন্দুক বা বোমার আওয়াজ করে অশুভ শক্তিকে দূরে সরিয়ে রাখে।

তারপর একসময় শব নিয়ে শোকযাত্রা বেরোয়। বাঁশি বা খাসি ভাষায় 'সারতি'র নিরবচ্ছিন্ন সুর ও ড্রামের শব্দের মধ্যে শবযাত্রীরা সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছে যায়।

অনেক প্রাজ্ঞ পণ্ডিত খাসিদের শিকড় সন্ধান করে নিশ্চিত উৎসস্থল খুঁজে পাননি। তাদের মূল যে কোথায়, খাসিরা নিজেরাও তা ভালো করে জানে না। তারা শুধু জানে অন্য কোনও স্থান থেকে তারা খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে এসেছে। কত যুগ আগে, তারও কোনো হিসাব নেই। তবে তারা যে খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের বহু পুরনো বাসিন্দা, সে বিষয়ে উপজাতিতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে দ্বি-মত নেই।

অনেকে মনে করেন, বার্মা — বর্তমান মায়ানমার থেকে পাটকৈ পাহাড় অতিক্রম করে খাসিরা প্রথম এসেছিল শ্রীহট্টের সমভূমিতে। খাসি কিংবদন্তি বলে, প্রচণ্ড এক বন্যায় শ্রীহট্টে তাদের বাসস্থান ভেসে গিয়েছিল। সাঁতার কেটে চলে এসেছিল চেরাপুঞ্জি। তখন চেরাপুঞ্জির নাম ছিল সোহরা। এখনও খাসিরা সোহরাই বলে। ইংরেজরা সম্ভবত সোহরাকে চেরা করেছে। পরবর্তী কালে পুঞ্জি যোগ হয়ে নাম পেয়েছে চেরাপুঞ্জি। এ নাম পৃথিবী বিখ্যাত। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত এখানেই হয়। সাতের দশক থেকে অবশ্য চেরাপুঞ্জি তার গৌরব হারাতে শুরু করেছে। এখন বৃষ্টি সরে গেছে মৌসিমরামে। চেরাপুঞ্জির পরিবেশ বিপন্ন হয়ে উঠেছে। মেঘ আসে কিন্তু বর্ষণ হয় না। চেরাপুঞ্জি থেকেই খাসিরা ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায়। কিংবদন্তি থেকে আরও জানা যায়, সেই বন্যায় খাসিদের লিপি হারিয়ে যায়। তাদের বই-পুস্তক সব

ভেসে যায়। বাঙালিরা তাদের লিপি ও পুস্তক রক্ষা করতে পেরেছে—কিন্তু খাসিরা পারেনি। তাই তাদের কোনও লিপি নেই।

ভাব ও ভাষা প্রকাশের জন্য রোমান লিপি ব্যবহৃত হয় খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারোদের মধ্যে। মিশনারিরা ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে রোমান লিপির সূত্রপাত করেন। তার আগে বাংলা লিপিই ব্যবহৃত হত। অসমের লেখ্যাগার খুঁজলে হয়ত এখনও তার কিছু নমুনার সন্ধান মিলতে পারে। যেখান থেকে খাসিরা আসুক না কেন, তারা এখন আমাদের প্রতিবেশী। ভারতীয় সংস্কৃতির অংশীদার এবং অভিন্ন অঙ্গ।

যারা খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে—তারা এখন সেই ধর্ম পালন করলেও চিরাচরিত খাসি সংস্কার ও সমাজ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বাতিল করে দেয়নি। ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা শহরে যত—গ্রামাঞ্চলে ঠিক তত নয়। তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেনি। তবে সভ্যতার সঙ্গে-পা-মিলিয়ে তারাও দ্রুত এগিয়ে আসছে। শিক্ষার প্রসার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আহারে-বিহারে-পোশাকে-আশাকে পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু মাতৃতন্ত্রে আস্থা ও সম্মান এখনও হারিয়ে যায়নি। সমাজ, সংসার, ব্যর্বসা ও চাষে মাতৃশাসিত প্রভাব একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। ধর্মান্তরিত হবার পর ইংরেজদের নাম গ্রহণ করলেও—মাতৃ পদবির বিলোপ ঘটায়নি।

আমরা যেমন পূর্বপুরুষকে স্মরণ করি, খাসিরা তেমনি পূর্বরমণী-কে পূজা করে। তারা বিশ্বাস করে পৃথিবীতে প্রথমে নারী এসেছিল, সেই নারীই তাদের এই পৃথিবীতে এনেছে। 'কি-ইয়াওবেই তাইনরাই' বা প্রমাতামহী তাদের অস্তিত্বের শিকড়। খাসিদের বিভিন্ন শাখা সেই প্রমাতামহীকে বিভিন্ন নামে উচ্চারণ করে।

খাসি রমণীরা সবচেয়ে সুন্দর পোশাকে সজ্জিতা। শহরের পুরুষদের পোশাকে সাহেবিয়ানা এলেও গ্রামে এখনও পরনে ধুতি, গায়ে ওয়েস্ট কোট আর মাথায় পাগড়ির সন্ধান মেলে। পৌরাণিক ও আধুনিক দু-রকমের পোশাকই খাসি সমাজে প্রচলিত। শহরের পুরুষেরা সাহেবি কোট পরলেও—গ্রামে এখনও প্রাচীন জিম্‌ফঙ্‌ বা হাতকাটা কোটের প্রচলন রয়েছে। খাসি রমণীদের বলা হয় 'বেস্ট ক্লোথড্‌ উইমেন'।

কং বা বি-র শরীরের প্রথম পোশাকটিকে খাসিরা বলে, কা-জিম্‌পিয়েন। এই পোশাক শরীরকে জড়িয়ে হাঁটু পর্যন্ত নেমে আসে। তার উপরে থাকে মুগা বা সিল্কের কা-জেন্‌সেম্‌। অসমদের মেখলা বা বাঙালির শাড়ির মত নয়। কাঁধ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত কা-জেন্‌সেম্‌ ঝুলে থাকে। জেন্‌সেমের উপর যে পোশাকটি থাকে তার নাম কা-জেইনকুপ। মাথায় থাকে একটি ওড়না যার নাম কা-তাপ-মোহ্‌-খেলহ। তারা দেহকে নগ্ন রেখে শারীরিক সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না—সর্বাঙ্গ আবৃত নয়নসুখ পোশাকের মাধ্যমে ব্রহ্মচারীরও দৃষ্টি বিভ্রম ঘটায়।

খাসি পুরুষ ও রমণী উভয়েই অলংকার প্রিয়। সোনা, রুপো, বীডস্‌ ও কোরালের বিভিন্ন ডিজাইনের অলংকার পরে। উৎসব অনুষ্ঠানে সোনা বা রুপোর মুকুট খাসি

রমণীরা পরবেই। বিশেষ করে নংক্রেম নৃত্যে মুকুটবিহীন কোনও খাসি মেয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে না। অংশগ্রহণকারী মেয়েকে কুমারী (ভার্জিন) হতেই হবে। পরিবর্তিত যুগেও আপন সংস্কার থেকে খাসিরা সরে আসেনি। ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে কিছু পরিবর্তন এলেও মনের পর্দায় সংস্কার সক্রিয়। সংস্কার ভাঙাকে খাসিরা বলে কা-স্যাঙ্-কা পাপ।

খাসিরা ডাকিনী বিদ্যার বিরোধী। খুন ও আত্মহত্যা তাদের কাছে পাপ। খাসিরা কোনও সাক্ষাৎপ্রার্থী বা অতিথির মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয় না। মানুষের প্রতি অন্যায়, অবিচার ও অবিশ্বাস খাসিদের কাছে কা-স্যাঙ্-কা-পাপ।

১৪

দিমাসা

আপনি কুন্তী প্রথার কথা শুনেছেন?

—কুন্তী প্রথা! সেটা আবার কী জিনিস?

অশ্বিনী বরুয়া গম্ভীর হয়ে বলেন, মহাভারতের কুন্তীর কথা জানেন না?

কুন্তীকে তো সবাই জানে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে আবার প্রথা কিসের?

অশ্বিনী বরুয়া বলেন, কোনও বিশেষ ব্যক্তির মতবাদ ও আচার-আচরণ অন্য কেউ যদি নিয়মিত মেনে চলে, তখন তো তা প্রায় প্রথার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তাই না?

—কুন্তীর আচার-আচরণ বা মতবাদটি কী?

এবার আরও খানিকটা গম্ভীর হন অশ্বিনী বরুয়া। অসমীয়া সরকারি কর্মচারী। সময় ও সুযোগ পেলে, রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত ঘুরে বেড়ান। জাতি ও উপজাতির জীবনচর্চার বিশষত্ব কিছু থাকলে, তা সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহটাই তাঁর বাতিক। আর নিজের মন মত কোনও জাতি বা উপজাতির আচার-আচরণের নামকরণ করেন। মাঝে মাঝে কারও পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাল্টিয়েও দেন। যেমন শিলং-এর খাসি উচ্চপদস্থ কর্মচারী হারম্যান দিয়েংদোকে অশ্বিনী বরুয়া চিরকাল হরিমোহন বলে এলেন। এখন আবার শোনাচ্ছেন কুন্তী প্রথা! ,

অশ্বিনী বরুয়া বলেন, উত্তর পার্বত্য কাছাড়ে দিমাসাদের মধ্যে কুন্তী প্রথার প্রচলন আছে। সেখানে গেলেই দেখতে পাবেন।

—কুন্তী প্রথা কী, আগে সেটা বলুন।

অশ্বিনী বরুয়ার সঙ্গে কিছুটা বস্‌তারের মুন্সীর মিল আছে। সব প্রশ্নের জবাব হাসিমুখে দেন। নিজেও বক্ বক্ করতে ভালবাসেন।

অশ্বিনী বরুয়া বলেন, কুন্তী তো পছন্দ মতো পুরুষের কাছ থেকে সন্তান চেয়ে নিতেন, তাই না? সন্তান নিতেন কিন্তু বিয়ে করতেন না। যেমন ধরুন, সূর্যের ঔরসে কর্ণ। কুন্তীর এই আদর্শ যদি কোনও জাতি বা উপজাতি মেনে চলে, তাহলে তাকে আপনি

নিশ্চয়ই প্রথা বলতে পারেন। অশ্বিনী বরুয়ার যুক্তি অকাট্য। আর যা অকাট্য তাকে কাটাবার চেষ্টা করা বৃথা।

অশ্বিনী বরুয়া বলেন, উত্তর পার্বত্য কাছাড়ে দিমাসা উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রকম একটা প্রথার অস্তিত্ব আছে—কিন্তু বহুল প্রচলিত নয়। দিমাসাদের জীবনচর্চার কাহিনী এই প্রথা দিয়েই শুরু করতে চাইছেন অশ্বিনী বরুয়া। প্রশ্ন করার আগেই অশ্বিনী বরুয়া বলেন, না, দিমাসা রমণীরা সূর্য, চন্দ্র বা বরুণ দেবতাদের ডাকেন না। নিজের গাঁয়ের কোনও পছন্দসই যুবককে যৌন-মিলনে আহ্বান করে।

উত্তর পার্বত্য কাছাড়ের দিমাসা একটি উল্লেখযোগ্য উপজাতি। তারা প্রাক্-সাক্ষর হলেও—প্রাগৈতিহাসিক সমাজের বাসিন্দা নয়। যদিও অস্তমিত বিংশ শতাব্দীর মহান সভ্যতা তাদের অনেক সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার ধারে কাছে পৌঁছুতে পারেনি। জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ী বসতি। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ দুর্গম পথ অতিক্রম করে তাদের বসতিতে পৌঁছয়নি। তাতে তারা বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নয়। বরং নৃ-তাত্ত্বিকদের ধারণা, বহির্বিশ্বের কলুষিত বদান্যতা সেখানে পৌঁছুলে—দিমাসা সমাজ ব্যবস্থায় অবক্ষয় শুরু হতে পারে।

সমান অধিকার নিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের মধ্যে যে লাঠালাঠি চলছে—বহু শতাব্দী আগেই দিমাসা সমাজে তা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। সংসারে, সমাজে, কর্মে এবং ব্যবহারিক জীবনে, দিমাসা নারী-পুরুষে কোনও ভেদ নেই। কন্যা ও পুত্র সন্তানকে তারা সমান আদরে গ্রহণ করে। দিমাসারা সৌভাগ্যবান, কারণ কন্যা-ভ্রূণ হত্যার পৈশাচিক প্রবণতা এখনও তাদের সমাজে অনুপ্রবেশ করেনি। নৃ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, দিমাসা সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টি সভ্য সমাজ গ্রহণ করলে এই জ্বলন্ত সমস্যাটির সমাধান অচিরেই হয়ে যেতে পারে।

ছেলে বা মেয়ের জন্ম দিমাসা সমাজে সমান প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, সংসারে উৎসবের কোনও তারতম্য ঘটে না। সমান যত্নে তারা বড় হয়। কন্যা-সন্তান-পুত্র সন্তানের চেয়ে নিম্নমার্গীয়, সভ্য সমাজের এই ধারণাটাই দিমাসা সমাজে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফলে ছেলে ও মেয়ে সমান অধিকার নিয়ে বড় হয়। তাই যুগের বিবর্তনেও তাদের সমাজের সংহতি কখনই বিপন্ন হয়নি।

দিমাসা সমাজে লিঙ্গ কোনও প্রতিবন্ধক নয়। ব্যবহারিক জীবনে এ রকমের কোনও ধারণাই তাদের সমাজে নেই। সব বিষয়ে মেয়েরা ছেলেদের মতোই উদ্যোগী। ঘরে-বাইরে নারী-পুরুষ সমান পরিশ্রমী। উৎসবে-অনুষ্ঠানে ক্ষেতে-খামারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। অশ্বিনী বরুয়াকে কুন্তী প্রথার কথা মনে করিয়ে দিই।

অশ্বিনী বরুয়া বলেন, দিমাসাদের জীবনচর্চার সরণী বেয়ে এক সময় কুন্তী প্রথায় আমরা ঠিক পৌঁছে যাব। দিমাসাদের পিতৃ ও মাতৃধারায় সামাজিক পরিচয়ে তারা কোনও ব্যবধান রাখে না। কোনও ছেলে বংশ পরিচয় দেবার সময় প্রথমে তার পিতৃধারায় ঠাকুর্দা এবং একই মাত্রায় মাতৃধারায় দিদিমার পরিচয় উল্লেখ করে। তেমনি

মেয়ে যখন বংশ পরিচয় দেয়—তখন প্রথমে মাতৃধারায় দিদিমা—এবং পরে পিতৃধারায় ঠাকুর্দার কথা উল্লেখ করবে। এ থেকে প্রমাণিত হয়—দিমাসা সমাজ উভয় ধারায় প্রভাবিত এবং গর্বিত।

অশ্বিনী বরুয়া বলেন, অন্য কোনও সমাজে বংশ পরিচয়ের এমন ব্যবস্থা আমার জানা নেই। বংশ পরিচয়ের ব্যবস্থাই প্রমাণিত করে, দিমাসা সমাজে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। অথচ এই সহজ স্বীকৃতি নিয়ে, আমাদের সমাজে কী কাণ্ডকারখানাই না চলছে!

দিমাসা সমাজ ব্যক্তি স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করে না। ছোট-বড় যেই হোক, কারও মতামতের মূল্যকে নসাৎ করে না। সাত-আট বছর বয়স থেকে মেয়েরা মায়ের কাজে সাহায্য করে। তারা নদী থেকে জল আনে। বন থেকে জ্বালানি জোগাড় করে। এমন কি ঘরে তৈরি জিনিস বাজারে নিয়ে বেসাতি করে।

ছেলে ও মেয়ের ব্যক্তিত্ব প্রকাশে দিমাসা সমাজ কিছুটা প্রকৃতি নির্ভর। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না। ছোটবেলা থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার উদ্দেশ্য নিয়ে কখনই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেয় না। ছোটরাও দায়িত্ব পালনে বড় একটা ব্যর্থ হয় না। তাদের উপর আস্থা স্থাপন করে সমাজের আস্থাভাজন করে তোলাই সমাজের কৃতিত্ব।

অশ্বিনী বরুয়া আগেই বলেছেন,—দিমাসা সমাজ ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। প্রাক্-যৌবনেই দিমাসা ছেলে-মেয়ে ভবিষ্যৎ সুরক্ষার পরিকল্পনা করে। তারা যদি পরস্পরের জীবনসঙ্গী বেছে নেয়, দিমাসা সমাজ সেখানে হস্তক্ষেপ করে না। তাদের বিচার-বুদ্ধির উপর আস্থা রেখে-ভবিষ্যৎ সংসার রচনায় সহযোগিতা করে।

বিয়ের বিষয়ে দিমাসা সমাজ যথেষ্ট উদার। প্রেমজ বিবাহের সংখ্যা বেশি হলেও—পাত্র-পাত্রী পিতা-মাতার অনুমতি নিতে ভুল করে না। যেখানে প্রেমঘটিত ব্যাপার না থাকে—সেখানে পিতা-মাতা তাদের দায়িত্ব পালন করে। বিয়ে পাকা করার আগে সর্বসমক্ষে ছেলে ও মেয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়। সাধারণত কেউ বিরোধিতা করে না। যদি কোনও পক্ষ অমত করে, তাহলে দিমাসা সমাজ সে বিয়ের ব্যাপারে আর এগোয় না। এমন কি ছেলে বা মেয়ের কাছ থেকে অমতের কারণও জানতে চায় না। কোনও কৈফিয়ৎও তলব করে না। ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বলেই দিমাসারা কারও মতামতকে উপেক্ষা করে না।

প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, এইবার বুঝি অশ্বিনী বরুয়া কুন্তী-প্রথার প্রসঙ্গ তুলবেন। কিন্তু অশ্বিনী বরুয়া সেদিকে যান না।

অন্য উপজাতিদের মত দিমাসাদের মোরাং বা রাশেং নেই। সন্ধ্যার পর মেয়েরা কারও বাড়ির উঠানে সমবেত হয়। সমবয়সীরা নিজেদের মধ্যে নানা গল্প করে। কখনও বা গ্রামের বয়স্ক মহিলারা তাদের বৈঠকে যোগ দেয়। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা উঠতি মেয়েদের কাছে বর্ণনা করে। এই বিবরণ আর বর্ণনার মধ্য দিয়েই যুবতীরা নিজের

মনকে গড়ে তোলে। মাঝে মাঝে গাঁয়ের ছেলেরাও এসে দাওয়ায় বসে। তারাও বয়স্কদের জীবনের অভিজ্ঞতা শোনে। পাহাড়ে ঘেরা দিমাসাদের গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। তাদের ঘরে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলে। কম্পিত দীপশিখার আলোর ঝলকানি মাঝে মাঝে দাওয়ায় এসে পড়ে। আর সেই আলোতে পরস্পরের মুখ দেখে দিমাসা যুবক-যুবতী। কোনও এক সময় কেউ কেউ উঠে দাঁড়ায়। অন্ধকারে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে নাচে। গান গায়। সে গানে দেহতত্ত্বের দহন থাকে না। প্রকৃতির সন্তানেরা প্রকৃতির বন্দনায় মশগুল হয়ে ওঠে।

'এই পাহাড় আমাদের, এ নদী আমাদের। বৃক্ষ-লতাদি-গুল্মাদি সব আমাদের জীবনের সাথী। এই নিয়ে আমরা একসঙ্গে বাঁচি।'

প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দেওয়া আর নিজেদের জীবনকে প্রকৃতি-নির্ভর করে তোলা, দিমাসাদের সামাজিক অনুজ্ঞার অন্তর্গত।

—তবে কখনও কি তাদের পা-পিছলে যায় না?

অশ্বিনী বরুয়া বলেন, যায়। জীবনের চড়াই-উৎরাইয়ে কেউ না কেউ আছাড় খায়। চলতে চলতে মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটে। অবশ্য তার জন্য দিমাসাদের সামাজিক দাওয়াই তৈরিই থাকে। কৃত কর্মের তারতম্য অনুসারে সে দাওয়াই ব্যবহার করা হয়। তবে ছন্দপতনের ঘটনা, দিমাসা সমাজে বড়ই বিরল।

দিমাসা সমাজ অবিবাহিত যুবক-যুবতীর যৌন মিলনে উপর খুব একটা কঠিন বিধি-নিষেধ আরোপ করে না। কিন্তু বিবাহিতদের ক্ষেত্রে যৌন অপরাধ দিমাসা সমাজ ক্ষমা করে না। পুরুষদের বহু-বিবাহ যেমন সমাজ-পরিপন্থী—তেমনি বিবাহিতা রমণীর গোপন অভিসার অমার্জনীয় অপরাধ। স্ত্রী বিয়োগের পর কোনও পুরুষ দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে। কিন্তু স-সন্তান কোনও বিধবা বড় একটা দ্বিতীয়বার কণ্ঠীবদল করে না। তবে অল্পবয়সী বিধবাদের ক্ষেত্রে দিমাসা সমাজের বিধি-নিষেধ কিছুটা শিথিল। কেউ যদি বিধবা বিয়ে করতে চায় এবং সেই বিধবার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে, গ্রামে তাদের জন্য নতুন ঘর তৈরি করা হয়। তবুও যে দু-একটা দুর্ঘটনা ঘটে না তা নয়। কোনও ব্যক্তি যদি একই অপরাধ বার বার করে, তাহলে দিমাসা সমাজ তাকে 'ঘৃণিত' ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে। কিন্তু গ্রাম থেকে বহিষ্কার করে না। ঘৃণিত জীবনের গ্লানি তাকে সারা জীবন বহন করতে হয়।

দিমাসারা ব্যক্তিগত সুনাম, সততা আর সাহসিকতার জন্য প্রশংসিত। এই তিনটি জিনিস তারা কখনই নষ্ট করে না। তারা মনে করে, সততা আর সুনাম একবার কলঙ্কিত হলে—সামাজিক প্রতিষ্ঠার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। দিমাসাদের আত্মবিশ্বাস সমাজে তাদের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল রাখে। ঠিক একই আত্মবিশ্বাসে দিমাসা রমণীরা বিশ্বাসী। বনে জঙ্গলে নির্ভাবনায় আর নির্ভয়ে তারা একা একা কাজ করে। দিমাসারা বিশ্বাস করে, আত্মবিশ্বাসহীনতার মধ্য দিয়েই মন অপরাধী হয়ে ওঠে। আর অপরাধী মন নিয়ে সংসারে যেমন সুখী হওয়া যায় না—তেমনি সমাজেও সম্মান থাকে না। নৃতাত্ত্বিকেরা

বলেন, আত্মবিশ্বাস দিমাসাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়েও দিমাসা সমাজ একটা নিজস্ব রীতি মেনে চলে। মায়ের সম্পত্তির মালিক হয় মেয়ে আর পিতার সম্পত্তি পায় ছেলে। এই ব্যবস্থার ফলে—সম্পত্তি নিয়ে দিমাসা নারী-পুরুষের মধ্যে কোনও বিবাদ ঘটে না। ভাই-বোনের মধ্যে কোনওদিন মতবিরোধ ঘটে না, সম্পর্কে কোনও দিন চিড় ধরে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় দিমাসাদের সম্পত্তির পরিমাণ বড় কম। দারিদ্র তাদের নিত্যসঙ্গী। তারা দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেদের আত্মসম্মান আর সততাকে বজায় রাখে।

বাবা সংসারের কর্তা হলেও—চাবিকাঠি থাকে মায়ের হাতে। মাতৃত্ব ছাড়াও সংসারের দায়-দায়িত্ব স্বামীর সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নেয় দিমাসা রমণীরা। সন্তান পালন থেকে—জুমের মাঠ পর্যন্ত সে সমানভাবে কাজ করে। আট-দশ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা সরাসরি মায়ের তত্ত্বাবধানেই থাকে। ছেলে-মেয়ের জীবনকে গড়ে তুলতে দিমাসা সমাজে মায়ের অবদান বাবার চেয়ে অনেক বেশি। ছেলে একটু বড় হলেই সে বাবার সহচর হয়ে যায়। অবশ্য মেয়ে থাকে মায়ের সঙ্গে। মায়ের সাহচর্যে তার জীবন ও মনের বিকাশ ঘটে।

আমাদের সমাজে ছেলে-মেয়েদের কাজের লোকের কাছে বা ক্রেসে রেখে বাবা-মা চাকরি করতে যায়। তাদের মন কোন্ উপাদানে গড়ে ওঠে—তা লক্ষ্য রাখার সময় পায় না। কিন্তু দিমাসা মায়েরা জুম বা জঙ্গলে গেলেও—সন্তানের ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখে। স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হয়ে ওঠে মা। যতদিন মা বেঁচে থাকে—তার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার অধিকার কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়ের নেই। এটাই হল দিমাসা সমাজের অনুশাসন।

তবুও কি দিমাসা নর-নারীর জীবনে দুর্বল মুহূর্ত আসে না? নিশ্চয়ই আসে। আর আসে বলেই, মাঝে মাঝে দিমাসা যুবক-যুবতী প্রাক্‌বিবাহ সম্ভোগে লিপ্ত হয়। এই সম্ভোগের সোহাগে যদি কোনও কুমারী মাতৃত্বের স্বাদ পায়, তাতে দিমাসা সমাজ খুব বিব্রত বোধ করে না। পরস্পরের স্বীকৃতি আর পারিবারিক অনুমতি নিয়ে তারা নতুন ঘরে চলে যায়। ব্যতিক্রমী ঘটনা যে একেবারে ঘটে না, তা নয়। হঠাৎ যখন কোনও যুবক পিতৃত্ব অস্বীকার করে, অথবা সম্ভোগের পরেই সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে বিয়ের পথে পা বাড়ায় না, তখনই ঘটনাটি যায় গাঁও সভায়। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কিছু জরিমানা দিয়ে মুক্ত হয়ে যায় ছেলেটি। যে নতুন মুখ পৃথিবীতে আসে-তার উপর কোনও কলঙ্ক আরোপিত হয় না। দিমাসা সমাজে কোনও জারজ নেই।

কুন্তী প্রথার কাছাকাছি এসেও—অশ্বিনী বরুয়া দিমাসাদের অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনেন। মৃদু হেসে বলেন, দিমাসা মেয়েরা বিয়ের পর আমাদের মত স্বামীর পদবী গ্রহণ করে। অর্থাৎ মাতৃ-পদবীর সঙ্গে যুক্ত হয় স্বামীর পদবী। মনে রাখতে হবে-বিয়ের আগে বা পরে মেয়েদের মাতৃপদবী কখনই লুপ্ত হয় না। খাসি ছেলে-মেয়েরা মাতৃপদবীতে পরিচিত। শুধু ব্যতিক্রম ছিলেন ডঃ নমিতা স্যাডপ্ সেন ব্যাসম। তিনি মাতৃ পদবী স্যাডপ্

পিতৃপদবী সেন এবং স্বামীর পদবী ব্যাসম্ নিজের নামের সঙ্গে ব্যাবহার করেন। খাসি কন্যা নমিতা বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ প্রয়াত এ এল ব্যাসমের স্ত্রী।

যদি কোনও কারণে দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে মেয়ে আবার পিতৃ উপাধিতে ফিরে যায়।

শুধু জুম আর জঙ্গল নিয়ে দিমাসা নর-নারীর জীবন নয়। তাদের একটা সাংস্কৃতিক জীবন আছে। নাচে-গানে আর নানা অনুষ্ঠানে তারা সে জীবন উপভোগ করে। সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে। 'রজনী গোবরা' আর 'হনি' গোবরার উৎসবে তারা ধর্মীয় নৃত্যে মেতে থাকে।

জুম থেকে ফসল তোলার উৎসবকে দিমাসারা বলে—'বুসু'। বুসুই হচ্ছে দিমাসাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে নারী-পুরুষ দলবদ্ধভাবে এই নাচে অংশগ্রহণ করে। জ্যোৎস্না প্লাবিত পাহাড়ের গায়ে 'মুরির' শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়।

—মুরি কী?

অশ্বিনী বরুয়া বলেন, মুরি খানিকটা আমাদের সানাই-এর মত দেখতে—কিন্তু সানাই নয়।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়াও, দিমাসা রমণীরা পুরুষদের মত সমান অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। হাটে-বাজারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদেরই বিক্রেতার ভূমিকায় দেখা যায়। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র তারাই কেনে। সাধ-আহ্লাদের সৌখিন জিনিস কেনার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে। তাদের এই অধিকারে কোনও পুরুষ হস্তক্ষেপ করে না। তবে কর্তব্যের খাতিরে দিমাসা রমণী স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে।

এবার বাধ্য হয়েই অশ্বিনী বরুয়াকে কুন্তী প্রথার কথা মনে করিয়ে দিই।

অশ্বিনী বরুয়া হেসে বলেন, এখন আমরা কুন্তী-প্রথার দিকে এগিয়ে যাব।

দিমাসারা ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশায় কোনও বাধা-নিষেধ নেই। নিজেদের জীবন-সঙ্গী নিজেরাই খুঁজে নিলেও পারিবারিক অনুমতি নিতে কখনও ভুল করে না। মতামত না নিয়ে কোনও পিতা-মাতা ছেলে বা মেয়ের বিয়ে ঠিক করে না। কনেপণের প্রথা দিমাসা সমাজে আছে। কনেপণের অধিকার মায়ের। এটা মাতৃধারার সম্মান।

উপযুক্ত কারণ ছাড়া দিমাসা দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। স্বামীর অন্য রমণীতে আসক্তি ও স্ত্রী-র পরপুরুষের সঙ্গে সহবাস-দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। তাছাড়া, নিষ্ঠুরতা ও দু-জনের একজনের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। তবে দিমাসা সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ অবশ্যই বিরল ঘটনা। দিমাসা রমণীরা নিজেদের

সামাজীকরণে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। হাটে-বাজারে এবং গ্রামান্তরে তারা নির্ভয়ে এবং নির্দ্বিধায় যাতায়াত করে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দিমাসা রমণীরা পুরুষদের সমান্তরাল অধিকার ভোগ করে। পুরুষদের মত মেয়েরাও মৃতদেহ সমাধিস্থলে বহন করে নিয়ে যায়। অর্থাৎ সংসার থেকে সমাধি পর্যন্ত দিমাসা সমাজে নারী পুরুষে কোনও ফারাক নেই।

কুন্তী প্রথা?

অশ্বিনী বরুয়া বলেন, ভোলেননি দেখছি। দিমাসা কুমারী তার মন-পসন্দ কোনও যুবককে আহ্বান করতে পারে। তার ঔরসজাত সন্তানের মা হতে পারে। তারপর সেই যুবককে বিয়ে করা দূরে থাক চিনতেই পারে না। সন্তান জন্মের পর সেই যুবকের সঙ্গে সে আর সম্পর্ক রাখে না। কিছু জরিমানা দিলেই জীবনের সেই নাটকীয় মুহূর্তটির ওপর যবনিকা নেমে আসে।

আর সেই সন্তান?

অশ্বিনী বরুয়া বলেন, আগেই বলেছি—দিমাসা সমাজে কেউ জারজ নয়।

১৫

মিজো

নুলারিম! এমন একটি মিষ্টি শব্দের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় নেই। না থাকবারই কথা। কারণ শব্দটি বাংলা নয়। মিজো। মাত্র কয়েক দশক আগেও আমরা যাদের লুসাই বলে জানতাম—এখন তারাই মিজো নামে আমাদের প্রতিবেশী। ভারতের ২৩তম অঙ্গরাজ্য। ১৯৮৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করেছে। মায়ানমার ও বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষা এই রাজ্যটি উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত বোনের এক বোন। অসমের শিলচর ও বাংলাদেশের সীমান্তের কাছাকাছি কিছু সমভূমি ও উপত্যকা ব্যতীত গোটা রাজ্য জুড়েই পাহাড় আর বন। মিজো মানে পর্বতবাসী। পাহাড়ের চূড়ায় ঘর। সেই অর্থে মিজোরা হল উচ্চভূমির বাসিন্দা। গল্প আছে, কেউ ডাকলে তারা নীচে নামে না। আহ্বানকারীকে সাদরে উপরে ওঠার আমন্ত্রণ জানায়। এটা শুধু গল্প কথা নয়। যাঁরা এই উপজাতির গভীর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই জানেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিটি মিজোর জীবনের লক্ষ্য। এই উপজাতির জীবনচর্চা করতে গিয়ে মানববিজ্ঞানীরা একটা বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করেছেন। সেটি হল—ঐক্য ও একাত্মবোধ। ঐক্য ও একাত্মের প্রতীক মিজো। একথা অনস্বীকার্য যে, ঐক্য ও একাত্মতা এই উপজাতির কাছে সত্যিই শ্লাঘার বিষয়।

ফাউঙপুই বা ব্লু মাউন্টেনের মত মিজোদের মন কঠিন ও উদার। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তারা সরব। অপরদিকে ন্যায়ের সমর্থনে অত্যন্ত মানবিক। জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে ফাউঙপুইর মতই অটল ও কঠিন। মিজোরামের সইহা জেলায় মায়ানমার সীমান্ত ঘেঁষা ফাউঙপুই রডডেনড্রনের অভয়ারণ্য। নীল পাহাড়ে লালের এমন সমারোহ দেশের অন্য কোথাও দেখা যায় না। দু-হাজার দু'শ দশ মিটার উঁচু মিজোরামের এই সর্বোচ্চ পাহাড় একবার বিজ্ঞানীরা অভিযান ও সমীক্ষা করেছিলেন। রডডেনড্রনের

ডালে-ডালে শুধু নৈসর্গিক আবেদন নয়—সীমান্তের সতর্ক প্রহরী ফাউঙপুইর অভ্যন্তরে কিছু খনিজ পদার্থ রয়েছে—যা মিজোরামের অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেহেতু, ফাউঙপুই সমগ্র মিজোরামের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের রক্ষা কবচ—বনানীর ব্যবচ্ছেদ করে তাকে বিঘ্নিত করা আদৌ সহজ নয়। মিলি-পুক যাবার পথে সইহাতে পরিচয় হয়েছিল লালবেন রোয়াতির সঙ্গে। ফাউঙপুই বা নীল পর্বতের পাশে জউল-বুক বা যুবকেন্দ্রে বসে রোয়াতি নুলারিমের গল্প বলেছিলেন।

যুবকেন্দ্র বা ব্যাচিলর ডর্মিটরি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যেই আছে। অরুণাচলে যার নাম মসুপ—নাগাল্যাণ্ডে তাকেই বলা হয় মোরাং। মিজোরামে তার পরিচয় জউলবুক।

গ্রামের যুবকেরা এখানে জমায়েত হয়। না, শুধু আড্ডা নয়। শুধু খোশগল্প করার জন্য নয়। নিজেকে পুরোপুরি দায়িত্বশীল মিজো হিসাবে গড়ে তোলার জন্যেই জউলবুকে তারা হাজিরা দেয়। প্রয়োজনে রাত কাটিয়ে, কাকভোরে ঘরে ফিরে যায়। জউলবুক মিজোরামের গ্রাম্য জীবনে এক সমাজ-সিদ্ধ প্রথা। এখান থেকেই মিজো যুবকেরা জীবনের শিক্ষা নেয়। এখানে থেকেই চরিত্র গঠনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। নুলারিমের গল্প রোয়াতি এখানেই শুনিয়েছিলেন। সুন্দরী রোয়াতি। অবশ্য বেশির ভাগ মিজো রমণীই সুন্দরী ও সুদর্শনা। মিষ্টি ভাষী ও মিশুকে।

নুলা মানে কুমারী। রোয়াতিও নুলা। অর্থাৎ নুলা রোয়াতি। তবে নুলা রোয়াতি কেউ বলে না। নামের আগে সংক্ষেপে লেখে এন এল। আমাদের কে এম-এর মত। নুলারিম আদৌ গল্প নয়। এটি মিজো সমাজ ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নুলারিম সমাজ ও সংস্কৃতি সিদ্ধ। প্রেমের প্রস্তুতিকে বলা হয় নুলারিম।

বিয়ের আগে প্রেম মিজোদের সংসার জীবনে প্রবেশের পূর্ব শর্ত। বহু যুগ থেকে এই ব্যবস্থা মিজো সমাজে প্রচলিত। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও মধ্যযুগে প্রবর্তিত এই ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র হেরফের হয়নি। শহর এলাকায় নুলারিমের প্রকৃতি সামান্য পরিবর্তন হলেও—মূল ধারা থেকে কিছুমাত্র সরে যায়নি।

যোগাযোগ ভিত্তিক বিবাহ মিজো সমাজে বিরল। নুলারিমের মধ্য দিয়েই প্রেমের অবতারণা। অভিভাবকের উপস্থিতিতে পরিণয়ে তার পরিণতি।

সন্ধ্যার পর নুলার সন্ধানে বের হয় মিজো যুবক। জীবনের সঙ্গিনীকে এমনি করেই খুঁজে নেয় তারা। টিলার উপরে মিজো বাড়ির দরজা সারারাত খোলা থাকে। যে কোনও বাড়িতে যে কোনও যুবক ঢুকতে পারে। বসতে পারে। প্রয়োজনে রাত কাটাতেও পারে।

এ সবই ঘটে নুলা বা কুমারী মেয়েকে কেন্দ্র করে। রাতে বাইরের ঘরে কাজে ব্যস্ত থাকে নুলা। হয় তাঁত চালায়—নয় চাল বাছে। আর তার সামনে বসে থাকে অবিবাহিত যুবক। কখনও একা—কখনও একাধিক। সরাসরি প্রেম নিবেদন নয়। প্রেমের প্রসঙ্গ থাকে আলাদা। হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনা আর নানা গল্পের মধ্যে দিয়েই নুলার মনে স্থান পেতে চায় উপস্থিত যুবকেরা। নুলা সকলের প্রতি সমান আচরণ করে। তার চোখে-মুখে ব্যবহারে বিশেষ কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না। তার মনের গতি-প্রকৃতি

উপস্থিত কোনও যুবক বুঝতে পারে না। নুলার মনের গোপন ইচ্ছা এক রাত্রে উন্মোচিত হয় না। যা শুরু হয় গ্রীষ্মে তা প্রকাশ পায় বসন্তের কোনও এক দিনে। এমনি করে দিন-মাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে প্রেম-প্রার্থী যুবক। মাঝপথে ব্যর্থ হয়ে এক দল চলে যায়, অপর দল ভিড় করে। নবাগতদের কাছে নুলা আরও বেশি রহস্যময়ী হয়ে ওঠে।

বাইরের ঘরে সারারাত গল্প-গুজবকে স্বাগত জানায় অভিভাবকেরা। যে নুলার কাছে যত বেশি সংখ্যক যুবক আসে, সেই নুলার বাবা-মা তত বেশি গর্ব অনুভব করে। নিজের মেয়ের রূপ-লাবণ্যে মাঝে মাঝেই অহঙ্কারী হয়ে ওঠে।

নুলার রহস্য আর মনের ভাষা—একটি কঠিন আবরণে আবৃত থাকে। কোনও একদিন-কোনও একজনের প্রতি তা প্রকাশ পায়। বড় গোপনে অতি সন্তর্পণে। নুলারিমের শেষ পর্যায় বড় নাটকীয়। নাটকের শেষ অঙ্কে পৌছুবার আগে মধ্যকালীন কতগুলি দৃশ্যের অবতারণা করা যেতে পারে। মধ্য অঙ্কের দৃশ্যও কম নাটকীয় নয়। রোয়াতি ফাউঙপুই-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। রডডেনড্রনের ডালে ডালে অগ্নিশিখা। মিজো কুমারীরা এই অগ্নিশিখার মতই উজ্জ্বল। কখনও বা তপ্ত। মধ্যমণি নুলাকে কেন্দ্র করে রাত গভীর হয়। পাহাড়ে স্তব্ধতা নেমে আসে। মায়ানমার পাহাড় অতিক্রম করে স্নিগ্ধ হাওয়া ক্রমে নীল পাহাড়ের বনানীকে কাঁপিয়ে দেয়। নুলার ডানে-বাঁয়ে, আশ-পাশে প্রেম প্রার্থীরা কোনও এক সময় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে। নুলা তখন আরও বেশি রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। পিলসুজের নিষ্প্রভ আলোয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ঘুমন্ত প্রণয় প্রার্থীদের। তারপর এক সময় এক কোণে নিজেও অলস কন্যার মত শুয়ে পড়ে। বেচাল যে কিছু ঘটে না, তা নয়। প্রণয় প্রার্থী কেউ না কেউ ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে থাকে। শোবার আগে নুলা পিলসুজ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। নিষ্প্রদীপ ঘরে তখন গভীর অন্ধকার। ঘুমন্ত প্রণয় প্রার্থীর নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

কোনও কোনও চঞ্চল প্রার্থীর লোভী হাত অনেক সময় নুলার গায়ে পড়ে। নুলা সরে গিয়ে বুঝিয়ে দেয় এখনও সময় হয়নি। সন্ধ্যার পর কোনও যুবককে আর জউল-বুকে পাওয়া যায় না। তারা প্রেমের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। একই বাড়িতে পাঁচ-সাতজন গিয়ে হাজির হয়। একই ঘরে দু-তিন বোন নুলারিম করে। নুলারিমের মাধ্যমেই প্রেমের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মিজোদের বিশ্বাস, নিয়মিত প্রেম নিবেদনের মধ্য দিয়েই নুলার চিত্ত জয় করা সম্ভব। এক নুলায় ব্যর্থ হলে অপর নুলায় যেতে কোনও বাধা নেই। যেতেও হয়। সুখের জন্য নুলার সাহচর্য দরকার। কিন্তু নুলাদের রহস্য মনের এত গভীরে থাকে যে, কোনও ছেলে চট করে সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। তাই মনের আশা ও ভালবাসা নিয়ে পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

নুলার মনের কলি একদিন পাপড়ি মেলে। সে পাপড়ি কার কোলে খসে পড়বে, তা কোনও প্রণয়-প্রার্থী আন্দাজ করতে পারে না। দীর্ঘ দিবস আর দীর্ঘ যামিনী পার করে অতি সংগোপনে ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের মানুষের কাছে ধরা দেয় নুলা। ধরা দেওয়ার নাম নুলারিম।

পাতায় তামাক জড়িয়ে ছোট বয়স থেকেই ধূমপানে মিজোরা অভ্যস্ত। নুলারিমের সময় নুলা পাতায় তামাক জড়িয়ে উপস্থিত সকলকেই দেয়। এটা প্রতিদিনের ঘটনা—অতিথি আপ্যায়নের প্রাত্যহিক রীতি। কিন্তু একটা সময় নুলাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একটা সময় আসে তখন সে আর চুপ করে থাকতে পারে না। তারও হৃদয় উদগ্রীব হয়। রক্তে মিলনের কামনা জাগে। সবার অলক্ষ্যে নিজের একটি চুল দিয়ে পাতাটি বেঁধে কোনও একদিন মনের মানুষের হাতে তুলে দেয়। জয়ী প্রণয়ী-প্রার্থী এক অনির্বচনীয় আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। উল্লাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় নুলারিম। বসন্তের কোনও একদিনে প্রতীক্ষিত দুটি হৃদয় এক হয়ে যায়।

লালবেন রোয়াতি বলে, আজকাল জুমেও নুলারিম হয়। সেই নুলারিমের সাক্ষী থাকে নুলার কোনও এক পুয়ারুক বা বান্ধবী। প্রাক্ বিবাহ সম্ভোগ মিজো সমাজ-বিরুদ্ধ নয়। যুবক-যুবতীর গোপন অভিসারে বাধা নেই। তবে সব দেশের সব মেয়ের মতই মিজো মেয়েরা সম্ভোগের বিষয়ে বেশ সতর্কই থাকে।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব দেশেই প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটে। মিজোরা তার ব্যতিক্রম নয়। ঠিক একশো দু'বছর আগে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মিজো বা তদানীন্তন লুসাইদের জীবনে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। লুসাই অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি ইংরেজদের দখলে চলে এসেছিল। ধীরে ধীরে সাইলো প্রথার অবসান ঘটেছিল।

ইংরেজদের অধিকার আসার পূর্বে মিজোরা অদৃশ্য নিয়ামকে বিশ্বাসী ছিল। তাদের ভাষায় সেই শক্তির নাম প্যাথিয়ান—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা। গির্জার আধিপত্য স্থাপনের আগে লুসাইদের ধারণা ছিল, কিছু অদৃশ্য অশুভ শক্তি নানাভাবে তাদের ক্ষতি করে। পূজা-পার্বণ আর আহুতির মধ্য দিয়ে তারা প্রতিনিয়ত সেই অশুভ শক্তির তুষ্টি সাধন করত। এ সবই এখন ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে এ সব রীতিনীতি আর ধ্যান-ধারণা বিদায় নিয়েছে।

মিজোরা আজ খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত। গির্জার অনুশাসনে মিজোদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন পরিচালিত হয়। কিন্তু প্যাথিয়ান হারিয়ে যায়নি। ধর্মান্তরিত হবার পরও তারা ঈশ্বরকে প্যাথিয়ান হিসাবে উচ্চারণ করে। প্যাথিয়ান যেমন আছে তেমনি রয়েছে নুলারিম। প্রাক্ বিবাহ সম্ভোগ আগেও ছিল- এখনও আছে। উন্মাদনায় উৎসাহিত প্রাক্ বিবাহ যৌন মিলনের ফলে অনেক অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। আবেগ তাড়িত হয়ে অনেক নুলাই আত্মসমর্পণ করে বসে। মাত্র চল্লিশ টাকা 'সত্তন মান্' বা জরিমানা দিয়ে পিতৃত্বের দায়ভার থেকে মুক্তি নেবার সংখ্যা খুব কম নয়। অনেক সময় উল্টোটিও ঘটে থাকে। নিরপরাধ যুবককে কলঙ্কের ভাগ নিতে হয়। অবশ্য সামাজিক প্রথানুযায়ী চল্লিশ টাকা 'সত্তন মান্' দিয়ে দায়িত্ব থেকে সে মুক্তি পেতে পারে। নুলারিমের ব্যবহারিক দিকের কিছু পরিবর্তন ঘটলেও ছেলে-মেয়ের প্রেম প্রেম খেলার ট্রাডিশন সমানভাবে চলে আসছে। রাতে প্রণয় প্রার্থীর প্রত্যাশায় ঘরের দরজা খুলে নুলার বসে থাকার রীতি এখনও প্রচলিত থাকলেও টং ঘরের প্রেম এখন অনেক বেশি জনপ্রিয়।

নিজেদের মন মত সঙ্গিনী বেছে নেওয়ার দায়িত্ব নিজেরাই পালন করে। তাতে অনেক সময় ভুল-ভ্রান্তি হয় সত্য, কিন্তু মিজো মুক্ত সামাজিক ব্যবস্থায় তা সংশোধনের অনেক পথ আছে। রোয়াতি মনে করিয়ে দেয়, প্রাক-বিবাহ যৌনসঙ্গ মেয়ের জেন বা অনুমতি ছাড়া কখনই হয় না। কেউ যদি জুলুম করে, তাহলে সম্পর্ক সেখানেই শেষ হয়ে যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবু কেন এত অবৈধ সন্তান? রোয়াতি স্পষ্ট জবাব দিতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ম আর বয়সের ধর্ম বলে একটা কথা আছে। কোনও দেশের মানুষই এ থেকে মুক্ত নয়।

রোয়াতির স্পষ্ট জবাব, ধর্ষণ মিজো সমাজে বিরল। তোমরা যাকে 'রেড লাইট এরিয়া' বা বারাঙ্গনা বসতি বল, মিজোরামে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা আর মেলামেশার মধ্য দিয়ে এই দু-টি বড় সামাজিক অপরাধকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

শুধু নুলারিম নিয়েই মিজো সমাজ নয়। যেটা সবচেয়ে বড় কথা, সেটি হল, প্রতিটি মিজো এক স্ত্রী-তে বিশ্বাসী। তেমনি দু-একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া মিজো রমণী বহুগামিনী হয় না। বিশেষ করে গির্জার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর সমাজের বন্ধন এইভাবেই গড়ে উঠেছে।

অস্বীকার করে লাভ নেই, শতবর্ষ আগে মিজো সমাজ কিছুটা ঢিলেঢালা ছিল। সমাজে মোড়লদের আধিপত্য কিছুটা অত্যাচারে পর্যবসিত হয়েছিল।

মোড়লদের ক্ষেত্রে এক বিবাহ সীমিত ছিল না। স্ত্রী হিসাবে তারা একজনকেই স্বীকৃতি দিত। কিন্তু পর-বণিতার প্রতি তাদের বদান্যতার অভাব ছিল না। উপপত্নী বা হেমেই গ্রামের মোড়লদের আভিজাত্যের অঙ্গ ছিল। কিন্তু কোনওক্রমেই হেমেইকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হত না।

সেকালে আর একটি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কোনও মোড়ল—তার যে কোনও উপপত্নীকে বিবাহ করতে পারত। অবশ্য সেক্ষেত্রে তাকেও সমাজ নির্ধারিত কনেপণ দিতে হত। কনেপণ দেবার পরই সেই বিবাহিত উপপত্নী খুমপুই বা মূল শয্যায় শয়নের অধিকার অর্জন করতে পারত। অনেকে এটাকে বহু বিবাহ ভাবতেন—কিন্তু আদৌ এটা বহু বিবাহের পর্যায়ে পড়ে না।

বর্তমানে গির্জার অনুশাসনে একাধিক স্ত্রী নিষিদ্ধ। অনুশাসন উপেক্ষা করে কেউ যদি একাধিক বিবাহ করে, তাহলে তার গির্জার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়।

মিজো সমাজে বৈধ ও অবৈধ সন্তানের সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি আলাদা। তাদের মর্যাদা সমাজ থেকেই নির্ধারিত করে দেওয়া আছে। রোয়াতি বলে, সমাজ সিদ্ধ দম্পতির সন্তানকে বলা হয় চুংফুই-পা। আর উপপত্নীর গর্ভে যে সন্তানের জন্ম হয়, তাকে বলা হয় হেমেই-ফা। প্রাক্‌বিবাহ যৌন সঙ্গমের ফলে যে সন্তানের জন্ম হয়, মিজোরা তাকে বলে সওন। আর যে সন্তানের পিতৃ পরিচয় মেলে না—মিজো সমাজে তারা ফালাক

নামে পরিচিত। কোনও অবৈধ সন্তানকে কোনও পরিবার যদি দত্তক হিসাবে গ্রহণ করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে বৈধ হয়ে যায়। মিজো সমাজে অনেক বিধি-নিষেধ আছে। বিধি-নিষেধের পরিপন্থী কেউ কোনও কাজ করলে, সমাজের কাছে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

সমগোত্রে যেমন নুলারিম চলে না, তেমনি সমগোত্রে মিজোদের বিবাহ হয় না। সমগোত্রের সকলকেই তারা ভাই-বোন মনে করে। কেউ কোথাও গেলে আগে নিজের গোত্র পরিচয় দিয়ে—সেই গোত্রের পরিবারের সন্ধান করে। সমগোত্রীয় অচেনা হলেও তার সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করা হয়। নিজের গোত্র ছাড়া অন্য যে কোনও গোত্রে ছেলের সঙ্গে মেয়েরা খোলাখুলি মেশে। অবশ্য মোড়লদের, যাকে মিজো ভাষায় বলা হয় 'সাইলো'—সমগোত্রে বিবাহে বাধা নেই। সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্যই এই বিধি-নিষেধ তাদের উপর আরোপিত হয় না। কারণ, সাইলো পরিবারের সঙ্গে সাধারণ মিজোদের বৈবাহিক সম্পর্ক হয় না। মোড়লী প্রথার অবসান ঘটলেও—সাইলো পরিবারের আভিজাত্য এখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। শুধু গোত্র নয়, আজকাল প্রেম করার আগে বর্তমানে গির্জার সদস্য পদও বিচার্য বিষয়। সে কোন্ গির্জার সদস্য প্রেমের আগে ছেলে ও মেয়েকে তা প্রকাশ করতে হয়। এটা অনুশাসন।

রোয়াতি মনে করিয়ে দেয়, গির্জার আধিপত্য স্থাপনের পর, সমাজের অনেক উন্নতি হয়েছে। শিক্ষিতের হার বেড়ে গেছে। সমাজ জীবনের শৃঙ্খলার পুনর্বিন্যাস ঘটেছে। কিন্তু কনেপণের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। সব বিবাহে কনেপণ অপরিহার্য।

বিয়ের বিষয়ে মিজো সমাজে অনেক বিধি-নিষেধ আছে। জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই-বোনে বিবাহ হয় না। কিন্তু মামাতো ভাই-বোনের বিবাহে বাধা নেই।

নারীর দেহ ও মনের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক বরকেই পণ দিতে হয়। সব উপজাতির মধ্যে কনেপণ প্রথা প্রচলিত।

মিজো সমাজে ইংরেজ শাসনের আগেও এ প্রথা ছিল—এখনও আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এ প্রথা বিলোপের সম্ভাবনা নেই। রোয়াতি বলে, কনেপণের মধ্যে একটা যুক্তি আছে। কিন্তু বরপণের প্রথা শুধু অযৌক্তিক নয়, অমানবিকও বটে। দেহ ও মনের মত বিশাল সম্পত্তিও পাবে—আবার নগদ টাকা-কড়ি, সোনা-দানা দিতে হবে। কেন?

এই 'কেন'র উত্তর অ-উপজাতি সমাজে নেই। এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা আমাদের সমাজে কেউ করে না। আইনের ধ্বজা তুলে দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করে।

ইংরেজ পূর্ব আমলে কনেপণ মেটাতে হ'ত দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে। এখন নগদ টাকার প্রচলন হয়েছে। কনেপণের টাকা পিতৃ-মাতৃ কুলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। অবশ্য সব গোত্রের মধ্যে এই প্রথার প্রচলন নেই। কনেপণ শুধু পিতৃকুলের প্রাপ্য।

নিজের ইচ্ছে মত কেউ কনেপণ দাবি করতে পারে না। কনেপণ বা হানাম্ দান-এর পরিমাণ জেলা পর্ষদ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। একটা ছাপানো পুস্তিকায়

নির্ধারিত কনেপণের সন্ধান মেলে। জেলা পর্ষদ নির্ধারণ করে দিয়ে কনেপণকে প্রায় আইনানুগ করেছে। রোয়াতি আবার বিয়ের কথায় ফিরে আসেন। মিজো সামাজিক রীতি অনুযায়ী যেমন কোনও পিতা তার সৎ মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না—তেমনি কোনও ছেলে তার সৎ মায়ের পাণিগ্রহণ করতে পারে না। মিজোরা বিশ্বাস করে, এই ধরনের ঘটনা ঘটলে, শুধু পরিবার নয়, গোটা গ্রামের অমঙ্গল হয়। অনাবৃষ্টির আশঙ্কায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। যদি কোনও কারণে, এই রীতি-বিরুদ্ধ ঘটনা ঘটে, তাহলে গ্রামের মানুষ সেই দম্পতির মাথায় জল ঢেলে বরুণ দেবতাকে সন্তুষ্ট করে।

রোয়াতি আগেই বলে দিয়েছিলেন, মিজোরা উচ্চাকাঙক্ষী। ওরা উপরে উঠতে চায়। কখনই নীচে নামতে চায় না। এই উচ্চাকাঙক্ষা মিজোদের জীবনের সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। অবশ্য এতে গির্জার অবদান অনস্বীকার্য। প্রতিটি গ্রামেই গির্জা আছে। গির্জার অনুশাসন গত একশ' বছরের মধ্যে মিজো সমাজে যুগান্তরকারী পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। এই পরিবর্তন গির্জার কর্তা ব্যক্তিরা চাপিয়ে দেয়নি। মিজোদের সমাজব্যবস্থা, যুগসঞ্চিত সংস্কার আর ঐতিহ্যের সঙ্গে গির্জার অনুশাসন মিশিয়ে দিয়েছে। তাই মিজোরামে গড়ে উঠেছে—মিজো ও গির্জার মিশ্র সংস্কৃতি। পাশ্চাত্য প্রভাব মিজোদের জীবনের নিয়ামক হয়ে উঠলেও—তাদের নিজস্ব সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে একেবারে অপ্রচলিত করে দেয়নি।

গির্জা থেকে প্রকাশিত হয়েছে মিজো ভাষায় বাইবেল। পাশ্চাত্য সঙ্গীত এসে মিশেছে মিজো সুরের সঙ্গে। অথবা মিজো সঙ্গীত শ্রুতি মধুর হয়ে উঠেছে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাবে।

মিজোরা সঙ্গীত প্রিয়। গিটার আর মাউথ অর্গান মিজোদের সর্বক্ষণের সঙ্গী। পাহাড়ের কোলে, ঝর্ণার পাশে ও অরণ্যের অভ্যন্তরে গিটার আর মাউথ অর্গানের সুর একটা মায়াজালের সৃষ্টি করে।

পোশাকেও পরিবর্তন এসেছে। পাশ্চাত্য পোশাক শিক্ষিত সমাজকে প্রভাবিত করলেও—নিজস্ব পোশাক এখনও বিদায় নেয়নি। প্যান্ট-শার্ট আর স্কার্টের প্রচলন বেশি হলেও—পুয়ান তার পবিত্রতা হারায়নি। মিজোদের পুয়ান আর ত্রিপুরার উপজাতিদের পাছড়ার মধ্যে বিশেষ কোনও তফাত নেই। মিজো রমণীদের অলঙ্কারে অনীহা। একশ' বছর আগে যে সব অলঙ্কার ছিল—আজ তাও বিদায় নিয়েছে। সঙ্গীতের মত বিভিন্ন উৎসব মিজো সমাজ জীবনের অঙ্গ। মিজোদের চের-ও নৃত্যের সুনাম মিজোরামের ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করেছে। এই নাচকে অনেকে বলেন ব্যাম্বু ড্যান্স।

উচ্চাকাঙক্ষী মিজোদের জীবনের মূল ছন্দ সঙ্গীতের মতই মধুর। প্রতিটি মিজো নিজের মুক্ত মনকে প্রেম ও মাধুর্যের মন্দির করে রাখে।

১৬

মিতৈ

মণিপুরের শেষ সতী কে জানেন?

সতী! —মণিপুরে সতী প্রথার প্রচলন ছিল নাকি?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভাগ্যবন্ত সিং 'কেবুল লাম্‌জো'র আরও একটু গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেন। তাঁর দৃষ্টি একটি পলাতক থামিন বা নাচুনে হরিণের দিকে। সামান্য একটু দেখা দিয়েই নিমেষের মধ্যেই গভীর অরণ্যে লুকিয়ে যায়।

ভাগ্যবন্ত সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে পায়ে পায়ে এগোতে থাকেন। দ্বিতীয়বারও আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঘন নল খাগড়া সরিয়ে বনের গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেন। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান অষ্টম আশ্চর্যের মধ্যে যেমন একটি, তেমনি 'কেবুল লাম্‌জো' প্রকৃতির পাটিগণিতে একক এবং অনন্য ভাসমান জাতীয় উদ্যান। সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথাও ভাসমান জাতীয় উদ্যান নেই। এই উদ্যানের বাসিন্দা থামিন বা নাচুনে হরিণ —জন্মস্থান থেকে এখন প্রায় বিলুপ্ত।

থামিনের দেখা মেলে না। সংখ্যায় তারা এতই অল্প যে, ভাগ্যবন্তের মত দু-একজন ভাগ্যবান ছাড়া তাদের কেউ দেখতে পায় না।

কেবুল লাম্‌জো থেকে বেরিয়ে আসেন ভাগ্যবন্ত। বন-বিভাগের বাংলোর বারান্দায় বসে লোক্‌তাক্ আর কেবুল লাম্‌জোর কাহিনী শুরু করেন। এই দুটি প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাগৈতিহাসিক মণিপুরের জীবন্ত সাক্ষী। কেবুল লাম্‌জোর ইতিহাস মোটামুটি আমার জানা। থামিনদের প্রায় বিলোপের বেদনার কথাও অনেকবার শুনেছি। তাই ভাগ্যবন্তকে আবার সতীর কথা মনে করিয়ে দিই।

পরম বৈষ্ণব ভাগ্যবন্ত। নাক থেকে কপাল পর্যন্ত চন্দনের তিলক। ন্যাড়া মাথায় ইঞ্চি চারেক লম্বা শিখা। মণিপুর নৃত্য-নিকেতনের শিক্ষক। গল্পের মধ্যেই মাঝে মাঝে বলে ওঠেন 'হরেকৃষ্ণ'।

মণিপুরের মিতৈরা হিন্দু। আরও ভাল করে বলতে হলে বলতে হয় তারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব। অষ্টম শতাব্দী থেকেই মণিপুরি মিতৈরা হিন্দু। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রাজানুকুল্যে বৈষ্ণব ধর্মই হয়ে ওঠে রাজধর্ম। বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শিব-শাক্ত এমন কি তন্ত্রেরও বিকাশ ঘটে। এই প্রসঙ্গে বলা ভাল, মণিপুরে ইসলামও আছে। তাদের বলা হয় পাঙ্গান মিতৈ। ইংরেজদের আমলে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার হয়েছে। মণিপুরের পাহাড়ী এলাকার নাগা-কুকিদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচলিত। অনুসন্ধানে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেরও সন্ধান মিলতে পারে।

ভাষাগতভাবে মণিপুরে মিতৈরা মঙ্গোলীয় ঘরানার কুকি-চীন সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু কার্যত তারা হিন্দু। ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার ও আচরণে পুরোপুরি হিন্দু। ভাগ্যবন্ত বলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের জন্মস্থান নবদ্বীপে যখন বৈষ্ণবীয় আচার অবক্ষয়ের পথে তখন মণিপুরের রাজ-বদান্যতায় বৈষ্ণবীয় প্রভাব মিতৈদের মনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে।

মণিপুরে বার বার বৈষ্ণব ধর্মের সংস্কার সাধন হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় পাশাপাশি অসমীয়া বৈষ্ণব ধারা সমানভাবে চলেছে। অসমীয়া বৈষ্ণব প্রভাবেই বিখ্যাত মণিপুরি নৃত্যের বিস্তার ঘটেছে।

ভাগ্যবন্ত নিজে পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস একবার আরম্ভ করলে আর থামতে চান না। থামবেনই বা কী করে? মণিপুরিদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বৈষ্ণবীয় ধারায় পরিচালিত। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, সঙ্গীত ও নৃত্যে বৈষ্ণব শৈলী বড় বেশি স্পষ্ট। রাধা আর কৃষ্ণ মণিপুরি মিতৈদের জীবনের অঙ্গ।

ইম্ফল আর ব্রহ্মপুত্রের জল বুকে নিয়ে লোক্‌তাক্ তরঙ্গায়িত। লোক্‌তাকের জলে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন তিনি। সম্ভবত লোক্‌তাকের জলে তাঁর ইষ্ট দেবতার ছবি ভেসে ওঠে। আপন মনেই বলে ওঠেন—হরেকৃষ্ণ। ভাগ্যবন্ত লোক্‌তাকের জলে রাধা-কৃষ্ণের ছায়া দেখেন। আর মাঝে মাঝে বলে ওঠেন 'হরেকৃষ্ণ।' ভাগ্যবন্তকে সতীর প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিই।

ভাগ্যবন্ত বলেন, আগে মিতৈ সমাজের বিবাহ ও জীবনচর্চার কথা শুনুন। বিয়ে না হলে সতী হবে কেমন করে?

ভাগ্যবন্তের মুখে সর্বদাই একটা প্রসন্ন হাসি লেগে আছে। বড় পরিশীলিত রুচি আর অত্যন্ত মার্জিত ব্যবহার। ধীরে ধীরে কথা বলেন। তাঁর বাক্য বিন্যাসে মাঝে মাঝে বাক্যহারা হয়ে যেতে হয়।

ভাগ্যবন্ত বলেন, মণিপুরের ইতিহাস আর সংস্কৃতি বড় বেশি ব্যাপক। মহাভারতের যুগ থেকে যে ইতিহাস মণিপুরে গড়ে উঠেছে-সে ইতিহাসের সবটা আমাদের জানা নেই। সুতরাং মিতৈদের জীবনচর্চার মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাক। ভাগ্যবন্ত ঠিকই

বলেছেন, আগে সমাজ, তারপর সতী। আগে বিবাহ তারপর সতীদাহ।

যুগে যুগে মণিপুরি সমাজের পরিবর্তন ঘটেছে। জীবনচর্চার ধরন পাল্টেছে। খ্রিষ্ট পূর্ব সময়ে মণিপুরের সাতটি গোষ্ঠী বা তাদের ভাষায় 'সেলেস' একত্র হয়ে একটি মিতৈ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দে মণিপুরিদের সঙ্গে মায়ানমারিদের যোগাযোগ ছিল। পরস্পরের গ্রহণের মধ্যে মিতৈ সর্বগ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

ভাগ্যবন্তকে বাধা দিতে ইচ্ছে করে না। মিতৈদের জীবনচর্চার পশ্চাৎপট তৈরির জন্যেই তিনি ইতিহাসের প্রথম সোপানে দাঁড়িয়েছেন।

ভাগ্যবন্ত বলেন, ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকে শ্রেণী বিভাগ আর শ্রেণী বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও মিতৈ সম্প্রদায়ের সংহতি কখনও বিপন্ন হয়নি। দেশের অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মত নানা শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীতে মিতৈরা বিভক্ত। বিভক্তির মধ্যেও মিতৈরা ভক্তির ঐক্য খুঁজে পায়।

ভাগ্যবন্ত বলেন, মিতৈদের মধ্যে পন্না প্রথা বলে একটি প্রথা প্রচলিত। শান ভাষা থেকে শব্দটির উৎপত্তি। শব্দের উৎপত্তি আর ব্যুৎপত্তি নিয়ে আমার বিপত্তি বেড়ে যায়। অপেক্ষা করি কখন তিনি মিতৈদের জীবনচর্চায় ফিরে আসবেন। ভাগ্যবন্ত বলেন, শ্রেণী বিভাগ ও সামাজিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও মিতৈদের সামাজিক সংহতিতে কখনই ফাটল ধরেনি। রাজা শুধু রাজ্যের শিরোমণি নন— তিনি মিতৈদের অধ্যাত্ম জীবনেরও চূড়ামণি। রাজাকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে মিতৈ সমাজ পরিচালিত হয়ে এসেছে। ভাঙাগড়া, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সব কিছুই ঘটেছে রাজাকে কেন্দ্র করে।

পন্না প্রথা মিতৈদের সামাজিক রক্ষা কবচ। মিতৈরা এই পন্না প্রথাকে আজও অত্যন্ত সোহাগে বুকে জড়িয়ে রাখে। আগেই বলেছেন—হিন্দুত্বের সব ধারা ও উপধারা, সংস্কার ও উপ-সংস্কার মণিপুরি মিতৈরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। পন্না প্রথা চারটি ভাগে বিভক্ত। ঠিক হিন্দুদের চতুর্বর্ণের মত। পুরাণ থেকে অনেক সংস্কৃত শব্দ মিতৈ ভাষায় মিশে গেছে। যেমন গোত্র-জাতি-সপিণ্ড ও সপ্তপদী।

চতুর্বর্ণ ছাড়াও মণিপুরে আরও অনেক গোষ্ঠী আছে। পুঙ্গনৈ, পন্না, খুতমৈ, থাঙ্গুল, কেউ ও লয়। থাঙ্গুলরা রাজার মালঞ্চের মালাকার আর কেউ-রা রাজবাড়ির ধান ভানে। অর্থাৎ বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন কাজ নির্দিষ্ট। 'জল অচল' প্রথাও মণিপুরের মিতৈদের মধ্যে প্রচলিত। কথাটি বলেই ভাগ্যবন্ত কেবুল লাম্‌জোর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে কথাটি বলার জন্য সম্ভবত লজ্জা পান।

সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, ১৯৪৯ সাল থেকে মণিপুরে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

ভাগ্যবন্ত ভাল-মন্দের বিচারের মধ্যে যেতে চান না। যা কোনও এক সময় প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে—তার মধ্যে মিতৈদের জীবনচর্চা সীমাবদ্ধ রাখেন। উচ্চ বর্ণের মিতৈরা নিম্ন বর্ণের হাতে জল খায় না। উচ্চ বর্ণকে জল দেবার অধিকার তাদের নেই। উচ্চ বর্ণের

মিতৈরা শ্রী শ্রী গোবিন্দজীর সেবা করে এবং গোবিন্দজীকে জলদানের অধিকার একমাত্র তাদেরই। তাদের এক ধাপ নিম্ন বর্ণেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সেবালয়ে বা লহসঙ্-এ রান্নার কাজ করে। জল অচল প্রথা বর্তমানে বিদায় না নিলেও—অবশ্যই অন্তরালে চলে গেছে।

বিনয়ী ভাগ্যবন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। মিষ্টি করে হেসে বলেন, বুঝতে পারছি, আপনি জানতে চাইছেন সতী প্রথা। সে কথা অবশ্যই বলব। তবে তার আগে দাস প্রথার কথা শুনুন।

দাস?

হ্যাঁ। আপনারা ইংরাজিতে যাকে বলেন স্লেভারি। স্লেভারি বা দাস প্রথা রাজার আমল পর্যন্ত ছিল। তবে ক্রীতদাস নয়। মণিপুরের দাস প্রথার মধ্যে কোনও কলঙ্ক ছিল না। এটি একটি প্রতিষ্ঠান। মিতৈ ভাষায়, এই প্রতিষ্ঠানকে বলা হয়-'ফুঙানাই'। 'নাই' মানে ভৃত্য। রাজা ও সমাজ শিরোমণিরা এই প্রথার পৃষ্ঠপোষক। মনে রাখতে হবে, মিতৈ সামাজিক অনুশাসন অনুসারে, তিন ছেলেকে রাজসেবায় নিয়োজিত করতে হত। প্রথম সন্তান কাজ পায় সৈন্য বাহিনীতে। প্রতি চল্লিশ দিনের মধ্যে দশ দিন দ্বিতীয় জনের পক্ষে রাজসেবা বাধ্যতামূলক। আর তৃতীয় জন রাজার খাস নোকর হিসাবে নিযুক্ত থাকত। বরপণ হিসাবে রাজকন্যার শ্বশুরালয়ে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত। প্রয়োজনে সমাজ শিরোমণিদের প্রশংসনীয় কাজের পুরস্কার স্বরূপ রাজা 'নাই'-দের দান করতেন।

ভাগ্যবন্ত বলেন, 'ফুঙা-নাই' প্রথার সঙ্গে অর্থনীতির একটা সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক পরিবারের আয় সুনিশ্চিত করার জন্যই এই প্রথা।

মণিপুর রাজের সঙ্গে মায়ানমার শাসকের যুদ্ধ প্রায়ই লেগে থাকত। মায়ানমারি বন্দিনীদের রানি ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের গৃহিণীর পরিচারিকা করে রাখা হত। অনেক অভিজাত পরিবার বন্দিনীর পাণিগ্রহণও করতেন। বিজয়ী রাজকুমার ও সেনাপতিরা বন্দিনীকে উপপত্নী করে রাখত। উপপত্নীদের মধ্যে কেউ কেউ রাজমাতার মর্যাদা কোনও এক সময় লাভ করেছে। মণিপুরের ইতিহাসে এমন অনেক নজির খুঁজে পাওয়া যায়। ভাগ্যবন্ত বলেন, রাজা ও অভিজাত ব্যক্তিরা বহু বিবাহে বিশ্বাসী হলেও সাধারণ মানুষ এক স্ত্রীতে সুখী। তারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে নৈতিক ও আত্মিক মর্যাদা দেয়। মিতৈ সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম, অর্থনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমান দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক পারস্পরিক নৈতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে সামাজিক আদালত অপরাধীর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা আদায় করে। সেই জরিমানার টাকা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হয়।

মিতৈদের বিবাহও হিন্দু ধারায় অনুষ্ঠিত হয়। হোম থেকে সপ্তপদী পর্যন্ত হিন্দু বিধি পালিত হয়। একাধিক ও সমগোত্রে বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অবশ্য রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য নয়। মিতৈরা গোত্রকে বলে 'ইয়েক'। ভিন্ন পিতার ঔরসে এক মাতৃগর্ভে জন্ম ছেলে-মেয়ের বিবাহ মিতৈ সামাজিক অনুশাসন বিরুদ্ধ। মিতৈ

সমাজ অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করে না। কিন্তু যদি কোনও ব্রাহ্মণ ছেলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কন্যাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে তাহলে মিতৈ সমাজ বাধা দেয় না, এবং সেই দম্পতিকে সামাজিক স্বীকৃতিও দিয়ে থাকে। মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনে বিবাহকেও মিতৈ সমাজ অসিদ্ধ মনে করে না। গারোদের মধ্যে যেমন কোনও বিপত্নীক মৃত স্ত্রীর ছোট বোনকে বিবাহ করতে পারে-মিতৈ সমাজে সে অনুশাসন অনুপস্থিত। একমাত্র সপিণ্ড ও সমগোত্র বিরোধী বিবাহই মিতৈ সমাজে সিদ্ধ। যদি কেউ প্রথা বিরোধী বিবাহ করে, তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। অনেক সময় প্রেম, প্রথা মানে না—ভালবাসার কাছে সমাজবিধি হার মানে। সে ক্ষেত্রে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হবার আগেই প্রণয়-প্রণয়ী অজ্ঞাতবাসে চলে যায়। ভাগ্যবন্ত সিং কেবুল লাম্‌জোর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। সম্ভবত থামিনের নাচ দেখতে চান তিনি। সত্য হলেও বিশ্বাস করতে চান না যে, মণিপুরের বিখ্যাত নাচুনে হরিণ এখন বিলুপ্তির পথে।

নিরাশ হয়ে আপন মনেই বলে ওঠেন—হরেকৃষ্ণ।

মণিপুরি সমাজে আট রকম বিবাহের প্রথা প্রচলিত। হিন্দু ধারায়ও এ সব বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত বিবাহের পদ্ধতি মণিপুরিরা মেনে চলে। আট প্রকার বিবাহ হল, ব্রাহ্মণ্য, দৈব, অর্ঘ, প্রাজাপাত্য, গান্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস ও পেইসাকা। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য মতে বিবাহের প্রচলন বেশি এবং মিতৈ সমাজ এই বিবাহের পক্ষপাতী। ভাগ্যবন্ত বলেন, বিয়ের বিবরণ শুনে কী করবেন। চোখ বুঁজে নিজেদের বিয়ের কথা ভাবুন। যে সব আচার-আচরণ এমনকি স্ত্রী আচার পর্যন্ত আপনাদের বিবাহের সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন। যৌতুক? যৌতুক প্রথা মিতৈ সমাজে প্রচলিত। তবে তার জন্য পীড়াপীড়ি নেই। জোর-জবরদস্তি বড় একটা করতে দেখা যায় না।

ভাগ্যবন্ত বলেন, আপনাদের সমাজে প্রচলিত দ্বিরাগমন মণিপুরি মিতৈ সমাজে দেখতে পারেন। জামাই আদর সর্বত্রই সমান।

সমাজ বিধিতে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকলেও তার সংখ্যা খুবই কম. কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত মিতৈ সমাজ বিচ্ছেদের বিষয়টি গুরুত্ব দেয় না। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কেউ যদি দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকে—সে ক্ষেত্রে সামাজিক আদালত বিচ্ছেদের দাবি মেনে নেয়। স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারও বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ হতে পারে। কিন্তু সন্তানহীনতা কোনও ক্রমেই বিচ্ছেদের কারণ নয়। কারণ দত্তক প্রথা মিতৈ সমাজে স্বীকৃত। যেহেতু পারস্পরিক নৈতিক বিশ্বাসের উপর মিতৈ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত তাই পরস্পরের প্রতি তারা দায়বদ্ধ এবং নির্দিষ্ট কতগুলি দায়িত্ব পালনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

বিচ্ছেদের পর যদি কোনও সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে—সামাজিক আদালতে তারও বিচার হয়। তিন বছর বয়স পর্যন্ত সন্তান মায়ের হেফাজতে থাকে। তারপর পিতার দখলে চলে যায়।

মনে মনে ভাবি, বিচ্ছেদের পর ভাগ্যবন্ত নিশ্চয়ই সতীদাহের কথা তুলবেন। কিন্তু তিনি সেদিকে গেলেন না। ভাগ্যবন্ত বলেন, মণিপুর-সমাজ পিতৃধারায় পরিচালিত। সংসার ও

সমাজ-জীবন পরিচালনার দায়-দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত। পুরুষ প্রভাবিত সমাজ হলেও-কন্যা সন্তানের প্রতি তাদের বিমাতৃসুলভ ব্যবহার আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। পুত্র ও কন্যাকে সমান আদরেই তারা মানুষ করে। বিভিন্ন বিশেষণে মেয়েরা ভূষিত। কালের প্রভাবে অনেক শব্দ অপ্রচলিত হয়ে গেলেও-লাইছাবি ও নিঙ্গোল এখনও বহুল প্রচলিত। অবিবাহিত কন্যাদের বলা হয়-নিঙ্গোল। সংস্কৃত ভাষার কন্যা মণিপুরি ভাষায় নিঙ্গোল।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনেক উপজাতির মধ্যে কুমারী-নিলয়-এর ব্যবস্থা আছে। সেখানে মেয়েরা জীবনের শিক্ষা নেয়—মনে জৈবিক ধারণার জন্ম হয়।

মিতৈ সমাজেও নিঙ্গলফল বা মোরালের প্রচলন আছে। নিঙ্গলফলের অধিনায়ককে বলা হয়, নিঙ্গল-লক্‌পা। অরুণাচলের রাশেং-এ পুরুষের প্রবেশের অধিকার আছে। কিন্তু নিঙ্গলফল একমাত্র কন্যাদের জন্যেই।

ভাগ্যবন্ত বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক শ্রেণীর ইংরেজ প্রচার করেছিল যে, মণিপুরিরা টাট্টু কেনার জন্য বউ বিক্রি করে। দেনা থেকে মুক্তি পেতে খাতকের হাতে কন্যা তুলে দেয়—এটা অপপ্রচার। এ ধরনের ঘটনার কোনও প্রামাণ্য নজির নেই। মণিপুরি মেয়েরা আত্ম-নির্ভর। তারা জন্মগত শিল্পী। বয়ন শিল্পে তারা সিদ্ধহস্ত। ব্যবসার দায়-দায়িত্ব মেয়েরাই বহন করে। বাজারে দোকান চালায় তারা। গান ও নাচ সঙ্গে নিয়েই নিঙ্গোল জন্মগ্রহণ করে। মণিপুরি নৃত্য আজ পৃথিবী বিখ্যাত। আর এই বিখ্যাত নৃত্যকে মুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় করে তোলে মণিপুরি নিঙ্গোল।

নিম্ন বর্ণের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা থাকলেও অভিজাত পরিবারে পর্দা অচল। বর্তমানে অবশ্য নিম্নবর্গ থেকেও পর্দা বিদায় নিতে শুরু করেছে। ফালেকের (মেয়েদের পোশাক) স্থান পাচ্ছে ফ্রক বা ম্যাক্সি অথবা সালোয়ার কামিজ। যুগ সঞ্চিত ট্রাডিশন ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে বলে, ভাগ্যবন্ত দুঃখিত। বৈষ্ণবীয় ধারারও অবক্ষয় শুরু হয়েছে। হয়ত এমন একটা সময় আসবে, যখন গোবিন্দজীর মন্দিরে কাঁসর-ঘন্টা বাজা বন্ধ হয়ে যাবে।

ভাগ্যবন্তের অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। আপন মনেই বলে ওঠেন—হরেকৃষ্ণ।

মণিপুরি শিল্প ও সংস্কৃতিতে মাইবিস বা মেয়েদের অবদান অতুলনীয়। মণিপুরি মেয়েরা একটা বড় রাজনৈতিক শক্তি। আজকাল দেশের যেখানে সেখানে সত্যাগ্রহ হয়। কিন্তু মণিপুরি মেয়েরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রাজার বিরুদ্ধে সপ্তদশ শতাব্দীতে সত্যাগ্রহ করেছিল।

রাজার হাতি ধরার বিরুদ্ধে মাইবিসেরা একবার গর্জে উঠেছিল। তাদের প্রচণ্ড চাপের কাছে মহাশক্তিধর রাজাকেও পিছু হটতে হয়েছিল। ফসল কাটার সময় হাতি ধরা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। আজও সেই সত্যাগ্রহের ধারা মণিপুরে বজায় আছে। বর্তমানে ড্রাগ ও অ্যালকোহলে মণিপুরের সমাজ জীবন বিপর্যস্ত। ঘরে ঘরে এইচ আই ভি পজেটিভ। নতুন প্রজন্ম প্রায় পঙ্গুর পথে। এরই বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে মাইবিসেরা।

ভাগ্যবন্ত বলেন, ছেলে খারাপ হতে পারে-মা কখনওই খারাপ নয়-এই প্রবাদে মণিপুরিরা বিশ্বাসী। মণিপুরিরা মাতৃভক্ত। অপপ্রচার থাকলেও-মেয়েদের যৌন নৈতিকতায় কোনও কলঙ্ক নেই। মাইবিসেরা সরল অথচ স্পষ্টবক্তা। মিতৈ সমাজে তারা যতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে, হিন্দু প্রভাবিত অন্য সমাজের মেয়েরা ততখানি স্বাধীনতা পায় না।

বর্তমান প্রজন্মের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতে শুরু করেছে। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলিত হবার পর থেকেই মণিপুরিরা নিরামিষাশী। মদের প্রতি তাদের প্রচণ্ড অনীহা এবং মাছ-মাংস-ডিম তাদের কাছে অচ্ছুত। কিন্তু সব পালটে যাচ্ছে। মদ এখন ঘরে ঘরে। নব প্রজন্মের অধিকাংশই মদ্যপ। প্রায় ভেঙে পড়া সমাজকে পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব নিয়েছে মাইবিসেরা। মণিপুরি মেয়েরাই সম্ভবত সমাজের অবক্ষয় রোধ করতে সক্ষম।

ভাগ্যবন্ত বলেন, মণিপুরে সতী প্রথার প্রচলন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই প্রথার বিলোপ করে দেন মণিপুরের মহা পরাক্রমশালী রাজা গরিব নিয়াস। সেদিন বড় দুঃখ পেয়েছিলেন রাজা গরিব নিয়াস— বলেই থামেন ভাগ্যবন্ত। আপন মনেই বলে ওঠেন—হরেকৃষ্ণ।

দুঃখ পেয়েছিলেন কেন?

তিনি জ্বলন্ত চিতায় দু-টি বধূকে হাত পা বেঁধে ছুঁড়ে দেওয়া স্বচক্ষে দেখেছিলেন। প্রজ্জ্বলিত চিতার বহ্নিমান শিখায় দুটি যুবতী বধূর দেহ ছাই হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যবন্ত বলেন, জানেন, কে এই বধূ দু'টি। উৎকণ্ঠা নিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

ভাগ্যবন্ত ধীরে ধীরে বলেন, রাজার পুত্রবধূ। মণিপুরের শেষ সতী।

১৭

কাইপেঙ্

টংঘরের গান আর শেষ হল না। মাঝ পথেই সুর কেটে গেল। রাজলক্ষ্মী বেঁকে বসেছে। ধনরাজ কাইপেঙ্ কে সে বিয়ে করবে না। অথচ ধনরাজের প্রায় দু'বছর জামাইখাটা হয়ে গেছে। আর বছর খানেক খাটতে পারলেই টংঘরের গান শেষ হত।

কাইপেঙ্দের কথা বলতে গিয়ে একটি ছোট গল্পের অবতারণা করলেন দেবলীনা। দেবলীনা দেববর্মণ। একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা, উপজাতিদের মধ্যে দীর্ঘদিন কাজ করছেন। নিজে বিবাহসূত্রে ত্রিপুরি। স্বামী মনোময় একজন উঁচু দরের আর্টিস্ট। বংশ পরম্পরায় এই বিদ্যার অধিকারী। ত্রিপুরার মানিক্য রাজপরিবারের সঙ্গে লতায় পাতায় সম্পর্ক।

— আপনার কথাগুলো ঠিক যেন একটি ছোট গল্পের অবতরণিকা।

দেবলীনা মৃদু হাসেন। প্রায় পঞ্চাশের কাছে বয়স। নিঃসন্তান। বলেন, মানুষের জীবনটাই তো গল্প। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত একটা মানুষের জীবনে কত রকমের গল্প থাকে।

— শুধু জন্ম মৃত্যু কেন? বিয়েটা বুঝি গল্পের মধ্যে পড়ে না?

সিপাহীশালার লেকের ধারে বসে কাইপেঙ্দের জীবনবেদ শোনাচ্ছিলেন দেবলীনা। ত্রিপুরার সিপাহীজালা একটি মুক্তাঙ্গন চিড়িয়াখানা। লেকটি একটি পক্ষীরালয়। নানা রংয়ের নানা প্রজাতির পাখি। পর্যটকেরা পাখির ছবি তোলেন। লেকে তাদের নৌকা বিহার চলে।

দেবলীনা বলেন, আমি তো বিয়ে দিয়েই কাইপেঙ্দের গল্প শুরু করেছি। আপনি একটু ধৈর্য ধরে শুনুন—

বছর দুই আগে রাইবার বা ঘটকের মাধ্যমে বিয়ে পাকা হ'য়েছিল। সানকুসতে (সামাজিক সভা) সকলের সামনে ধনরাজের বাবা লাঙ্গি (মদ), ফাটুই (পান) ও কোয়াই (কাঁচা সুপারি) দিয়ে রাজলক্ষ্মীকে আশীর্বাদ করেছিল। চামারি (জামাই) হিসাবে ধনরাজকে সকলের পছন্দও হ'য়েছিল।

দেবলীনা বলেন, চামারির প্রায় সব গুণই ধনরাজের আছে। অর্ধবিচরণশীল অরণ্যচারী ত্রিপুরার খেপঙ্ বা কাইপেঙ্রা বরের গুণাগুণ ভাল করে যাচাই না করে কন্যার বিয়ে ঠিক করে না। বরের চরিত্র, ভদ্রতা ও সর্বোপরি কর্মক্ষমতা কাইপেঙ্ বরের প্রথম বিচার্য বিষয়। ধনরাজ প্রাথমিক পরীক্ষায় উতরে গিয়েছিল।

হঠাৎ এক ঝাঁক বালি হাঁস লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সন্তরণরত অনেকগুলি হাঁস একসঙ্গে প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে ওঠে। তাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেবলীনা বলেন, জামাইখাটা প্রথা তো ত্রিপুরার অনেক উপজাতির মধ্যেই প্রচলিত। বিবাহ সম্পন্ন হবার আগে জামাইকে অন্তত বছর তিনেক কাড়া (শ্বশুর) ও কারবুকের (শাশুড়ি) কাজ করতে হয়। কাড়া ও কাড়াবুক সন্তুষ্ট হলে জামাই খাটার মেয়াদ কমেও যায়। অনেক সময় দু'বছরের মাথায় বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। বিবাহের মধ্য দিয়েই শেষ হয় টংঘরের গান। শুরু হয় টংঘরের জীবন।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই দেবলীনা উপজাতিদের আপন মানুষ হয়ে উঠেছেন। মেয়েরা তাকে দেবীর মত ভক্তি করে। তিনিও তাদের জীবনের অনেক আনাচ-কানাচের খবর রাখেন। বলেন, রিয়াং, হালম, জামাতিয়া ও নোয়াতিয়াদের মধ্যে একই জামাই খাটা প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কি জানেন?

জবাবের দেবলীনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

দেবলীনা বলেন, মিজোদের সঙ্গে রিয়াংদের কোনও পরিচয় নেই। সম্ভবত কেউ কাউকে চেনে না--জানে না। অথচ উভয়ের জীবন ধারার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। আচার-আচরণ, এমন কি সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যেও মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

দেবলীনা বলেন, শুধু শ্বশুর-শাশুড়ি নয়, বিহিক বা কনেরও একটা মতামত থাকে। অরণ্যচারী - অর্ধবিচরণশীল কাইপেঙ্ সমাজ নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা জোর করে মেয়ের উপর চাপিয়ে দেয় না। জামাইখাটার মধ্য দিয়ে তাকে তার জীবনসঙ্গী সাই বা স্বামীকে চিনে নেবার সুযোগ করে দেয়। সাই ও বিহিক বা স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে জানবার এই পদ্ধতি ত্রিপুরার অনেক উপজাতির মধ্যে প্রচলিত। জামাইখাটার সময় সাই বা বিহিক কেউই সংযমের সীমা লঙঘন করে না। পরস্পর কাছাকাছি থাকে। টংঘরের আশে পাশে একসঙ্গে কাজ করে। ডাণ্ডিতে (চৌকিঘর) পাশাপাশি বসে শস্য পাহারা দেয়। শরীরের শিরায় শিরায় যৌবনের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেও—কেউই কামনার অগুনে আত্মাহুতি দেয় না। এটা সংযমের শিক্ষা, উভয়কে সংযমী করে তোলার এক কঠিন পরীক্ষা। দু'জনকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এই সময়ে দু'জনের মনে পছন্দ অপছন্দের জন্ম

নেয়। পছন্দ যত না চামাড়ির উপর নির্ভরশীল তার চেয়ে অনেক বেশি বিহিকের উপর। চামাড়ি তাই যথাসম্ভব কাড়া, কাড়াবুক আর স্থিরীকৃত বিহিকের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করে।

দেবলীনা থামেন। পশ্চিমের ঢলে পড়া সূর্যের রশ্মি লেকের ঢেউয়ের মাথায় চিক্ চিক্ করে। হরিণদের খাবার দেবার সময় হয়েছে। হাততালি দিলেই প্রায় শ'খানেক হরিণ এসে লোহার জালের ওপাশে দাঁড়াবে। নির্ভয়ে হাত থেকে খাবার খাবে। এখানেই আমি একটি শ্বেত হরিণ দেখেছিলাম। সে একা। তার জীবন সঙ্গিনীর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। বেদনায় আর বিরহে সে একা থাকে। কারও সঙ্গে মেশে না। সর্বদা ছল ছল চোখে একা একা ঘুরে বেড়ায়। দেবলীনা বলেন, এত সব করেও ধনরাজকে জামাইখাটা শেষ না করেই ফিরে যেতে হল। তার সব ভাল--খাটিয়ে, শান্ত ও সুস্থির। কিন্তু একমাত্র দোষ, সে ভাল ডিনগারো নয়।

— ডিনগারো কি?

দেবলীনা বলেন, ধনরাজ বাস্কেট বা বাঁশের ঝুড়ি বানাতে পারে না। কাইপেঙ্ সমাজে তাই সে 'পোনকা'—আমরা যাকে বলি অপদার্থ। এই অপদার্থকে রাজলক্ষ্মী বাতিল ক'রে দিয়েছে।

— বাঁশের ঝুড়ি বানাতে পারে না বলেই, সে অপদার্থ। এটা অন্যায়। একটা মানুষ কি সব কিছু করতে পারে? দেবলীনা বলেন, কিন্তু বাস্কেট বানানো, কাইপেঙ্দের সমাজের নিয়ম। এটা তাদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে জড়িত। সমাজ আর সংস্কৃতির বাইরে তাদের কোনও স্থান নেই। কাইপেঙ্ সমাজ এ ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাধীনতাকে খর্ব করে না। মেয়ের ভাল লাগার বিরুদ্ধে জবরদস্তি হুকুম চালায় না। সামাজিক কাঠামো ও রীতিনীতির মধ্যেই জীবনসঙ্গী বেছে নেবার স্বাধীনতা কাইপেঙ্ কন্যার আছে।

— ধনরাজের কথাও তো আপনাকে ভাবতে হবে।

মানুষটির আর কোনও খুঁত নেই। শুধু বাস্কেট বানাতে পারে না বলেই রাজলক্ষ্মী তাকে বাতিল করে দিল! দেবলীনা দেববর্মন মৃদু হেসে বলেন, বাতিল ধনরাজের মন খারাপ হ'তেই পারে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে মুষড়ে পড়ে না। ধাক্কা খেয়ে সে সোজা হয়ে বসে। ভাল ডিনগারো শিল্পী হয়ে ওঠার সাধনায় দিন রাত ব্যস্ত থাকে। জামাইখাটা শেষ হবার আগেই যদি চামাড়িকে চলে আসতে হয়, তাহলে সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী কন্যাপক্ষ লাঙ্গি আর কনেপণ-বরপক্ষকে ফিরিয়ে দেয়। আর এখানেই শেষ হয়ে যায় টংঘরের গানের একটি পর্ব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দেবলীনা বলেন, ডিনগারোর কথা যখন উঠলোই—তখন ব্যাপারটি খুলেই বলা যাক। অরণ্যচারী কাইপেঙ্দের জুম ও ঝুড়ি নির্ভর অর্থনীতি। বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি বানানো কাইপেঙ পুরুষদের বাধ্যতামূলক। যারা যত ভাল ঝুড়ি বানাতে পারে, কাইপেঙ্ সমাজে বর হিসাবে তার খাতির তত বেশি। এমন কি জামাইখাটার

সময়সীমাও কমে যায়।

— আর মেয়েদের ক্ষেত্রে?

দেবলীনা বলেন, মেয়েদের কথাও বলব। এ নিয়ম শুধু পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মেয়েদের শিল্প-সৌকর্যেরও বিচার করা হয়। চরিত্রবান ও ভাল ডিনগারো শিল্পী ছেলেদের যেমন সুযোগ্য বরের মর্যাদা দেওয়া হয় — তেমনি তাঁত বোনা, রান্না ও সুন্দর মুখশ্রী কাইপেঙ কন্যাদের আদরণীয় কনে করে তোলে।

ডিনগারো তৈরি করতে না পারলে ছেলেদের কপালে জোটে পোনকা নামক টিকা, .তমনি ভাল নকশা আঁকতে না পারলে মেয়েদের বলা হয় 'পুনকি'। কোন রাইবা বা ঘটক 'পুনকি' কন্যার বিয়ের ঘটকালি করতে চায় না।

সিপাহীজালা অভয়ারণ্যে সন্ধ্যা নামে। পর্যটকেরা ফিরতে শুরু করেছে। আমাদেরও উঠতে হবে—ফিরতে হবে আগরতলায়।

দেবলীনা বলেন, কাইপেঙ সমাজের বিবাহের প্রথম শর্তের কথা থাক। আমরা ফিরে যাই তাদের সমাজের মূলস্তরে। খেপাঙ্ থেকে কাইপেঙ্। এই পথটুকু অতিক্রম করতে তাদের কত বছর লেগেছিল — সে হিসাব কারো জানা নেই। সেমি নোমাডিক কাইপেঙরা ত্রিপুরার অন্যতম আদিম উপজাতি। তারা মঙ্গোলয়েড অথবা কুকি সম্প্রদায়ের একটি শাখা কিনা, এই নিয়ে নৃ-তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ এখনও হয়নি। সরকারি দলিলে কাইপেঙদের ত্রিপুরার হালম সম্প্রদায়ের একটি শাখা হিসাবে দেখানো হয়েছে। আদমসুমারিতে তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়নি। কিন্তু আচার-আচরণে ও নিজস্ব সমাজব্যবস্থায় তারা অবশ্যই স্বতন্ত্র। হালমদের শাখাই হোক আর দলছুট কুকিই হোক, কাইপেঙদের জীবনচর্চা বহু স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল।

কাইপেঙ্রা সংখ্যায় বেশি নয়। খোয়াই আর অমরপুরের পাহাড়ী বনাঞ্চলে তাদের অস্থায়ী আস্তানা। স্থায়ী বাসস্থানে ওরা এখনও পুরোপুরি বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারেনি। অর্ধবিচরণশীলতা আর বেদে জীবন-যাপন কাইপেঙ্দের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাদের নিজস্ব জগতের মধ্যেই তারা ঘোরাফেরা করে। •

লেকের ধার থেকে এবার উঠতেই হয়। হাঁসের দল ডাঙ্গায় উঠতে সুরু করেছে। ইতিমধ্যে অনেকেই নিজ নিজ নীড়ে ফিরে গেছে।

দেবলীনা বলেন, পর্যটক নিবাসে বসে বাকি গল্পটুকু শেষ করা যাক।

— অনেকক্ষণ চা-ও খাওয়া হয়নি।

নূতন নির্মিত পর্যটক নিবাসে চায়ের অর্ডার দিয়ে দেবলীনা বলেন, আগে বিবাহ, তারপর জন্ম এবং সবশেষে মৃত্যু।

— জন্মের আগে বিবাহ কেন? না জন্মালে বিবাহ হবে কেমন করে?

দেবলীনা হেসে বলেন, এ এক অদ্ভুত ফ্যালাসি। আমি যদি বলি, বিবাহ না হলে জন্ম হবে কেমন করে? তর্কের কথা থাক। আমরা আবার কাইপেঙ্দের বিয়ের কথায় ফিরে আসতে পারি। আগেই বলেছি, ঘটকালি করে বিবাহ হলেও-মেয়ের উপর পিতা-মাতা জবরদস্তি মতামত চাপিয়ে দেয় না। মেয়ের পছন্দ - অপছন্দকেই সংসারে সুখী হবার প্রাথমিক শর্ত বলে তারা মনে করে। স্ত্রী স্বাধীনতার এমন প্রমাণ আধুনিক সমাজে বিরল না হলেও অবশ্যই বহুল প্রচলিত নয়।

দেবলীনা থামেন। আড়চোখে আমার মুখের দিকে তাকান। বলেন, উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কনেপণ আবশ্যিক। যৌতুকের কৌতুকে তাদের বিশ্বাস নেই। তবে সব বাবা মায়ের মত তারাও মেয়েকে সাধ্যমত উপহার দেয়।

আপনার তো জানা আছে, সব উপজাতির মধ্যে কনেপণ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হালমেরা যাকে বলে 'জল পুনা', কাইপেঙ্দের ভাষায় তাকেই বলা হয় - জরমান। কনেপণের দাবি খুব একটা বেশি নয়। ত্রিশ-চল্লিশ টাকা দিতে পারলেই কনেপণ শোধ হয়ে যায়। টাকার অঙ্কটি আমাদের চোখে খুবই সামান্য। কিন্তু সেমি-নোমাডিক জুমিয়া কাইপেঙদের কাছে অবশ্যই কঠিন। জুম আর ঝুড়ি নির্ভর অর্থনীতিতে এই ত্রিশ-চল্লিশ টাকাও কাইপেঙ্দের কাছে খুব বড় একটা দায়। এই সামান্য অর্থ সংগ্রহ করতে না পারলে কনেপণ হিসাবে একটা শুকর জোগাড় করে দিতেই হয়।

চায়ে চুমুক দিয়ে দেবলীনা বলেন, ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত হলেও কাইপেঙদের বিয়ের ব্যাপার কম মজার নয়।

জানেন, দেবলীনা বলেন, জামাইখাটার প্রতিশ্রুতি মত কনের বাড়ি বর পৌঁছায় ওঝার নির্ধারিত নির্দিষ্ট তারিখে। আর সেই তারিখ আর সময় নির্ধারণ করা হয় অলৌকিকভাবে। মুরগির হৃদয়ের উষ্ণতা পরীক্ষা করে দিন-ক্ষণ স্থির করা হয়। সেই নির্দষ্ট দিনে জামাইখাটতে বর যায় শ্বশুর গৃহে।

জামাইখাটতে যাওয়া মানেই বিয়ে নয়। আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয় জামাইখাটা শেষ হবার পর। লাঙ্গি উৎসবের পর শুরু হয় জামাইখাটা। জামাইখাটার শেষে বিবাহ। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান।

বিয়ের দিন ভোরে এয়োরা ছড়া থেকে ঘড়া ভর্তি জল আনে। 'সরবিঙ্ আর থাটনলের' পূজার আয়োজন করে। একটি মোরগ আর দুটি চৌবালাঙ্গি (বাঁশের চোঙ্গা ভর্তি ঘরে তৈরি মদ) ওঝাকে দিতে হয়। পূজাশেষে চৌবালাঙ্গি থেকে প্রথমে মদ পরিবেশন করা হয় গ্রাম শিরোমণিকে, কাইপেঙরা যাকে বলে চৌধুরি। একে একে উপস্থিত সকলেই সেই মদ পান করে।

সিপাহীজালাার অরণ্যে রাত গভীর হয়। অরণ্যের পাতায় পাতায় জোনাকি জ্বলে। তারা পাতা থেকে পাতায় উড়ে বেড়ায়। সেই দিকে তাকিয়ে দেবলীনা বলেন,

বিবাহ শেষে মই বেয়ে তরতর করে টংঘরে উঠে যায় নবদম্পতি। অন্ধকার টংঘরে রচিত হয় মিলনের স্বর্গ।

—বিয়ের কথা তো শুনলাম। এবার সংসারের কথা বলুন।

দেবলীনা বলেন, কাইপেঙ পরিবারে সাই আর বিহিকের সমান দায়িত্ব। শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর জা ও ননদ নিয়ে কাইপেঙদের যৌথ পরিবার—নকহঙ্ কাতার। পরিবারে ভাগ-বন্টন তাদের পছন্দ নয়। সুখে দুঃখে পরস্পরকে জড়িয়ে থাকা নকহঙ্ কাতারের উদ্দেশ্য।

—নকহঙ্ কাতার। চমৎকার শব্দটি।

দেবলীনা বলেন, ছোট পরিবারকে ওরা বলে নকহঙ্ কাসু। নকহঙ্ কাসু বা ছোট পরিবার যে নেই তা নয়। প্রতিবেশীর প্রভাবে দু'চারজন বেয়ারা ছেলেমেয়ে স্বার্থপরের মত আলাদা হয়ে যায়। অবশ্য এ সব সামান্য বিষয় নিয়ে অর্ধবিচরণশীল কাইপেঙ সমাজ মাথা ঘামায় না।

ঘরে-বাইরে স্বামী-স্ত্রী সমান দায়িত্ব পালন করে। পুরুষদের সঙ্গে তারা যেমন জুমে যায় তেমনি সংসারের রান্না-বান্নায় পুরুষেরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি পরিবারের কর্তা। শুধু পারিবারিক সৌহার্দ্য বজায় রাখাই তার কাজ নয়, সমস্ত সামাজিক উৎসব - অনুষ্ঠান তার নির্দেশে পরিচালিত হয়।

কাইপেঙ্রা গোত্র সচেতন। স্ব-গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। নিজ গোষ্ঠীর মধ্যেই তারা বৈবাহিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখলেও — অনেক সময় তার ব্যত্যয় ঘটে। প্রতিবেশীর প্রভাবে দু'চারটে গোষ্ঠী বিরোধী বিবাহ কাইপেঙ্ সমাজে ঘটে যায়। গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহে সামাজিক সায় না থাকলেও - কাইপেঙ্ উপজাতি এই নিয়ে সালিশী বা দরবার করে না। এই ঔদার্য কাইপেঙ্ সমাজের বৈশিষ্ট্য।

গোষ্ঠী বহির্ভূত বিবাহে কনেপণ অনুপস্থিত। বরং উল্টো চিত্রটাই চোখে পড়ে। ঠিক যৌতুক না হলেও — মেয়ের সুখ-সাচ্ছন্দের জন্য বাবা কিছু স্থাবর সম্পত্তি উপহার দেয়।

একনাগারে অনেকক্ষণ কথা বলেন দেবলীনা। প্রশ্ন করে তাকে বিরক্ত করি না। দেবলীনা বলেন, জানেন কাইপেঙ্রা এক ভার্যা আর এক ভর্তার বিশ্বাসী। প্রথম স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের ঘটনা কাইপেঙ্ সমাজে অবশ্যই বিরল।

বিবাহ বিচ্ছেদ সব সমাজেই আছে। কাইপেঙ্ সমাজ তার ব্যতিক্রম নয়। তবে বিচ্ছেদের ঘটনা অন্য উপজাতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।

নানা কারণে বিচ্ছেদ ঘটে। বন্ধ্যাত্ব বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ। হালমদের মত বন্ধ্যাত্ব মোচনের জন্য কাইপেঙরাও অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের আশ্রয় নেয়।

প্রাক বিবাহ যৌন মিলন কাইপেঙ্ সমাজ বরদাস্ত করে না। আবার পরস্ত্রীগমন ও পর পুরুষের শয্যাসঙ্গী কাইপেঙ সমাজ আদৌ অনুমোদন করে না।

— বিধবা বিবাহ?

দেবলীনা বলেন, সে কথায় আসছি। হ্যাঁ, অন্যান্য উপজাতিদের মত বিধবা বিবাহ কাইপেঙ সমাজে প্রচলিত। কাইপেঙ ভাষায় বিধবা বিবাহকে বলা হয়, 'সিন্দুর ফুল' বা

'জানজৈন'। বিধবার পছন্দকে কাইপেঙ সমাজ অগ্রাহ্য করে না। গোষ্ঠী বহির্ভূত হলেও সমাজ তার দিকে আঙুল তোলে না। এ বিষয়ে কাইপেঙ্ সমাজ যথেষ্ট উদার।

আমাদের কিছু কিছু সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে কাইপেঙদের সংস্কারের সাদৃশ্য আছে। এই সব সংস্কার তারা আমাদের কাছ থেকে ধার করেনি। বহুযুগ আগে থেকেই তাদের সমাজে প্রচলিত। কাইপেঙ বধূ-কখনই শ্বশুর ও স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। তারা ভাসুর ও মামা শ্বশুরকে ছোঁয়া দূরের কথা, তাদের ছায়া মাড়ায় না। এমন কি তাদের জামা-কাপড়ও ছোঁয় না। স্ত্রীর নাম ধরে ডাকাও তারা পছন্দ করে না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে 'নুঙ' বলে সম্বোধন করে।

কাইপেঙরা সাধারণত সংস্কার ভাঙ্গে না। সংস্কার ভাঙাকে তারা সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য করে। কাইপেঙদের বিশ্বাস, যারা অপরাধী তারাই, আত্মহত্যা করে।

— একমাত্র অপরাধীরাই আত্মহত্যা করে?

দেবলীনা বলে, এই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তারা পাপকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তাই কাইপেঙ্রা জ্ঞানত কোনও পাপ করে না। পাপকে তারা ঘৃণা করে।

দেবলীনা বলেন, অরণ্যচারী হ'লেও কাইপেঙ্রা বড় সৌন্দর্য প্রিয়। কাইপেঙ্ কন্যা রিয়াংদের মত পুষ্পপ্রিয়া। খোঁপায় ফুল তারা গুঁজবেই। গলায় রূপোর আনজুলি, হাতে দস্তার মাসিয়া আর খোঁপায় ফুল কাইপেঙ্ কন্যার আশৈশবের স্বপ্ন।

কাইপেঙ্রা কিছু কিছু খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে। দুধ যেমন তারা পছন্দ করে না — তেমনি গুড় - চিনির প্রতিও তাদের বিশেষ আকর্ষণ নেই। তবে 'খই তুই' অর্থাৎ মধু তাদের অবশ্যই চাই।

কাইপেঙ্ নারী-পুরুষ উভয়েই ধূম ও মদ্যপান করে। মেয়েরা ধূমপান ও পান চিবোতে ভালবাসে। লাঙ্গি বা মদ তারা নিজেরাই তৈরি করে। লাঙ্গি ছাড়া কাইপেঙদের জীবন অচিন্তনীয়। লাঙ্গি দিয়ে বন্ধুত্ব এবং লাঙ্গি দিয়েই সমাজের বন্ধন দৃঢ় করে।

দেবলীনা বলেন, কাইপেঙদের কাহিনী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাকিটুকু শুনতে আপনার ধৈর্য থাকবে তো?

— আমি একটুও অধৈর্য নই।

দেবলীনা বলেন, তা সত্যি। তবে বাকিটুকু শুনুন। ওয়ানছা বা বহিরাগতদের প্রভাব ধীরে ধীরে ত্রিপুরার এই অর্ধবিচরণশীল অরণ্যচারী মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। তাদের সমাজেও মেকি সভ্যতার কালো ছায়া পড়তে শুরু করেছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে টংঘরে সাই আর বিহিকের জীবন কাব্য রচিত হবে না। টংঘরে বসে কোনও বিহিক তার সাইয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করবে না। জামাইখাটা প্রথারও অবসান ঘনিয়ে এসেছে। হয়ত কিছুদিনের মধ্যে এই আরণ্যক সভ্যতা হারিয়ে যাবে। তবুও আপন বিশ্বাসে আমি বিশ্বস্ত থাকতে চাই। দেখতে চাই কাইপেঙ কন্যারা তাঁতে বসে নিজের পানজেন তৈরি করছে। জুমে বসে রিয়ার উপর নকশা তুলছে। ছেলেরা তৈরি করছে ডিনগারো। পরনে পানজেন, বুকে রিয়া আর কাঁধে ডিনগারো ঝুলিয়ে সাই-এর সঙ্গে বিহিক ফিরে আসছে টংঘরে।

১৮

হালম

সন্ধ্যার পর গঙ্গাফড়িং মারবেন না। বিশেষ করে হালম সম্প্রদায়ের সামনে। সতর্ক করে দিয়ে নন্দন রূপিণী বাগানে নেমে এলেন। মেলাঘরে নবনির্মিত যাত্রী নিবাসের বাগান। জানা-অজানা লতা ডালে ডালে জড়িয়ে আছে। আর আছে অসংখ্য গঙ্গাফড়িং। পাতলা পাখা মেলে পাতায় পাতায় উড়ছে। নন্দন রূপিণী বললেন, ত্রিপুরার অন্যতম প্রাচীন উপজাতি হালমদের সংস্কারের সঙ্গে গঙ্গাফড়িং জড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার পর তারা গঙ্গাফড়িং মারে না।

সংস্কারের সঙ্গে গঙ্গাফড়িং কেন? নন্দন রূপিণী ততক্ষণে ছোট একটি টিলা পার হয়ে রুদ্রসাগরের ধারে চলে গেছেন। খেয়ালী শিল্পী। কখনও ছবি আঁকেন কখনওবা আপন মনে গান করেন। জাতি উপজাতির অলিখিত লোকসঙ্গীত সংগ্রহ তাঁর নেশা।

নন্দন রূপিণী সবসময় চরকির মত ঘুরে বেড়ান। আজ যদি তেলিয়ামুড়া থাকেন- কাল তাকে দেখা যাবে বিলোনিয়ায়। এমন এক ভবঘুরের সঙ্গে এসেছি মেলাঘরে। প্রাকৃতিক হ্রদ পাড়ি দিয়ে যাব নীরমহল। হ্রদের মাঝে নির্মিত এক অনুপম প্রাসাদ।

এই বিস্তীর্ণ হ্রদের নাম রুদ্রসাগর। সাগরই বটে। বিশাল এই জলাভূমিতে ত্রিপুরার তদানীন্তন মাণিক্য বীর বিক্রম তৈরি করেছিলেন একটি প্রাসাদ। নাম দিয়েছিলেন নীরমহল। অতুলনীয় নীরমহল। তিনের দশকে যে প্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল নয়ের দশকে তা পরিত্যক্ত এবং ভগ্নপ্রায়। রাজা মহল, রানী মহল, নাচঘর আর দরবার কক্ষ এখন নগ্ন। মেহগনির দরজা জানালা উধাও। শ্বেত মর্মর নির্মিত মেঝে অনাবৃত-এবড়ো থেবড়ো। অথচ এই নীরমহল আর রুদ্রসাগর ত্রিপুরার পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ হতে পারত। রুদ্রসাগর প্রতি ঋতুতে তার রূপ পাল্টায়। বর্ষায় রুদ্র হয়ে উঠলেও শরত, হেমন্ত আর শীতে ধ্যানস্থ হয়ে থাকে।

নন্দন রূপিণীর মনে অতীতের অনেক ছবি ভেসে ওঠে। চোখ বুঁজে তিনি সেই সব ছবি দেখতে থাকেন। সঙ্গমরত দুটো গঙ্গাফড়িং পাতা থেকে পাতায় উড়ে উড়ে বসছে। সন্ধ্যার পর তাদের হত্যা করা নিষিদ্ধ। অন্তত হালমদের সংহিতায় সেই কথা বলে। কিন্তু কেন? পায়ে পায়ে মেলাঘরের যাত্রী নিবাসে ফিরে আসি। রুদ্রসাগরের ঢেউ ভেঙে গোটা কয়েক ডিঙি নীরমহলের দিকে এগিয়ে চলেছে। একসময় তারা একটা ছোট বিন্দুতে পরিণত হয়ে যায়। নন্দন রূপিণী বললেন, আজ আপনাকে হালমদের জীবনবেদ শোনাব।

হালমেরা বিশ্বাস করে, রাতে মানুষ ঘুমাবার পর তার আত্মা গঙ্গাফড়িং হয়ে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এমন কি তারা দূরান্তের অন্য গ্রহে ঘুরে সূর্য ওঠার আগেই আবার সেই দেহে ফিরে আসে। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হালমেরা তাই সন্ধ্যার পর গঙ্গাফড়িং মারে না। আত্মার মৃত্যু নেই এবং কর্মফল অনুযায়ী নবজন্ম হয় — অন্য সমাজের এ রকম বিশ্বাসের সঙ্গে হালমদের বিশ্বাস একাত্ম হয়ে গেছে। তাদের ধারণা, কারও মৃত্যুর পর সেই আত্মা দিন সাতেকের মধ্যেই অন্য দেহে অন্যরূপে ফিরে আসে। আত্মা সম্পর্কে হালমদের বিশ্বাস, কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মা ঘুঘুর আকার ধারণ করে মৃতের বাড়িতে ফিরে আসে।

শুধু ঘুঘু হয়ে ফিরে আসবে কেন? আমার কথায় অবিশ্বাসের সামান্য শ্লেষ তার কাছে ধরা পড়ে। কিন্তু নন্দন রূপিণী রাগ করেন না। ওষ্ঠে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলেন, হালমদের ধারণা ঘুঘু হয়েই ফিরে আসে।

রুদ্রসাগরের সবুজ সীমারেখায় নীরমহলে সন্ধ্যার আঁধার নামতে থাকে। বিশাল প্রাসাদের অস্তিত্ব কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। সূর্যের শেষ সোনালি রেখা রুদ্রসাগরের ঢেউয়ের মাথায় চিক্ চিক্ করছে। ছোট ছোট ডিঙি নৌকার আনাগোনা শেষ হয়নি। নন্দন রূপিণী বলেন, হালমেরা প্রকৃতির মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে। তারা ভাবে উঁচু পাহাড়, টিলা, গভীর খাদ, নদী, ঝর্ণা আর বিশেষ কতগুলি বৃক্ষের মধ্যে ঈশ্বর অবস্থান করে। অরণ্য, জলাভূমি, সবুজ ধানের ক্ষেত আর তাদের বসত বাড়িতেই কোনও কোনও দেবতা অনাদিকাল থেকেই অবস্থান করছে।

হালমেরা উর্বরা শক্তিতে বিশ্বাস রাখে। উর্বরা না হলে অনটনের অবসান হয় না। জুমের উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য তারা যেমন পূজার্চনা করে, তেমনি মানুষকে উর্বরা রাখার জন্যে দুটি পবিত্র পাথর সযত্নে ঘরে রাখে।

— পাথর?

প্রায় ছ'শ' গ্রাম ওজনের দুটি পাথর ধান ভর্তি মাটির হাঁড়িতে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। প্রতিটি হালমের ঘরেই এই পাথর থাকবেই। কিছুটা নারায়ণ শিলার মত।

হালমদের কথা মাঝখান থেকে শুনতে ভাল লাগছিল না. তাদের সমাজ ও সামাজিক অবস্থা জানার ইচ্ছা করছে।

জানি না, নন্দন রূপিণী সে সব কথা বলবেন কিনা।

নিজে বৈষ্ণব। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজ প্রেরণায় রূপিণীরা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ধর্মীয় অবক্ষয় শুরু হলেও অনেকেই বৈষ্ণবোচিত আচার-আচরণ বড় নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। নন্দন রূপিণী শিল্পী। শিল্পীর সহজাত বিনয়ের সঙ্গে বৈষ্ণব বিনয় মিশে আছে। তিনি বলেন, শিলা অর্চনা রিয়াং, কুকি, নোয়াতিয়া ও জামাতিয়াদের মধ্যেও দেখতে পাবেন। অভিষ্ট সাধনে এই সব উপজাতি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য এক।

পাহাড়, বন, নদনদীর মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার, প্রকৃতির প্রতি উপজাতিদের নিঃশর্ত আনুগত্য। কেউ যদি প্রকৃতিতে ঈশ্বর আরোপ করে এবং তাকে 'ধর্ষণের' হাত থেকে রক্ষা করতে চায় তাতে অন্যায় কোথায়? হালমেরা বিংশ শতাব্দীর উচ্চ কারিগরি মনোবৃত্তি নিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় না বরং প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে নিজেরা বাঁচে-প্রকৃতিকে বাঁচায়। নদী, বন আর পাহাড়কে তারা যদি ঈশ্বর ভাবে, তার জন্য কি তাদের অজ্ঞ এবং আদিম বলা চলে? অতি উচ্চাঙ্গের প্রযুক্তির মধ্যেই রয়েছে ধ্বংসের এক আদিম মনোবৃত্তি। আগেই বলেছি, নন্দন রূপিণী স্বভাবে যাযাবর। এক জায়গায় বেশিদিন থাকেন না। ঘুরে ঘুরে উপজাতিদের সংস্কৃতি সন্ধান করেন। তাদের জীবন-চর্চার ভাল মন্দ খুঁজে বেড়ান। এবং চলতে চলতে তার বিচার বিশ্লেষণ করেন। নন্দন রূপিণী আবার হালমদের উর্বরাশক্তি সাধনার কথায় ফিরে আসেন। বলেন, শিলার্চনা ওমোরগ উৎসর্গ করে জমির উৎপাদনে ক্ষমতা বাড়ে কিনা, অথবা রমণীর গর্ভে সন্তান আসে কিনা—তার প্রমাণ খুঁজে বেড়ানো আমার কাজ নয়। নব্য প্রস্তর যুগ থেকে যে বিশ্বাস চলে আসছে তাকে অজ্ঞতার ঘেরাটোপে বন্দী করে রাখার বান্দাও আমি নই। শুধু বন্ধ্যা রমণীকে মাতৃত্ব দানের উদ্দেশ্যে হালমেরা উর্বরা শক্তির সাধনা করে না, জুমের বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও তারা অন্তত সাত-আট রকমের দেবদেবীর পূজা করে। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের দেবদেবীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর যথেষ্ট মিল আছে।

আমরা যে দেবীকে বলি গঙ্গা—হালমেরা তারই আরাধনা করে তুইসা হিসাবে। তারা তুইসা পূজা করে সম্প্রদায়ের শক্তি, সমৃদ্ধি আর জুমের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে। ধানের দেবতাকে বলে 'সারিং আর্থ'। এই দেবীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য দেবী লক্ষ্মীর মিল রয়েছে। ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর অর্চনার সঙ্গে হালমদের দেবদেবীর আরাধনার তফাৎ শুধু নামে—উদ্দেশ্য এক। এই সব দেবদেবীর পূজা হালমেরা কখনও একক আবার কখনও বা সম্প্রদায় হিসাবে করে।

নন্দন রূপিণী নিজে বৈষ্ণব। ভগবদ কথা আরম্ভ করলে সহজে থামতে চান না। বাধ্য হয়ে বলি হালমদের সামাজিক জীবনের গল্প বলুন।

গল্প! বেশ বিরক্ত গলায় বলেন নন্দন রূপিণী।

গল্প কী বলছেন? বলুন হালমদের সমাজ ও জীবন চর্চা। নন্দন রূপিণী জীবন ও জৈবিক সত্যকে গল্প বলে মানতে চান না। যা সত্য তার প্রকাশের শৈলীও সাত্ত্বিক হওয়া চাই। তিনি শুরু করেন হালমদের সামাজিক জীবনের কথা।

ত্রিপুরার হালমদের জীবন মূলত প্রকৃতি নির্ভর। কোনও কাজ করার আগে তারা প্রকৃতির আদেশ প্রার্থনা করে। স্বপ্নের মাধ্যমেই সেই আদেশ তাদের কাছে পৌঁছে যায়। সাধারণত আদেশ পান হালমসা। হালমসা সমাজের সর্বময় কর্তা। অন্য কেউ স্বপ্নাদিষ্ট হলেও হালমসার দরবারে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়। দরবারের নির্দেশে স্বপ্নাদিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ে সামাজিক রীতিনীতি মেনেই করা হয়। অলৌকিক পদ্ধতিতে যদি প্রমাণ হয়, পাহাড়টি জুমের উপযুক্ত তবু তারা স্বপ্নাদেশের জন্য অপেক্ষা করে। জুমের মালিক অলৌকিকভাবে অর্চিত সেই স্থান থেকে কিছু মাটি বাড়ি নিয়ে আসে। রাতে বাড়ির কর্তা পবিত্র পোশাকে সেই মাটির ডেলা বালিশের নীচে রাখে। সেই ঘরে সে একা ঘুমায়। স্বপ্নাদেশের জন্য অপেক্ষা করে। হালমদের জীবন চর্চায় স্বপ্ন বা রেমাঙের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শুধু জুমের ফসলের ভালমন্দ নয়, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তি জীবনেও রেমাঙের প্রভাব বড় বেশি। স্বপ্নের ছবির মধ্যে শুভাশুভের সংকেত মেলে।

বালিশের নীচে এক ডেলা মাটি রেখে স্বপ্নাদেশের জন্য অপেক্ষা করে হালম গৃহস্থ। একদিন স্বপ্ন ছবি হয়ে ওঠে। দুগ্ধদোহন, হাতি ও স্বচ্ছ জল যদি রেমাঙের ছবি হয় তাহলে হালম সমাজে আনন্দের ঘটা পড়ে যায়। এই তিনটি স্বপ্ন হলো তাদের কাছে শুভ লক্ষণ।

কিন্তু সব সময় শুভ ছবি স্বপ্নে ভেসে ওঠে না। যখন বৃষ্টি বা আগুন, গরু ও বিবাহের দৃশ্য এবং নগ্ন রমণীর ছবি রেমাঙের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে তখন হালম সমাজে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। এ সব স্বপ্ন হলো অশুভ। তারা মনে করে, এই সব স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি দৈবদুর্বিপাকের কথা জানিয়ে দেয়। অশুভ শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য হালমেরা নানা উপাচারে--তুইসা (গঙ্গা) সারিং আর্থ (লক্ষ্মী) ও সকুমফাই (ত্রিপুরীদের খুলি) পূজা করে।

নন্দন রূপিণী রুদ্রসাগরের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরেন। রুদ্র সাগরের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চাঁদের কম্পমান প্রতিবিম্ব। ভাসমান ডিঙ্গিতে জোনাকির মতো আলো। নীরমহল অনেকক্ষণ আগেই অন্ধকারে ঢেকে গেছে। চারের দশকে প্রাসাদটি আলোকমালায় সজ্জিত থাকত। নাচঘরে নুপুরের নিক্কণ জলের কলতানে মিলে মিশে এক নতুন সুরের জন্ম হত। সেই সময়কে এই সময় দিয়ে আর ধরা যায় না। মহলের সে কালের ছবি দেখতে হলে হালমদের মতো রেমাঙের উপর নির্ভর করতে হবে। তবুও হয়ত ফিরে আসবে না সে কাল। হয়তো স্বপ্নে দেখা যাবে দরজা জানালাহীন একটি ভূতুরে প্রাসাদ। রুদ্রসাগরের জলের কলধ্বনি হয়ত শোনা যাবে কিন্তু তানপুরার তানে তানে সঙ্গীত শোনা যাবে না।

নন্দন রূপিণী বলেন, হালমদের উর্বরা শক্তি সাধনার কথা আগেই বলেছি। জুমের জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সাধনা ছাড়াও বন্ধ্যা মহিলার বন্ধ্যাত্ব মোচনের জন্য তারা নানা রকম নিয়ম বিধি পালন করে। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে।

বন্ধ্যা নারী হালম সমাজে মূর্তিমতী বেদনা। তার বন্ধ্যাত্ব একদিন তাকে বিচ্ছেদের দিকে ঠেলে দেয়। পিতৃ গৃহে স্থান পেলেও সমাজে মান থাকে না। কার্যত একঘরে হয়ে পড়ে সে। তাই হালম রমণীরা বাল্যকাল থেকেই উর্বরা শক্তির সাধনা করে। 'থেরকান থল রবাল'-এর আয়োজন করে। এই অর্চনার মধ্য দিয়েই হালম নারী মাতৃত্বের প্রার্থনা করে— সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করে।

চারটি প্রতিমা তৈরি করা হয়। তাদের বলা হয়, তুইখুই, তুইয়ার, অরাথাংনাই ও তুইফ্যাজরক। চারটি মোরগ চার প্রতিমার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। কোনও একটি শুভ দিনে স্নানের ঘাটে বন্ধ্যাত্ব মোচনের বন্দনা চলে।

—ব্যাস্। মোরগ উৎসর্গ করলেই বন্ধ্যাত্ব ঘুচে যাবে? নন্দন রূপিণী আমার প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ করেন। বলেন, তাদের বন্ধ্যাত্ব ঘোচে কিনা অথবা মাতৃত্বে মুগ্ধ হয় কিনা, তার কোনও সংখ্যাতত্ত্ব আমার কাছে নেই। আমি শুধু হালমদের চিরাচরিত প্রথার কথা বলছি। যদি এই পূজা উপাচারে তাদের কোনও উপকারই না হবে, তাহলে শত শত বছর ধরে এই প্রথা বেঁচে থাকে কী করে?

সঙ্গত প্রশ্ন। সুতরাং নীরবে শুনে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নন্দন রূপিণী বলেন, প্রতিমাগুলি যদি মুরগিতে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তাদের তুষ্ট করার জন্য হালমেরা আরও ব্যাপক আয়োজন করে। এবার মোরগের বদলে ছাগ বলি দেওয়া হয়।

—তাতেও যদি কিছু না হয়?

নন্দন রূপিণী বলেন, আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। আমি কারও বিশ্বাসের বিশ্লেষণ করছি না, শুধু তাদের বিশ্বাসের কথা আপনাকে শোনাচ্ছি।

নন্দন রূপিণী এবার ফিরে আসেন হালমদের সমাজ জীবনে। তাদের জন্ম মৃত্যু বিয়ের কথা বলতে গিয়ে, অনেকটা পিছিয়ে যান রূপিণী। আজকের হালমের সঙ্গে শতাধিক বছর পূর্বের হালমের যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেন। এখনও হালমেরা অর্ধ-বিচরণশীল। জুমের সন্ধানে তারা তিন চার বছর পর বাসস্থান পরিবর্তন করে। ফলে তাদের গৃহস্থালীর চেহারাটা বিন্যস্ত নয়। বিচরণশীলতার জন্যই তাদের বাড়ি-ঘরের স্থায়িত্ব থাকে না। চলে যাবার মত আটপৌরে জীবনে অভ্যস্ত।

পূবের কোনও এক দেশ থেকে হালমেরা দল বেঁধে কোনও এক কালে ত্রিপুরায় ঢুকেছিল। কেউ কেউ মনে করেন, নব্য প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ে ত্রিপুরার গভীর বনে টিলার উপরে তারা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, আণবিক যুগেও তারা নব্য প্রস্তর যুগের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। এখনও তাদের বাসস্থান গভীর জঙ্গলে ঘেরা টিলার উপরে।

অতীত সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। বার্মার সীমান্ত অতিক্রম করে কোনও এক সময়ে তারা ত্রিপুরায় এসেছিল। জাতে ইন্দো-মঙ্গোলয়েড, ভাষায় চীন-তিব্বতীয়। কেউ কেউ বলে, কুকিদের সঙ্গে হালমদের ভাষাগত মিল আছে। তবে যুগের পরিবর্তনের গতিকে কেউ রোধ করতে পারে না। আর পরিবর্তনের জোয়ারে কম বেশি সকলকেই ভাসতে হয়। হালমরা তার ব্যতিক্রম নয়।

যারা শতবর্ষ আগেও চক্‌মকি পাথর ঘষে আগুন জ্বালাতো, আজ তাদেরই উত্তর প্রজন্মের অনেকের পকেটে সুদৃশ্য গ্যাস লাইটার শোভা পায়।

—এটাই তো স্বাভাবিক। নন্দন রূপিণী বলেন, হালমদের মধ্যে এখনও অনেক কিছু অস্বাভাবিকত্ব আছে। ওয়ানছা (বিদেশী) দের সঙ্গে ক্রমাগত মেশার ফলে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে বহিরাগতের প্রভাব পড়লেও হালমদের আদি সংস্কৃতির ভিত্তির বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। নিজেদের ধ্যান ধারণায় তারা আর কতদিন অবিচল থাকতে পারবে হালমদের কাছে সেই প্রশ্নই এখন বড় আকারে দেখা দিয়েছে।

হালমেরা গভীর অরণ্যে টিলার শিখরে ঘর বানায়। পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন কতগুলি ঘর নিয়ে গড়ে ওঠে হালম গ্রাম। তাদের ভাষায় 'খু'।

যেহেতু তারা অর্ধবিচরণশীল তাই তাদের গৃহস্থালী অগোছালো অবিন্যস্ত। তারা জানে, দু'বছর কি তিন বছর পর, নতুন জুমের সন্ধানে তাদের বেরিয়ে যেতে হবে। জুমের উর্বরা শক্তি কমে এলেই তারা নতুন জুমের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। হয়তো, বছর দশেক ঘুরে আবার ফিরে আসে পুরনো জায়গায়। ততদিনে ঝলসানো জুম আবার ঘন অরণ্যে পরিণত হয়ে যায়।

হালমেরা গ্রামকে বলে 'খু' আর ঘরকে বলে 'ইন'। ত্রিপুরীদের তিপ্রাণকের সঙ্গে হালমের ইনের সাদৃশ্য আছে। নন্দন রূপিণী বলেন, হালমদের দোচালা কুটির। মাটি থেকে পাঁচ ছ'ফুট উঁচু। ঘরের সঙ্গে লাগানো থাকে মই। হালমেরা বলে, লুইলাক।

হঠাৎ নন্দন রূপিণী প্রশ্ন করেন, আপনি ইনবুক জানেন?

—শব্দটি পরিচিত মনে হচ্ছে।

—হবারই কথা। কারণ উত্তর পূর্ব ভারতের উপজাতিদের 'ইনবুক' থাকে। অর্থাৎ ব্যাচিলর ডর্মিটারি।

—মোরাং, মসুপ-রাশেং এর কথা বলছেন? নন্দন রূপিণী বলেন, অরুণাচলে মসুপে মেয়েদের প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু ছেলেরা রাশেং-এ যেতে পারে। হালমদের ইনবুক কিছুটা মুড়িয়াদের ঘটুলের মতো। তবে অত সংহত এবং সুশৃঙ্খল নয়। হালমদের ইনবুকে, ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে থাকে। সেখানে গল্প চলে, নাচ গান হয়। আগুন জ্বালিয়ে গা গরম করে।

মুড়িয়াদের মত এরাও কি এখান থেকে জীবন ও জৈবিক শিক্ষা পায়?

নন্দন রূপিণী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। নীরমহলের ঘাটে ছোট বিন্দুর মত একটি আলো জ্বলছে। আলোটি রুদ্রসাগরের ঢেউ ভেঙে এগিয়ে আসছে। নন্দন রূপিণী বলেন, ঘটুলে আমি যাইনি। রাশেংও আমার দেখা হয়নি। তবে বলা যায়, হালমদের ইনবুক এখন আর খুব সজীব নয়। সত্যি বলতে কি, ইনবুকের অস্তিত্ব এখন বিপন্ন।

— কেন?

টিলার শিখরে 'ইন' বাধলেও হালমেরা এখন আর বিচ্ছিন্ন নয়। ওপার বাংলার ছিন্নমূল মানুষেরা তাদের 'খু'র ধারে কাছে নতুন করে শেকড় গেড়েছে। প্রতিবেশীর প্রভাব হালমেরা নস্যাৎ করতে পারেনি। ইনবুকের অন্তরঙ্গতা আর গোপনীয়তা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ ইনবুক তাদের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

মনে হয় ইনবুকের বিপন্ন অস্তিত্ব নন্দন রূপিণীকে দংশন করছে। নব্য প্রস্তর যুগের একটি ঐতিহ্য একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

নন্দন রূপিণী ইনবুকের কথা থেকে তাড়াতাড়ি সরে আসেন। বলেন, উপজাতি হালমদের অনেক শাখা উপশাখা আছে। রূপিণী সম্প্রদায়ও হালমদের একটি উপশাখা। রাঙখেল, কোলই আর কাইপেঙরাও হালমদের উপশাখা।

নন্দন রূপিণী বলেন, আপনাদের গোত্র যেমন কোনও মুনিঋষির নামে হয়—হালমদের অনেক উপশাখার গোত্র প্রকৃতিজাত। এমনকি অনেক জীবজন্তুর নামে তাদের গোত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের জীবনে প্রকৃতির প্রভাব বেশি।

আর আমাদের জীবন থেকে প্রকৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। নন্দন রূপিণী বাধা দিয়ে বলেন, না, প্রকৃতিকে আমরা এখন শত্রু ভাবতে শুরু করেছি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে যুদ্ধও ঘোষণা করেছি। সভ্যতার অহঙ্কারে আমরা অহঙ্কারী হয়ে উঠেছি। ঘটুল আর ইনবুক আমাদের চোখে যৌন লীলাক্ষেত্র।

— কিন্তু ধারণাটি তো সত্য নয়।

— আমাদের এই সভ্যতার কাছে মিথ্যেটাই সত্য। আর এখন সত্য হচ্ছে অলীক। বন্য বলেই সব কিছু খারাপ নয়। আরণ্যক সভ্যতা আদৌ অন্তঃসার শূন্য নয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন নন্দন রূপিণী। নব্য প্রস্তর যুগ থেকে যে সংস্কৃতির পরম্পরা হালম ও তার বিভিন্ন উপশাখায় চলে আসছিল এখন তা নানা কারণেই হোঁচট খেতে শুরু করেছে। সমাজ ও সংসারে ওয়ানছাদের প্রভাবে অনেক কিছুই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আর যা কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটছে—নন্দন রূপিণীর কাছে তা বাঞ্ছনীয় মনে হয় না। কিন্তু কালের প্রভাব থেকে এখন আর তাদের বিচ্ছিন্ন থাকার উপায় নেই। বিচ্ছিন্ন জীবন উপজাতিদের আরও বিপন্ন করে তুলবে। বলি, আপনাদের মধ্যে পণ প্রথা আছে?

নন্দন রূপিণী বলেন, কনেপণ হালমদের সমাজে বাধ্যতামূলক। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতিরা মেয়েদের সম্পদ ও সম্পত্তি ভাবে। সম্পদের বিনিময়ে কনেপণ প্রথা সেই অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। উপরন্তু হালম কন্যারা কনেপণের মাধ্যমে একটা ঋণ শোধের সুযোগ পায়।

—ঋণ শোধ!

নন্দন রূপিণী বলেন, কনেপণের একটা অংশ মায়ের প্রাপ্য। তারা বিশ্বাস করে, যে মা বুকের দুধ দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বড় করে তুলেছে, তার ঋণ পরিশোধযোগ্য না হলেও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ কনেপণের একটা অংশ তার প্রাপ্য। মাতৃদুগ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এমন নজির উত্তর পূর্ব ভারতের অন্য উপজাতির মধ্যে দেখিনি। মায়ের প্রতি এমন কৃতজ্ঞতাকে কেউ কি কুসংস্কার বলতে পারবেন?

সাধারণত কুড়ি বছর বয়সে হালম ছেলেদের বিবাহ হয়। মেয়েরা ষোল পেরোতে পারে না। নন্দন রূপিণী বলেন, হালম সমাজে একটা উল্টো পুরাণও প্রচলিত। বরের চেয়ে কনের বয়স বেশি হয়। এবং তার সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নয়।

—কেন?

নন্দন রূপিণী বলেন, হালম সমাজে এ প্রথা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে—কারণ আমার জানা নেই।

উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতিদের মধ্যে শ্বশুরের গৃহে শ্রমদান (ব্যাঙপুই চেমজেপ) বিবাহের একটি শর্ত। বরকে এ শর্ত অবশ্যই পালন করতে হয়। তবে এই সময়ে স্বামী স্ত্রীর যৌন মিলনে কোনও বাধা নেই। প্রেমজ বিবাহও হালম সমাজে আছে। প্রেমজ বিবাহকে তাদের ভাষায় বলা হয় — ম্যাঙ ন্যাঙ। বড় খট্‌মট্ শব্দ। নন্দন রূপিণী বলেন, ভালবাসার মতো একটি মিষ্টি শব্দের এমন প্রতিশব্দ কেমন যেন লাগে, তাই না? এই প্রথম নন্দন রূপিণীকে হাসতে দেখলাম। বাইরে কঠিন বর্ম পরে থাকলেও ভিতরে রসবোধের অভাব নেই। আপনার কি ম্যাঙ ন্যাঙের অভিজ্ঞতা আছে নাকি? নন্দন রূপিণী এবার বেশ জোড়ে হেসে ওঠেন। তাঁর হাসির শব্দ রুদ্রসাগরের ঢেউয়ের কলধ্বনিতে মিশে যায়।

একাধিক পত্নী গ্রহণে অবশ্য বাধা নেই। তবে প্রথমা স্ত্রীর প্রাধান্য ও আধিপত্য কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ হয় না। বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ হালম সমাজে প্রচলিত। তবে বিচ্ছেদ চাইলেই বিচ্ছেদ মেলে না। উপযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারলে নারী বা পুরুষ কেউ বিচ্ছেদ পায় না

সন্তানসহ কোনও হালম রমণীর পুনর্বিবাহের সংখ্যা খুবই কম। স্বামী ও সন্তানদের আগলে রাখাই হালম রমণীর পবিত্র কর্তব্য। হালম সমাজে প্রেমে বাধা নেই কিন্তু ধর্ষণে কঠোর শাস্তি পেতেই হয়।

নন্দন রূপিণী বলেন, গত চল্লিশ বছরের মধ্যে হালম সমাজে কোনও ধর্ষণের ঘটনার কথা আমি শুনিনি। মেয়েরা যেমন দেহের পবিত্রতা রক্ষায় সতর্ক তেমনি হালম পুরুষেরা সংযম ও নৈতিকতায় বিশ্বাসী।

হালম উপজাতি মূলত গোত্র বন্দী। সমগোত্রে বিবাহে বাধা নেই। তবে এক রক্তধারায় বিবাহ নিষিদ্ধ এবং অসামাজিক। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য উপজাতির মধ্যে ক্রশ-কাজিন বিবাহের প্রচলন আছে। কিন্তু হালম সমাজে এই বিবাহ অচল।

নন্দন রূপিণী এই পর্যন্ত বলে আবার বাইরের দিকে তাকান। জঙ্গলের অন্ধকারে জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। নীরমহল আর চোখে পড়ে না। দু'একটা নৌকো জলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে রুদ্রসাগর পাড়ি দিচ্ছে।

নন্দন রূপিণী বলেন, পিতৃ ধারায় পরিচালিত হালম সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। অন-উপজাতি প্রতিবেশীর সঙ্গে পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। অর্ধ শতাব্দী আগেও ওয়ানছাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে হালমদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। গোটা সমাজে একটা মিশ্র চেহারা ফুটে উঠলেও আপন বৈশিষ্ট্য ও পরম্পরা থেকে হালমেরা নিজেদের সরিয়ে আনেনি।

হালম রমণীরা স্বয়ম্ভর। গৃহকোণে তারা শুধু রমণী হয়ে থাকে না--অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে কাজ করে। জুম থেকে তাঁত পর্যন্ত পুরুষের তুলনায় তারা পিছিয়ে নেই। হালমদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে হালম কন্যা তাঁত চালাতে জানে না, তাকে কোনও হালম পুরুষ মন দেয় না।

প্রতিটি হালম রমণী তন্তুবায়ী। তারা নিজেদের পোশাক- যেমন নিজেরাই তৈরি করে; তেমনি পুরুষরাও তাদেরই তৈরি পোশাক দিয়ে লজ্জা নিবারণ করে। পুরুষেরা কখনোই তাঁতে হাত দেয় না। এটা তাদের কাছে ট্যাবু। ঠিক একইভাবে বাঁশের তৈরি বাস্কেট বা বাক্স মেয়েরা কখনোই তৈরি করে না। ও কাজটি শুধু পুরুষদের জন্য নির্ধারিত।

সংস্কারে অসম্ভব বিশ্বাসী হালম সমাজ। তারা মনে করে, কোনও পুরুষ যদি তাঁত স্পর্শ করে, তাহলে, তাকে কোনও না কোনও সময় বন্য ভাল্লুকের আক্রমণে প্রাণ দিতে হয়। আর যদি কোনও হালম রমণী বেত বা বাঁশের কাজ করে, তাহলে তার স্বামী চিরদিনের জন্য অকর্মণ্য হয়ে থাকে।

লুঙ্গির মত দেখতে ত্রিপুরীরা যাকে পাছড়া বলে, হালমেরা তাকেই বলে পানজেন। বক্ষবন্ধনী রিয়াকে বলে রাসা। ত্রিপুরীদের মত হালম মেয়েরা রাসার গায়ে আকর্ষণীয় কারুকার্য করে। পরনে কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত পানজেন, হালম রমণী উর্দ্ধাংশে রাসা পরে নিজেকে আরও নয়নসুখকর করে তোলে।

নন্দন রূপিণী বলেন, রিয়া আর রাসা, পাছড়া আর পানজেন ত্রিপুরী আর হালমেরা আর কতদিন ধরে রাখতে পারবে জানি না। কারণ, ব্লাউজ আর 'ব্রা'র অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছে।

নন্দন রূপিণী থামেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। অনেক সাধনার মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তাকেই মন-প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে চান নন্দন রূপিণী। ব্লাউজ আর 'ব্রা' তাঁর কাছে সম্ভবত অবাঞ্ছিত।

আর্থ-সামাজিক জীবনে হালম রমণীর ভূমিকা পুরুষের তুল্যমূল্য হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে মেয়েদের তেমন কোনও প্রাধান্য নেই। গাঁও সভায় কোনও মেয়ে সদস্য হতে

পারে না। গাঁও সভার মোড়লকে বলা হয় চৌধুরী। নুক্র আর পাক্র চৌধুরীর উপদেষ্টা। গাঁও সভায় থাকে দু'জন খান্তাল। তাদের কাজ কিছুটা আমাদের চৌকিদারের মত।

এছাড়াও প্রতি গাঁও সভায় দু'জন আধিকারিক থাকে। হালমদের ভাষায় পুরুষ আধিকারিককে বলা হয় থঙগোল উলেন আর মেয়ে আধিকারিকের নাম নুনগোল উলেন।

হালম রমণীরা অলঙ্কার প্রিয়। তারা দীঘল কেশবতী। পরনে পানজেন, বুকে বক্ষ-বন্ধনী রাসা, খোঁপায় ফুল সালঙ্কৃতা হালম রমণী যেন ত্রিপুরার অরণ্যের স্বর্ণমৃগ।

১৯

রিয়াং

রাজশক্তির বিরুদ্ধে ওরা শেষ বিদ্রোহ করেছিল ১৯৪২ সালে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সংঘটিত আদিম উপজাতি রিয়াংদের সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রতনমণি ঠাকুর। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তিনি কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। তাঁর জাত ও উপাধি নিয়ে বিভিন্ন মহলে মতবিরোধ আছে। তবে অধিকাংশের ধারণা, রতনমণি নিজেও রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ কী ছিল অথবা তিনি আদৌ রাজনীতিক ছিলেন কিনা সে বিষয়েও বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী—ধর্মীয় নেতা। উপজাতি রিয়াংরা তাঁকে ঠাকুর জ্ঞানে মান্য করত। রতনমণি প্রথমে থাকতেন পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনও এক গ্রামে। সেখান থেকে চলে এসেছিলেন অমরপুরের পাহাড়ী অঞ্চলে। সেখানেই গড়ে তুলেছিলেন একটি আশ্রম। ১৯৪২ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলেছে। ব্রিটিশ আশ্রিত ত্রিপুরার স্বাধীন নৃপতি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য তদানীন্তন মিত্রশক্তিকে সমর্থন করেছিলেন। মিত্র বাহিনীর সাহায্যে উপজাতিদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। অনেকের ধারণা, এই সৈন্য সংগ্রহের কাজে বাধা দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী রতনমণি ঠাকুর। রিয়াংরা তাঁকে দেব-জ্ঞানে পূজা করত।

অনেকে মনে করেন, রাজকর্মচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন রতনমণি ঠাকুর। জুমের চাষ ভালো না হওয়ায় উপজাতিদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অভাব অনটনে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কিংবদন্তির কথা থাক। আমরা ফিরে আসি আদিম অরণ্যচারী রিয়াংদের কথায়। ত্রিপুরার ১৯টি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে রিয়াংরাই একমাত্র আদিম বলে চিহ্নিত। দেশের ৭৮টি চিহ্নিত আদিম উপজাতির মধ্যে তারা অন্যতম।

সভ্যতা গড়িয়ে তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলেও—সরকারি নথিপত্রে এখনও রিয়াংরা আদিম—ইংরাজিতে যাকে বলা হয় প্রিমিটিভ।

রিয়াংদের অতীত ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের ধারণা, এই অস্ট্রো-এশীয় ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ প্রায় সাতশ' বছর আগে বর্মার শান রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিল। ত্রিপুরায় তখন প্রথম রত্নমাণিক্যের রাজত্ব।

এ বিষয়েও অনেকের দ্বি-মত আছে। কেউ কেউ মনে করেন—আদিম উপজাতি রিয়াংদের পূর্ব বাসস্থান ছিল লুসাই পাহাড়ে ময়নিথনিং অঞ্চলে। আত্মকলহে জর্জরিত হয়ে তাদের একটি পরাজিত শাখা ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে নেমে এসেছিল। একদল নৃতাত্ত্বিকের মতে রিয়াং সম্প্রদায় মঙ্গোলীয় কুকি এবং কুকি বংশোদ্ভূত।

'পোলং' তাদের নিজস্ব ভাষা। কিন্তু দীর্ঘদিন ত্রিপুরায় বসবাস করার ফলে 'ককবরক' ভাষায় তারা অভ্যস্ত। তাই বলে রিয়াংদের আপন ভাষার অবলুপ্তি ঘটেনি। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ও ভাব বিনিময় পোলং ভাষাতেই হয়।

এখন আর ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে অতীতের ঘোলাজলে অবগাহন করে লাভ নেই। রিয়াংরা আমাদের কাছের মানুষ। আমাদের ঘনিষ্ঠ আপন প্রতিবেশী। বরং তাদের জীবন ও জীবিকার বৈশিষ্ট্যের কথা কিছু বলা যাক। প্রতিটি উপজাতির জীবন ও জীবিকার মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে। কারও চোখে সেই বৈশিষ্ট্য আদিম আবার কারও বা দৃষ্টিতে অকৃত্রিম মুগ্ধকর। তবে অবশ্যই স্বীকার্য, তাদের জীবন বৈচিত্র্যে ভরা।

ত্রিপুরার ১৯টি স্বীকৃত উপজাতির মধ্যে একমাত্র রিয়াংরাই আদিম তালিকাভুক্ত। এদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক কল্যাণের জন্য রাজ্য সরকারের আলাদা দপ্তর আছে।

জনসংখ্যার দিক থেকে উপজাতিদের মধ্যে রিয়াংদের স্থান দ্বিতীয়। ১৯৭১ সালে রিয়াংদের সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার। ১৯৯৬ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে নিশ্চয়ই লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছিয়েছে। রিয়াংদের মধ্যে ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রসার ঘটছে। ১৯৫১ সালে সাক্ষরের সংখ্যা ছিল প্রতি হাজারে বত্রিশ। গত চল্লিশ বছরে শিক্ষার হার প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজাতি প্রতিবেশী আর 'ওয়ানছা'দের সঙ্গে মিশে একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় রিয়াংদের আদি ধ্যান-ধারণার বিশেষ হেরফের ঘটেনি। আপন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল রিয়াং সম্প্রদায় ওয়ানছা বা অন-উপজাতিদের অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পেরেছে। বৃহত্তর পরিমণ্ডলের দিকে পা বাড়ালেও গার্হস্থ্য জীবনকে অসুস্থকর পরিবেশের প্রভাবে কলুষিত হতে দেয়নি। আপাত শান্তিপ্রিয় অথচ অন্যায় বিরোধী এই আদিম উপজাতিদের নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করেই নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা তাদের শিকড়ের সন্ধান করেছেন।

কয়েক দশক আগেও অমরপুর ও বিলোনিয়ায় রিয়াংদের বসতি সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তারা রাজ্যের উত্তরাংশে কৈলাশহর ও পশ্চিমে খোয়াই পর্যন্ত তাদের বসতির বিস্তার

করেছে। সম্ভবত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবিকার অন্বেষণে তারা রাজ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

রিয়াংরা প্রধানত দুটি শাখায় বিভক্ত। মেস্‌কা ও মালছাই। মেস্‌কার মত মালছাই গোষ্ঠীরও অনেক প্রশাখা আছে। শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হলেও রিয়াংদের সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামো একটা সুশৃঙ্খল নিয়মের বৃত্তে ঘুরপাক খায়। রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রধানকে বলা হয় 'রায়'। রাজ প্রদত্ত উপাধি। বংশ-পরম্পরায় কেউ 'রায়' হতে পারে না। রায়-এর একটি পরিচালন সভা থাকে। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখাই রায় পরিচালিত সভার প্রধান কাজ। জুমের বিরোধ থেকে শুরু করে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রায়ের দরবারে বিচার হয়। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রসার ঘটলেও নব্য-প্রস্তর যুগের জুম প্রথার বিলুপ্তি ঘটেনি। ভূমিহীন ও পার্বত্য অঞ্চলে যারা বসবাস করে, এখনও তাদের জীবিকা জুম নির্ভর। পোড়ানো ঝলসানো কৃষি ব্যবস্থা উত্তর-পূর্ব ভারতের কাছে অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হয়ত আরও কয়েক দশক সময় লাগবে।

রিয়াং সমাজে 'অসহযোগিতা' শব্দটির স্থান নেই। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করে ওরা জীবন কাটায়, জীবিকা নির্বাহ করে। অভাবী রিয়াংরা মজুরি দিতে পারে না, তাই শ্রম বিনিময় প্রথা তাদের মধ্যে প্রচলিত। পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতার এই সুন্দর প্রথা আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত থাকলে ছোটো বড় অনেক সমস্যার সমাধান সহজেই হতে পারে।

শ্রম বিনিময় প্রথাকে রিয়াংরা বলে, 'য়্যাগুল খিলি লাইমনি।'

জুম শুধু চাষ নয়, একটি অনুষ্ঠান। রিয়াংদের জীবনের সঙ্গে জুম জড়িয়ে আছে। পাহাড়ে আগুন দেবার আগে তারা অনেক সংস্কার মানে। সম্ভবত তাদের মনে একটা পাপবোধ কাজ করে। জুমে আগুন দেবার আগে তারা মন্ত্র পাঠ করে। এই মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়েই জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ ও গাছ-গাছালির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

যেদিন আগুন জ্বলবে-সেদিন জুমের মালিক ঘর থেকে বেরোয় না। ঘরে বসে দগ্ধ পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ও গাছ-গাছালির আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে। সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে ঘরে বসে জুমের মালিককে বলতে হয়—দাহিত প্রাণ, আমাকে এবং আমার পরিবারের কাউকে অভিশাপ দিও না। আমরা শুধু পূর্বপুরুষের ধারাকে বহাল রাখছি— এই সংস্কার থেকেই ধরে নেওয়া যায়, জুম চাষের জন্য একটা পাপবোধ তাদের মনের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

যেহেতু জুমের সঙ্গে তাদের জীবন অঙ্গাঙ্গী তাই আরও কিছু জুমের কথা বলতে হয়। অধিক ফসলের জন্য তারা অন্তর দিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনা করে। ভাষায় আরাধনার দায়িত্ব নেয় রিয়াং রমণীরা —

জরা মচাং নাইমা, মাপাব মোচাং নাইমা।
আমা লক্ষ্মী নুংছে।
কাইব মোচাং নাইমা চুনাব মচাং নাইমা। আমা লক্ষ্মী নুংছে।

নুংছে খক্‌বা অচুক তনফাই নাই মা,

ফেরাই কিংবা জোত নাইমা,

নুংছে বুই নুখং তো বাংদি

হো হো হো—

অর্থাৎ, মা লক্ষ্মী তুমি কৃপা করে আমার গাইরীং বা টংঘরে অবস্থান কর। আমার ঘরের চালা যদি ভাঙা থাকে, তুমি কৃপা করে সারিয়ে দিয়ে যাও। তুমি অন্যের ঘরে যেও না। আমার ঘরে চিরদিনের জন্য অবস্থান কর।

জুম পাহারা দেবার জন্য জুমের ক্ষেতে তারা টংঘর তৈরি করে। রিয়াংদের জীবনে প্রেম-ভালোবাসার জন্ম হয় জুমে আর টংঘরে। টংঘর থেকেই রিয়াং যুবক-যুবতীদের জীবনের কাব্য শুরু হয়। মনে রং ধরে, বাসনা বাসা বাঁধে। অবশেষে বাসনার বন্ধনে দু'জনে বন্দী হয়ে যায়।

কিন্তু তার আগে? গানে গানে যুবক-যুবতী মন তৈরি করে। গানেই প্রশ্ন আর গানেই জবাব দিয়ে মনের কথা জানান দেয়—

ওয়াখইয়া নাদুং বাই

খুমচইয়া আথং বাই

কাইয়ে বা রেছমই চালাই নাদি।

কানের দুলের সঙ্গে ফুল লাগালে যেমন সৌন্দর্য বাড়ে, জুমের লালফুল কানের দুলের সঙ্গে যেমন মানায়, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তেমনি মানাবে। কোনও এক সময় উত্তর আসবে—'

ওয়ার না ছং অ নক্‌ তাংইয়া খ।

বাখা ওয়ানামা ক্লাইয়া খ।'

বাঁশ দিয়ে কখনও ঘর তৈরি করিনি, আমার মনে কখনও দুশ্চিন্তা জাগেনি। তুমি-আমি যখন মিলেছি তখন আর চিন্তার কি আছে? তারপর একদিন দু-জনে দ্বৈত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে—

'তাবুক সালাইম দে কক্‌ অংখে- বারতীত হয় তংগানু, বার গঙ্গা তুই তংগানু ;

তাবুক সামাদে কক্‌ অংইয়া খে-

বার গঙ্গা ফ তুই বইয়ানু

বারতীত ফ হয় থুইয়ানু।'

আমরা এতদিন যা বলেছি, তা যদি সত্যি না হয়, তাহলে বারতীর্থের আগুন নিভে যাবে, আর বারতীর্থের জল শুকিয়ে যাবে। আর যদি সত্যি হয়, আগুন আর জলের মত আমরা চিরকাল থাকব। তারপর ওরা একদিন পালিয়ে যাবে। দিন কয়েক গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। অভিভাবকেরা খোঁজাখুঁজি করে তাদের ধরে আনবে। সমাজের স্বীকৃতি দিয়ে

নবদম্পতিকে বরণ করে নেবে। শুধু প্রেম করে বিয়ে নয়। যোগাযোগ করেও তাদের মধ্যে বিয়ে হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা দেখেছেন রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে দু-রকম বিবাহের প্রচলন আছে-হলক্‌ছম আর হলক্‌ছয়। হলক্‌ছম হল সমগোত্রে বিবাহ। অন্য গোত্রের বিবাহকে বলা হয় হলক্‌ছয়। উভয় বিবাহই সমাজসিদ্ধ। তবে জ্ঞাতি বা সমগোত্রীয় বিবাহের প্রচলন বেশি।

আমাদের যেমন ঘটক আছে, রিয়াং সম্প্রদায়ের তেমনি 'আন্দ্রা' আছে। এই 'আন্দ্রা'ই বিয়ের প্রস্তাব আনে, আলাপ-আলোচনা করে বিয়ে ঠিক করে। বরপক্ষের লোকেরা আগে মেয়ের বাড়ি যায়। শূকরের মাংস আর মদ দিয়ে তাদের আপ্যায়িত করা হয়। নগর সভ্য মানুষের সঙ্গে পার্বত্য এলাকার আদিম উপজাতি রিয়াংদের বিবাহ অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য আছে। হাজার বছর আগের বিবাহের ধারা একভাবে চলে আসছে কিনা তা এখন আর জানা যায় না। সম্ভবত পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে নতুন কিছু আচার ও অনুষ্ঠান সংযোজিত হয়েছে।

বাঙালির মত ত্রিপুরার উপজাতিরা বর নিয়ে সরাসরি কনের বাড়ি ওঠে না। কনের বাড়ির কাছাকাছি কোনও বাড়িতে রাখে। উপজাতি রিয়াংদের মধ্যেও এই প্রথার প্রচলন রয়েছে। উভয় পক্ষই গান গেয়ে বিয়ের আসরকে জমাট করে তোলে। বরকে নিয়ে বসানো হয় নতুন পাটির উপর। তার সামনে থাকে একটি রিয়া বা বক্ষবন্ধনী আর এক বোতল মদ।

রিয়াং বা বক্ষবন্ধনী শুধু রিয়াং নয়, ত্রিপুরার সব উপজাতির কাছেই পবিত্র। দেবতার কাছেও বক্ষবন্ধনী উৎসর্গ করা হয়। বক্ষবন্ধনীকে তারা পবিত্র বলে মনে করে। ওদেরও পুরোহিত আছে। পুরোহিতকে বলে 'ওঝা'। বিয়ের মন্ত্র আছে। আমাদের পুরোহিতের মত ওঝাই মন্ত্র পাঠ করায়। 'দুটি হৃদয় এক হউক'—সরাসরি এমন মন্ত্র উচ্চারণ না করলেও, ঠিক এই জাতীয় মন্ত্রই তারা উচ্চারণ করে।

আমাদের সমাজে বরণডালা আছে। রিয়াংদের বিয়ের আসরে সেই বরণডালাই দেখা যায়। একটা কুলোয় কিছু তেল, তুলো, লঙ্কা, প্রদীপ, একটি পাথরের টুকরো, চাল, দা সুতো থাকে। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো। বিয়ের কাজে বিপত্নীক ওঝা অচল। এমন কি কোনও ওঝার যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে—সেও ওঝার কাজ করতে পারে না। এটাই রিয়াং সমাজের নিয়ম। রিয়াং বিবাহের মন্ত্রের সঙ্গে আমাদের আক্ষরিক সাদৃশ্য না থাকলেও ভাবের মিল অবশ্যই আছে। এক টুকরো তুলো হাতে নিয়ে ওঝা মন্ত্র উচ্চারণ করে- খুলহাই ফুর্‌লাই তংদি। হঠাৎ মনে হতে পারে, ওঝা যেন বলছে-তদিদং হৃদয়ং মম। ওঝা কিছু তেল ছিটিয়ে দিয়ে নবদম্পতিকে বলে—থক দে মিলিকলাই তংদি— অর্থাৎ তেল যেমন শরীরের সঙ্গে মিশে থাকে— তেমনি তোমাদের দুটি মন পরস্পরের সঙ্গে মিশে থাকুক।

কনের বাবা-মাকে বরকেও বাবা-মা বলে সম্বোধন করতে হয়। তাই মানসিক প্রস্তুতির জন্য বরকে বছর তিনেক জামাই খাটতে হয়। অর্থাৎ তিন বছর তাকে ঘরজামাই থাকতে হয়।

জামাই খাটাকে রিয়াংদের ভাষায় বলা হয় 'চমরইকমি'।

বিয়ের একদিন পর ফুলশয্যা। ফুলশয্যা রচনা করতে হয় বরকে। আর সেই রাতেই স্ত্রীর বুকে বর রিয়া বেঁধে দেয়।

চমরইকমি প্রথায় ফিরে আসা যাক। রিয়াং সমাজে এটি অবশ্যই পালনীয় প্রথা। বরের পিতা 'চমরইকমি'তে রাজি না হলে বিয়ে হয় না। টাকা দিয়েও জামাই খাটা থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। প্রথাটি ভালো কী মন্দ তার বিশদে না গিয়ে বলা যায়, শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রিয়াং যুবকেরা এই প্রথার বিরোধিতা করতে শুরু করেছে।

নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, এই প্রথার জন্যেই রিয়াং সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। অবশ্য এই প্রথার সামাজিক দিকটাও উপেক্ষণীয় নয়। বিধবা বিবাহে রিয়াংরা বেশি উৎসাহ দেখায় না। তবে কেউ যদি বিধবা বিবাহ করে, তাতে আপত্তিও করে না।

রিয়াংরা ধর্মভীরু ও নানা দেবদেবীর পূজায় বিশ্বাসী। জুমের আগে তারা পুজোয় বিশ্বাসী। জুমের আগে তারা পুজো দেয় আবার কারও মৃত্যুর পর স্বস্ত্যয়নও করে। অনেক পূজার মধ্যে গঙ্গা ও গড়িয়া পূজা তাদের জাতীয় অনুষ্ঠান। অবশ্য ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিও গড়িয়া পুজো করে থাকে।

রিয়ার কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। রিয়াংরা মেয়েদের বক্ষবন্ধনীকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। গড়িয়া পূজার অন্যতম উপকরণ রিয়া। লম্বা বাঁশের মাথায় রিয়া ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

হিন্দুদের মত রিয়াংরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। আত্মা অবিনশ্বর, রিয়াং সম্প্রদায়ে এই বিশ্বাস আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। তারা বিশ্বাস করে, পাপ, পুণ্য ও কর্মফলের উপর আত্মার পুনর্জন্ম নির্ভর করে। তাই তারা যথা সম্ভব পাপ কাজ থেকে নিজেদের দূরে রাখে এবং অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় না।

রিয়াংদের একটি শাখা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। যারা বৈষ্ণব তারা মৃতদেহ সমাধি দেয় আর অ-বৈষ্ণব রিয়াংরা পুড়িয়ে ফেলে। আয়ুশেষে মৃত্যু হলে রিয়াংরা তাকে স্বাভাবিক মনে করে। একটি মোরগ হত্যা করে মৃতদেহের সামনে রাখে। মৃত আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলে, যদি কেউ অন্যায়ভাবে মেরে থাকে— তারও যেন মোরগের মত মৃত্যু হয়।

মৃতদেহের পায়ের কাছে দুটি বেতের তৈরি পাখি রাখা হয়। রিয়াংদের ভাষায় পাখি দুটির নাম বিতৈসা। তারা মনে করে, বিতৈসা আত্মাকে পথ দেখিয়ে অমর্ত্যলোকে নিয়ে যায়।

নারী অপহরণ ও ধর্ষণ রিয়াং সমাজ বরদাস্ত করে না। প্রকৃতির সঙ্গে রিয়াংদের সম্পর্ক নিবিড়। প্রাত্যহিক জীবনে অভাব থাকা সত্ত্বেও তাদের মুখের হাসি কখনও মিলিয়ে যায় না।

রিয়াং রমণীরা ফুল ভালোবাসে। খোঁপায় ফুল না গুঁজে রিয়াং রমণীরা বাইরে বেরোয় না। ফুলের অলঙ্কার দিয়ে নিজেদের সাজিয়ে রাখে। রুপোর গহনা তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। স্তনস্পর্শী রুপোর টাকার মালা রিয়াং রমণীদের আবাল্য সাধ।

নৃত্য ও গীত রিয়াং জীবনের অঙ্গ। তাদের নিজস্ব ধারায় গান-নাচ সর্বস্তরের মানুষের কাছে আনন্দদায়ক। ফরাসিতে অনুষ্ঠিত ভারত উৎসবে রিয়াং নৃত্য 'হাজাগিরি' প্রশংসিত হয়েছে। হয়ত একদিন তাদের নৃত্য মণিপুরি নাচের মত বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হবে।

সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। ত্রিপুরার লংতরাই আর আঠারো মুড়া পর্বতশ্রেণী সভ্যতার আলোয় ঝলসে উঠছে। আদিম উপজাতি রিয়াংরা সেই আলোয় নিজেদের নতুন করে চিনতে শিখছে।

তাদের জীবন এখন শুধু জুমে আর টংঘরে আবদ্ধ নেই। সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তারা ছড়িয়ে পড়ছে। রাজনীতির আঙ্গিনায় তাদের পদচারণা শুরু হয়ে গেছে। রিয়াংদের মধ্যে এখন অনেকেই পার্বত্য পরিষদ, বিধানসভা ও লোকসভার সদস্য।

উপজাতির আগে 'আদিম' শব্দটির আর কি কোনও প্রয়োজন আছে?

২০

জামাতিয়া

গ্রামের নাম তৃষাবাড়ি। তেলিয়ামুড়া থেকে তিন কি.মি. উত্তরে পা-চলা পথে সেখানে পৌঁছানো যায়। এই গ্রামটির সঙ্গে ত্রিপুরার অন্যান্য গ্রামের বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। ছোট মাঝারি টিলার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জামাতিয়া উপজাতিদের বাড়ি। রাস্তার ধারে ধারে শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত আগর গাছ। পাহাড়ের ঢালে জুমের চাষ। রাস্তার পাশে শীর্ণকায়া তুইসা (খাল)।

তৃষাবাড়ির জামাতিয়া রমণী সৈকতি জামাতিয়া ওই খালের ধারে যায় না। এই খালের জল স্পর্শ করা এমনকি দর্শনও তার মানা। মানত করেছে— যতদিন না তার ছেলে হবে আর সেই ছেলে তুইসার জল থেকে একটা মাছ ধরে তার মাকে না খাওয়াবে, ততদিন পর্যন্ত তুইসার জল সৈকতি ছোঁবেও না, দেখবেও না।

এ এক অদ্ভুত সংস্কার। এই সংস্কারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে আছে ত্রিপুরার জামাতিয়া উপজাতি সমাজ। শহর ঘেঁষা শিক্ষিত জামাতিয়ারা কিছুটা সংস্কারমুক্ত হলেও কয়েকশ' বছরের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কারের পরম্পরা থেকে গ্রামাঞ্চলের জামাতিয়া সম্প্রদায় মুক্ত নয়। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও জামাতিয়া রমণীরা এই সংস্কারে বিশ্বাসী। আর এই বিশ্বাসেই সৈকতি খালের ধারে যায় না, খালের জল স্পর্শ করে না।

জামাতিয়ারা এই পূজা কে বলে 'তুইসা বাও-উ'। পূজা পরিচালনা করে ওচাই (পুরোহিত)। সাতের বেশি দর্শনার্থী এই পূজায় থাকতে পারে না। পুরোহিত ছাড়া আর সকলকেই পূজার প্রসাদ খেতে হয়।

জামাতিয়া সম্প্রদায়ে মেয়েদের মা না হওয়া পর্যন্ত হীনম্মন্যতায় ভুগতে হয়। সামাজিক আনন্দ অনুষ্ঠানে তাকে কেউ নেমন্তন্ন করে না। ভোরে ঘুম থেকে উঠে সেই রমণীর মুখ

দেখলে সারাদিনের সব কাজ নিষ্ফল হয়। বন্ধ্যাত্ব জামাতিয়া রমণীর জীবনে এক বেদনাদায়ক বিড়ম্বনা।

সৈকতির যখন বিয়ে হয়েছিল তখন সে একবারও ভাবেনি যে তার জীবনে বন্ধ্যাত্বের জ্বালা বইতে হবে। জামাতিয়া সমাজের প্রথা অনুযায়ী তার স্বামী মধুপ্রিয় তাদের বাড়িতে এসেছিল জামাই খাটতে। এই প্রথা অনুযায়ী বরকে বছর দুই শ্বশুরবাড়িতে ঘর করতে হয়। জামাতিয়া ভাষায় (কক্‌বরক) এই প্রথার নাম চমরুই-নাজোমুঙ্‌ বা নাজোমনি। অবশ্য হবু জামাই-এর থাকার আলাদা ব্যবস্থা শ্বশুর ঠাকুরই করে দেন।

অন্য আর এক রকমের বিয়েকে জামাতিয়ারা বলে, 'হানজুগ নাহোমনি বা জানজুগ নাজমুঙ'। এই প্রথা অনুযায়ী বিয়ে সম্পন্ন হয় বরের বাড়ি। কনেকে নিয়ে যেতে হয় বরের ঘরে। কনে পক্ষ এই বিয়েকে বলে জানজুগ রহমুঙ অর্থাৎ কনে বিদায়। বর পক্ষের লোকেরা বলে জানজুগ মহোমানি—কনে গ্রহণ।

অবশ্য বর্তমানে পালা বদলের পালা শুরু হয়েছে। অরণ্যে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শিক্ষিত ও সঙ্গতি সম্পন্নরা যেমন জামাইখাটার বিরুদ্ধে, তেমনি কনে তুলে আনারও পক্ষপাতী নয়। বিয়ের পর বউ নিয়ে পরের দিনই ঘরে ফেরার প্রথাকে তারা জনপ্রিয় করতে চায়।

জামাতিয়া সমাজে বরের চেয়ে কনের বয়স বেশি হয়। ছেলের বয়স বারো হ'লে মেয়ের বয়স অবশ্যই পনেরো হওয়া চাই। শিক্ষিত জামাতিয়ার মধ্যে এর উল্টো চিত্র চোখে পড়ে। চৈত্র, ভাদ্র ও পৌষ মাসে জামাতিয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় না। পূর্বের যোগিনী বাদে যে কোনও সময় বিবাহের দিন ধার্য করা হয়।

জামাতিয়া সমাজে বিয়ে রাতে হয় না। বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় সূর্যোদয়ের দ্বিতীয় প্রহরে। ভোরের আলোয় বর ও কনে পরস্পরের মুখ দেখে।

রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে জামাতিয়াদের বিবাহ নিষিদ্ধ। বড় ভাই-এর বিধবাকে ছোট ভাইয়ের বিয়ে করার অধিকার নেই। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনেক উপজাতির মধ্যে উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত। প্রথা অনুযায়ী তাদের মধ্যে বড় ভাইয়ের বিধবার উত্তরাধিকারী তার ছোট ভাই। কারণ ওই সব উপজাতি সম্প্রদায় মেয়েদের সম্পত্তি বলে মনে করে। তবে বিধবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে হয় না।

জামাতিয়াদের বিয়ের জন্য দুটি প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়। একটিতে বিবাহ ও অপরটিতে হয় চতুর্দশ দেবতার পূজা। বিয়ের সময় বর কনের শুভদৃষ্টি হয় কিন্তু মালা বদল হয় না। অথচ রিয়াংদের মত জামাতিয়া রমণীরাও ফুল খুব ভালবাসে।

জামাতিয়া উপজাতির মধ্যে একটি সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে। নগর সভ্যতায় এই প্রথার প্রচলন থাকলে বিদ্যাসাগরকে বিধবা বিবাহের জন্য আর আন্দোলন করতে হত না।

কোনও বিপত্নীক জামাতিয়া কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারে না। আবার কোনও বিধবাও অবিবাহিত যুবককে বিয়ে করতে পারে না। বিপত্নীককে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে হলে বিধবা পাত্রী খুঁজতে হয়। অপরদিকে কোনও বিধবা যদি নতুন করে ভার্যার মর্যাদা পেতে চায়, তাহলে তাকে বিপত্নীক বরের সন্ধান করতে হবে। যুগসঞ্চিত এই প্রথার বড় একটা হের-ফের হয়নি।

জামাতিয়াদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বড় বেশি। নানা কারণ দেখিয়ে স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ ময়লপঞ্চী বা পঞ্চায়েত-প্রধানের কাছে বিচ্ছেদের আবেদন জানাতে পারে। বিকৃত মস্তিষ্ক, অক্ষম, অত্যাচারী, বন্ধ্যাত্ব ও কলহকে কেন্দ্র করে জামাতিয়াদের মধ্যে বিচ্ছেদের বাজনা বেজে ওঠে।

স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ চাইবে, বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ একশ' পঁচিশ টাকা ময়লপঞ্চীর কাছে তাকে জমা দিতেই হবে। অনেক সময় সন্তানসহ বিচ্ছেদ হয়। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তানের দায়িত্ব নিতে হয় মাকেই।

সন্তানসহ কোনও বিধবা যদি নতুন করে কারও সঙ্গে ঘর বাঁধে তাহলে সেই স্বামী সন্তানকে পিতৃত্ব দান করলেও সম্পত্তির অধিকারী করে না।

সৈকতির সে ঝামেলা নেই। তার স্বামী মধুপ্রিয় তাকে ভালাবাসে। শুধু তাকেই। তবু কখনও হঠাৎ চমকে ওঠে সৈকতির বুকটা। যদি তার বন্ধ্যাত্ব কোনওদিনই না ঘোচে! যদি মধুপ্রিয় তাকে ত্যাগ করে।

তবুও মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখে সৈকতি, সে যদি সত্যি সত্যিই একদিন সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ে। তখন সে যা খেতে চাইবে, মধুপ্রিয় এমনকি পাড়ার লোকজনেরাও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সেই খাবার যোগাড় করবে। কারণ জামাতিয়া সমাজ মনে করে অন্তঃসত্ত্বা রমণীর রসনা তৃপ্ত না হলে সংসারে যে নতুন প্রাণীটির আগমন ঘটবে, সে হবে লোভী।

তবে গর্ভপাত ঘটলেই ফল হবে উল্টো। কোনও অন্তঃসত্ত্বা রমণীর যদি তিনমাসের মধ্যে গর্ভপাত ঘটে, সেই গর্ভপাতকে তারা বলে 'কুচক কলুমন্নি'। মাঝামাঝি সময়ে গর্ভপাত ঘটলে তাকে বলা হয় 'তালসোকোয়া'। এইসব মৃতবৎসা রমণীরা ঘরে-বাইরে আদর পায় না। জামাতিয়া সম্প্রদায় এদের জন্য ভৌতিক ও আধিভৌতিক সংস্কারের সাহায্য নেয়।

আমরা যাকে পঞ্চামৃত বলি, জামাতিয়ারা তাকেই বলে 'ক্যাথু'। স্বাভাবিক প্রসবের জন্য গর্ভের পঞ্চম মাসে জামাতিয়া সমাজে পূজার ব্যবস্থা আছে। ভোরের পূজাকে বলা হয় আইচুক ক্যাথু আর সন্ধ্যায় যে পূজা হয় তার নাম সুরিয় ক্যাথু।

অন্তঃসত্ত্বা জামাতিয়া রমণীদের নানা সংস্কার পালন করতে হয়। ওই সময় তারা মাটিতে অঙ্কিত ঘর বা দাগ কিছুতেই ডিঙ্গোবে না। জামাতিয়ারা তাকে বলে সুলোগতি। তারা বিশ্বাস করে পথে অঙ্কিত দাগ ডিঙ্গোলে প্রসবের সময় বিপদ দেখা দিতে পারে।

এই সময় মৃগেল ও কাঁটা ছাড়া মাছ জামাতিয়া সমাজের অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা খায় না।

জামাতিয়া সমাজ বিশ্বাস করে, গ্রহণের সময় অন্তঃসত্ত্বা রমণী কাজ করলে, তার সন্তান বিকলাঙ্গ হয়। তাই তারা গ্রহণের সময় ঘরে চুপচাপ বসে থাকে।

যমজ ফল নিয়ে আমাদের সমাজেও অনেক সংস্কার আছে। যমজ সন্তান জন্মাবার ভয়ে কোনও জামাতিয়া রমণী যমজ ফল খায় না। অন্তঃসত্ত্বা জামাতিয়া রমণী কখনোই জ্যান্ত মাছ আছড়িয়ে মারে না। তাদের ধারণা, তাদের সন্তান সেই হাড়-গোড় ভাঙ্গা মাছের মত হতে পারে।

বনে বাদারে শিকার জামাতিয়াদের জীবন চর্চার অঙ্গ। কিন্তু স্ত্রীর গর্ভাবস্থাকালে কোনও স্বামী শিকারে যায় না ও প্রাণী হত্যা করে না।

প্রসবের সময় যদি কোনও জটিলতার সৃষ্টি হয়, তখন স্বামীকে কয়েকটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়। ওই সময় স্বামী, স্ত্রীর কানে কানে বলে, ভয় নেই, আমি এক্ষুণি একটা কাঁকড়া ধরে আনছি। স্বামীর এই আশ্বাসে প্রসবের জটিলতা নাকি কেটে যায়। কাঁকড়ার সঙ্গে প্রসবের জটিলতার কি সম্পর্ক সেকথার উত্তর কোনও জামাতিয়া নারী- পুরুষের কাছে পাওয়া যায় না। জামাতিয়া সমাজে এগুলো সংস্কার। জামাতিয়া রমণীরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সংস্কারগুলি পালন করে।

সংস্কারের সঙ্গে জামাতিয়া রমণীর সম্পর্ক বড় নিবিড়। বরং বলা যায় অবিচ্ছেদ্য। প্রসবের পর যদি কোনও মায়ের বুকে পাঁচদিনের মধ্যে দুধ না আসে, তখন তারা বিমুঙ্ পূজার আয়োজন করে। এই বিমুঙ্ পূজায় পুরুষের থাকার কোনও অধিকার নেই।

মেয়েরা সাত রকমের পিঠা তৈরি করে সাতটি দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করে। দেবীরা সাত বোন। জামাতিয়া ভাষায় সেই সাত বোনকে বলা হয় বুকহুক সিনি। অনেকে আবার এই সপ্ত দেবীকে বলে সুকাল। দেবীদের নাম হল—ডাকিনী, যোগিনী, মোগিনী, খাগিনী, লোহারী, প্রহরী ও প্রেমসরী বা প্রেমেশ্বরী।

ওচাই বা পুরোহিত এই পূজা পরিচালনা করে। তার একজন সহকারীও থাকে। এই পূজার পুরোহিত কখনোই পুরুষ হয় না। এরজন্য প্রয়োজন মেয়ে পুরোহিত। পূজা শেষে মেয়ে পুরোহিত তার সহকারিণীকে জিজ্ঞাসা করে, সন্তানের জন্য মায়ের বুকে দুধ এসেছে?

সহকারিণী জবাব দেয়, হ্যাঁ, এসেছে। স্তন পূর্ণ হয়ে গেছে।

মেয়ে পুরোহিত আবার জিজ্ঞাসা করে, সত্যি বলছ?

সহকারিণী জবাব দেয়, হ্যাঁ, সত্যি, সত্যি, সত্যি।

সত্যি কি দুধ আসে? কে জানে! তবে জামাতিয়া রমণীরা এই সংস্কার যুগ পরম্পরায় পালন ক'রে আসছে।

পিতৃতান্ত্রিক জামাতিয়া সমাজ। মেয়েরা পুরুষের আজ্ঞাধীন। তবে সংসারে সে সর্বময়ী কর্ত্রী। ক্রমে সে পুরুষের সহকর্মী, ঘরে অবিসম্বাদিত ঘরণী।

জামাতিয়া রমণী ফুলের মত অলঙ্কারও ভালবাসে। নিজেরাই নিজেদের পোষাক তাঁতে বুনে নেয়। তারা স্ব-শিক্ষিত তন্তুশিল্পী। রৌপ্য অলঙ্কার তাদের আশৈশবের স্বপ্ন। রূপার মুদ্রা দিয়ে তারা রঙ্‌বুতাঙ্‌ বা কণ্ঠহার বানিয়ে নেয়। রূপার কানের দুলকে বলে, বৃন্দাবন ফুল। কানে বৃন্দাবন ফুল, গলায় রঙ্‌বুতাঙ্‌, পরনে স্ব-হস্তে বোনা রেগনা (লুঙ্গি) আর উর্ধাঙ্গ আবৃত করার জন্য চাই রিয়া বা রিছা। ব্যস্‌, এগুলো পেলেই জামাতিয়া কন্যা খুসিতে ডগ্‌মগ্‌।

জামাতিয়াদের মধ্যে কোনও একসময়ে সতী প্রথার প্রচলন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে জামাতিয়া সম্প্রদায়ের এক রমণী শেষ সতী হয়েছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বীরচন্দ্র এক রাজকীয় আদেশে সতী-প্রথা রদ করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সতী হবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। জামাতিয়া কন্যারা সতীত্বে বিশ্বাসী হলেও শত বৎসর পূর্বে সতী হবার সাধের আইনত মৃত্যু ঘটেছে।

কেবাং, মোরাং, রাশেং

জেন্না! জেন্না! দুটি অপরিচিত শব্দ গভীর রাতে পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলে। মানে বুঝতে না পেরে নেমু সাহেবের মুখের দিকে তাকাই। নেমু সাহেব বলেন, ভয় পাচ্ছেন? কেবাং এর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে।

—ভয়? মোটেই না বরং কৌতূহল বাড়ছে।

—কৌতূহল বাড়লেই আপনাকে মসুপ আর রাশেং এর গল্প শোনাব।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত এগারটা। রাত গভীর না হলে নেমু সাহেব গল্পের মুড পান না। তিরাপের মিয়াও শহরে গভীর রাতে ক্যাপ্টেন ব্যাগলের প্রেমের কাহিনী শুনিয়েছিলেন তিনি। প্রায় দেড়শ' বছর আগের সেই অবৈধ প্রেমের কাহিনীর কথা মানুষ ভুলে গেলেও নোয়াডিহিং-এর স্রোতে তার স্মৃতি এখনও ভেসে চলেছে।

—জেন্না মানে ছুটি। ইংরাজিতে আপনারা যাকে বলেন হলিডে।

—ছুটি তো বুঝলাম। কিন্তু কেবাং?

আদিদের একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমান পঞ্চায়েতের মত। এই কেবাং হ'ল আদিদের সংহত রাখার শক্তি। মেল বন্ধনের রাখী। কেবাং-এ যেমন আদালতের কাজও হয় তেমনি কেবাং-এর সদস্যরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। কেবাং পরিচালন-পর্ষদ গঠিত হয় ভোটের মাধ্যমে। গ্রামের সব বয়স্ক পুরুষই কেবাং-এর সদস্য। মহিলারা কেবাং-এর সদস্য হতে পারে না। তবে তাদের অভাব অভিযোগ তারা নিজেরাই কেবাং-এর সামনে উপস্থাপন করতে পারে। কেবাং-এর রায় সর্বসম্মত—তার কোনও নড়চড় হয় না।

নেমু সাহেব থামেন। অবর হিল্‌সে গভীর রাতের নৈঃশব্দ্য। শুধু উপল ভাঙা শব্দ তুলে সুবনসিড়ি বয়ে চলেছে। সুবনসিড়ির ধারেই আমাদের বাংলো। বহুদিনের পুরানো। অনেকদিন সংস্কার হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর ছাপ এখনও স্পষ্ট।

—সব সিদ্ধান্তই কি এমন করে গভীর রাতে জানানো হয়?

—সব নয়, গভীর রাতের সিদ্ধান্ত গভীর রাতেই জানিয়ে দেওয়া হয়। আজ যেমন

সিদ্ধান্ত হল আগামী কাল ছুটি—হলি ডে। হয়ত অবস্থা বুঝে আগামীকাল সিদ্ধান্ত হবে, সব মেয়েরা জুমে যাবে—মাঠের কাজ করবে। ছেলেরা ঘরে থাকবে।

—মেয়েদের মাঠে পাঠিয়ে, ছেলেরা ঘরে থাকবে, এ কেমন সিদ্ধান্ত?

নেমু সাহেব মৃদু হেসে বলেন, আজ আর এ সব কথা বলব না। আপনাকে যা দেখাতে নিয়ে এসেছি সেই মসুপ আর রাশেং এর কথা বলব। তবে মসুপ বা মোরাং আর রাশেং বুঝতে কেবাং সম্পর্কে দু'চার কথা আপনাকে বলা দরকার।

নেমু সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলাম ওয়াংচু ওয়াংসায়। একদা মস্তক শিকারী ওয়ানচো বা বনফেরিয়া নাগাদের চিরাচরিত নির্বাচিত গ্রামীণ পরিচালন পর্ষদ। ওয়াংচু ওয়াংসায় একদিকে যেমন গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের সামুদায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তেমনি অপর দিকে গ্রামের শৃঙ্খলা রাখার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। সামাজিক অপরাধ থেকে শুরু করে জমি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা এই ওয়াংচু-ওয়াংসা থেকে হয়। নেমু সাহেব বলেন, অবরদের কেবাং সেই একই নীতি অনুসরণ করে। এটা হচ্ছে গ্রামের মানুষদের নির্বাচিত ও পরিচালিত গ্রামীণ সরকার। এই সরকারের আদেশ কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। তেমনি সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কোনওদিন পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনতে পারেনি।

নেমু সাহেব বলেন, বিভিন্ন উপজাতিরা মসুপ ও রাশেংকে যেমন বিভিন্ন নামে অভিহিত করে তেমনি গ্রামীণ সরকারেরও বিভিন্ন নাম আছে। আপনি তো ওয়ান্‌চোদের ওয়াংচু-ওয়াংসা দেখে এসেছেন। এবার অবর বা আদিদের দেখবেন কেবাং। যদি কোনওদিন সুযোগ পাওয়া যায়, মোন্‌পাদের 'টরজেন'-এ নিয়ে যাব। ইচ্ছে করলে আপনি শেরডুকপেনদের জুং দেখে আসতে পারেন। আকারা গ্রামীণ সরকারের নাম দিয়েছে 'মেলে' আর আপাতানিরা তাকেই বলে 'বুলিয়াং'।

নেমু সাহেব একটু থামেন। আধবোজা চোখে ফায়ার প্লেসের দিকে তাকিয়ে থাকেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তো ভীষ্মকনগর গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই, ইদু মিশমীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

—হ্যাঁ। বেশ কয়েকদিন মিশ্‌মী গ্রামে ছিলাম।

নেমু সাহেব বলেন, কেবাংকে ইদুমিশমীরা বলে আবালী। কামানো মিশমীরা বলে ফারাই।

জিজ্ঞাসা করি, আপনারা অর্থাৎ খাম্পতিরা কি বলেন।

—মোকচুপ্!

—মোকচুপ্!

নেমু সাহেব বলেন, নামে কিছু আসে যায় না। যে নামেই ডাকুন না কেন, সকলের উদ্দেশ্য এক।

মনে হয় রাত শেষ হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হবে। সূর্যোদয়ের রাজ্য

সূর্যের সোনালি আলো এই রাজ্যেই প্রথম উদ্ভাসিত হয়।

—এখন বলুন, মসুপ কি আর রাশেংই বা কাকে বলা হয়?

—ঠিক কথা! শব্দ দুটি আপনার কাছে অপরিচিত বলেই আপনার অসুবিধা হচ্ছে। মোরাং শব্দটির সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আদিরা সেই মোরাং-কে বলে মসুপ। অর্থাৎ অবিবাহিত পুরুষদের শয্যাধাম! বলেই হেসে ওঠেন নেমু সাহেব। বলেন, রাশেং হল কুমারী মেয়েদের শয়নাগার।

—শয্যাধাম আর শয়নাগার! চমৎকার শব্দ দুটি তৈরি করেছেন তো!

নেমু সাহেব বলেন, প্রতিটি উপজাতির মধ্যে মোরাং ব্যবস্থা প্রচলিত। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সকলেরই প্রায় এক। অথচ কেউ কাউকে চেনে না। নীলগিরির উপজাতির সঙ্গে কামেং-এর উপজাতির কোনও দিন দেখা হয়নি। সম্ভবত পরস্পরের অস্তিত্ব অজানা। কিন্তু তাঁদের জীবন চর্চায় আমরা এক বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাই।

বাইরে গভীর অন্ধকার। পাহাড়ের অস্তিত্ব অন্ধকারে আবৃত। নিশুতি রাতে সকলেই নিদ্রামগ্ন। জেগে আছি আমরা দু'জন আর সুবনসিড়ি। সুবনসিড়ি কখনো ঘুমোয় না। ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে জন্ম নিয়ে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নিরন্তর বয়ে চলেছে। এক লহমার জন্য থামেনি, ক্ষণিকের জন্যেও বিশ্রাম নেয়নি। সেই সুবনসিড়ির দিকে তাকিয়ে নেমু সাহেব বলেন, কুমারী মেয়েদের জন্য আলাদা শয়নাগারের ব্যবস্থা দক্ষিণের নীলগিরিতে যেমন আছে তেমনি উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যে একই ব্যবস্থা রয়েছে। নামের পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন ফারাক নেই। নাগারা যাকে বলছে মোরাং, অবরদের ভাষায় তাই হল মসুপ। মধ্যপ্রদেশের বস্তারে তাকেই বলা হয় ঘটুল।

—ঘটুলে রাত কাটাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এবার আপনার দৌলতে মসুপ আর রাশেং দেখা যাবে।

নেমু সাহেব বলেন, আমার দুর্ভাগ্য, অরণ্যের অগ্নিশিখা মুড়িয়াদের ঘটুল দেখা হয়নি। শুধু দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে মুড়িয়াদের ঘটুল একটা বিশিষ্ট নাম। তার বৈশিষ্ট্য সর্বদেশে প্রশংসিত। সময় ও সুযোগ পেলে, অবশ্যই ঘটুল দেখে আসব।

—ঘটুলে তো অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে থাকে। অরুণাচলে সে ব্যবস্থা নেই?

নেমু সাহেব বলেন, না এখানে ছেলে মেয়ে আলাদা থাকে।

মসুপে মেয়েরা যেতে পারে না। কিন্তু রাশেং-এ ছেলেদের রাত কাটাতে কোনও বাধা নেই।

—এ আবার কেমন ব্যবস্থা? মেয়েরা মসুপে আসতে পারবে না, অথচ ছেলেদের রাশেং-এ যেতে বাধা নেই। তাহলে তো সব ছেলেই রাশেং-এ যাবে, মসুপ খালি পড়ে থাকবে। তাই না? রাশেং তো তাহলে ঘটুল হয়ে যাবে।

নেমু সাহেব স্বীকার করেন। বলেন, আপনার প্রশ্নের যোগ্য জবাব আমি এই মুহূর্তে দিতে পারছি না।

অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা শয়নাগারের ব্যাপক ব্যবস্থা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সেই নব্য প্রস্তর যুগ থেকেই প্রচলিত আছে। কিছু উপজাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা শিথিল হয়ে এলেও মিজো, নাগা, লালুং, মিকির, গারো এবং লিঙ্গম খাসিদের মধ্যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য সামুদায়িক শয়নাগারের ব্যবস্থা আছে।

নেমু সাহেব বলেন, বিহারের মাল পাহাড়িয়া, ওঁরাও, মুণ্ডা, হো ও বিহরদের মধ্যে সামুদায়িক শয়নাগারের প্রচলন বর্তমান। কোনও প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ করতে পারেননি সত্য, তবে পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি দিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই ব্যবস্থা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই চলে আসছে। নব্য প্রস্তর যুগে প্রাকৃতিক গুহাকে মানুষ বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করেছে। খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারো পাহাড়ে প্রাকৃতিক গুহা নেমু সাহেব দেখেছেন। অরুণাচলের গিরিকন্দরে খুঁজলে এরকম অনেক গুহা পাওয়া যাবে। তাঁর পূর্বজরা গুহার অভ্যন্তরে সামুদায়িক জীবনযাপনই করত। হয়ত সামুদায়িক শয়নাগারের ব্যবস্থা সেই যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। কালক্রমে কিছু পরিমার্জিত রূপে আজকের ব্যবস্থায় এসে ঠেকেছে।

নেমু সাহেব বলেন, মানুষ, মসুপ ও রাশেং-এই তিনেরই বয়স সমান। যখন এই অঞ্চলের নাম ছিল মহাকান্তার, তখনও সামুদায়িক শয্যাধাম ছিল। রামায়ণের যুগে এ অঞ্চলের নাম হল ধর্মারণ্য, তখনও এই শয়নাগার-বিধি কার্যকর ছিল। মহাকান্তার আর ধর্মারণ্যের লিখিত ইতিহাস নেই সত্য, কিন্তু প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ইতিহাসকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিবাসীরাও অবিবাহিত যুবক যুবতীর জন্য আলাদা শয়নাগারের ব্যবস্থা রেখেছিল।

—আপনি বর্তমান মসুপ আর রাশেং-এর কথা বলুন। একবিংশ শতাব্দীর দ্বার-প্রান্তে এসে আপনাদের যুবক-যুবতীরা এই ব্যবস্থাকে কতখানি সম্মান দিচ্ছে?

নেমু সাহেব বলেন, পূর্বপুরুষেরা যতখানি সম্মান দিয়েছে, উত্তর পুরুষেরা ততখানি সম্মান দিয়ে চলেছে। কারণ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা শুধু জৈবিক শিক্ষা পায় না, জীবনের শিক্ষাও নেয়। আমার ইঙ্গিতে দুঃখ পান নেমু সাহেব। বলেন, আপনারা যারা বাইরে থেকে মসুপ বা মোরাং আর রাশেং-এর কথা শুনতে আসেন, তারা ধরেই নেন যে, এসবের মধ্যে যৌনতার বাড়াবাড়ি রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটি আদৌ তা নয়।

রাতের গভীরে পাহাড় নিঃঝুম। সুবনসিড়ি আপন মনে বয়ে চলেছে। বন্য প্রাণীর বিচিত্র আওয়াজে গভীর রাতের স্তব্ধতা চমকে ওঠে। নেমু সাহেব বলেন, অস্বীকার করব না, যুবকযুবতীর যৌন রহস্যের উন্মেষ ধীরে ধীরে এখান থেকেই ঘটে। নারী-পুরুষের জৈবিক চেতনা দৈহিক মিলনে রূপান্তরিত হয়। বন্ধনে অমৃতের স্বাদ পায়।

আদি ও অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষেরা অনেক ভেবে চিন্তে এই ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। কালের বিবর্তনে বার বার পরীক্ষিত এই ব্যবস্থা উপজাতিদের

সামাজিক শৃঙ্খলাকে শক্তিশালী করেছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের অনুরাগ ও দায়িত্ব বাড়িয়েছে। যুবক-যুবতীর নৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। তাই মোরাং আর রাশেং আদি সমাজের গর্বের বস্তু।

মসুপ আর রাশেং থেকে জৈবিক শিক্ষা নেবার ফলে উপজাতি যুবক যুবতীরা বিকৃতিতে ভোগে না। তাই প্রায় নগ্ন দেহী যুবতী নির্ভয়ে পথ চলে, পুরুষের পাশাপাশি একসঙ্গে জুমে কাজ করে। ধর্ষণের ঘটনা উপজাতিদের মধ্যে বিরল। অথচ বলেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থামেন নেমু সাহেব। তাঁর চোখ দেখে বুঝতে পারি, তিনি তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতি একটা ইঙ্গিত করছেন।

বিনা প্রতিবাদে মেনে নিই, ধর্ষণের ঘটনা বর্তমানে আমাদের সমাজে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

নেমু সাহেব বলেন, মোরাং আর রাশেং থেকে যুবক-যুবতীরা সহবত শিক্ষা পায়। হিংসার পরিবর্তে ভালবাসার পাঠ নেয়। মোরাং তাদের রিরংসু হতে শিক্ষা দেয় না। তাই মোরাং আর রাশেং প্রতিটি উপজাতির কাছেই দেবস্থানের মতই পবিত্র।

সুবনসিড়ির তরঙ্গের শব্দে রাতের গভীরতা বুঝতে পারি। বাধাবিহীন একটানা শব্দ। দিনের কোলাহলে এ শব্দ বড় বেশি কানে বাজে না। দিনের মৃতপ্রায় সুবনসিড়ি যৌবনোম্মত্ত হয়ে ওঠে রাতে।

নেমু সাহেব বলেন, যা বলছিলাম, মোরাং আর রাশেং প্রতিটি উপজাতির কাছে দেবস্থানের মতই পবিত্র। বিভিন্ন উপজাতির কাছে মসুপ বা মোরাং বিভিন্ন নামে পরিচিত। অবররা বলে মসুপ, পদমদের কাছেও তাই। কিন্তু মিনংসরা মোরাংকে বলে 'দেড়ে'। মিলাং আর তাদের সমগোত্রীয়েরা বলে মাপটেক। বরিস ও আশিংরা বলে বাংগো। যে যে নামেই ডাকুক, মোরাং ও রাশেং-এর উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন।

আজকাল-নৃতাত্ত্বিকেরা ঘটুল, মোরাং ও রাশেং নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন। কবে এবং কেমন করে এই ব্যবস্থা শুরু হল, তার আদি তথ্য খুঁজতে শুরু করেছেন। ভারতীয় মানব-বিজ্ঞানীরা যা শুরু করেছেন বিংশ শতাব্দীতে, ব্রিটিশ নৃ-তাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী, পর্যটক ও প্রশাসকেরা তাই শুরু করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। হয়ত বা তার কিছু আগে থেকেই। মূলত মসুপ মোরাং আর রাশেং এর কাহিনী আমরা তাঁদের মুখ থেকেই আগে শুনতে পাই। কম বেশি প্রত্যেকেই শুধু আদিদের জীবন-চর্চা কাছ থেকে সমীক্ষা করেন নি, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পারিবারিক জীবন, এমন কি জৈবিক জীবনের খুঁটিনাটিও লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদেরই প্রদর্শিত পথে আজকের নৃতাত্ত্বিকেরা এগিয়ে চলেছেন। একদা নিষিদ্ধ সীমান্ত রাজ্যের অনেক অজানা কাহিনী প্রথমে আমরা তাঁদের কাছ থেকেই জানতে পেরেছি।

নেমু সাহেব বলেন, এর জন্য অনেক ব্রিটিশ পর্যটক ও প্রশাসককে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা যেখানে বসে আছি—এটা হল পদমদের 'রাজ্য'। আদিদের একটি উপশাখার নাম পদম।

অবরদের কথা প্রথম শুনিয়েছিলেন সম্ভবত এক পাদ্‌রি—ফাদার ক্রিক। ১৮৫৪ সালে তিনি এই অবর পাহাড়ে এসেছিলেন। অবরদের মসুপ নিয়ে তিনিই প্রথম মন্তব্য করেছিলেন। মসুপকে একটি সংগঠিত ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। পদমদের রাজত্ব থেকে তিনি যাচ্ছিলেন মিশমীদের রাজ্যে। সেখানে কি হয়েছিল আমরা জানি না। কোথাও সে কাহিনী লেখা নেই। শোনা যায় মিশমীরা ক্রীককে হত্যা করেছিল।

কারও কারও ধারণা, ফাদার ক্রীকের পূর্বেও মসুপ আর রাশেং-এর বিবরণ সংগ্রহের জন্য উইলকক্স আর নিউফণ্ডিনে বন-জঙ্গল-পাহাড় অতিক্রম করে অবর হিল্‌সে পৌঁছেছিলেন। সন তারিখ কারও জানা নেই। এই দুই সাহেবের উদ্দেশ্য কি ছিল, তারও কোনও দলিল প্রমাণাদি নেই। সম্ভবত পর্যটক হিসাবেই তাঁরা দুর্গম অবর পাহাড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর লেখা থেকেই উইলকক্স আর নিউফণ্ডিনের কথা জানা যায়। দু'জনেই মসুপে অবরদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। ডালটন সাহেবও অবরদের অতিথি হয়েছিলেন। তিনি মসুপ আর রাশেং-এর পূর্ণ বিবরণ লিখেছেন।

কেবাং-এর অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। কেবাং-পরিচালকদের সভা পরিচালনা পদ্ধতিকে তিনি 'আধুনিক' বলে মনে করেছেন। কেবাং-এ সকলেরই বলার অধিকার আছে। কোনও কোনও বিষয়ে মতান্তর ঘটলেও মনান্তর তাঁর নজরে আসেনি। পূর্ণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে পরিচালিত হয় কেবাং। গ্রামের মাঝখানে নির্মিত মসুপেই কেবাং-এর অধিবেশন বসে। নেমু সাহেব বলেন, সব উপজাতিদেরই মসুপ বা মোরাং গ্রামের ঠিক মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত। বেশ একটু ফাঁকা জায়গায়। কিন্তু রাশেং থাকে সকলের দৃষ্টির গোচরে। গ্রামের প্রধানের বাড়ির কাছাকাছি। সম্ভবত নিরাপত্তার খাতিরেই তারা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

আয়তনে কিছু বড়, কিন্তু আকৃতিতে মসুপ সাধারণ বাড়ির মত। গ্রামের মানুষের সংখ্যা অনুযায়ী মসুপের আয়তন নির্ধারিত হয়। অন্তত শ'চারেক লোক একসঙ্গে বসতে পারে, প্রতিটি মসুপ বা মোরাং-এ এরকম ব্যবস্থা থাকে। লোক সংখ্যা বেশি হলে মসুপের আয়তন বড় করা হয়। প্রতিটি মসুপ বা মোরাং আদিদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে সজ্জিত।

জঙ্গলে নানা জন্তু জানোয়ারের ডাক পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলে। একটা পাখির অদ্ভুত ডাক শুনে নেমু সাহেব বলেন, পূব আকাশে সূর্য উঠতে এখনও একঘন্টা বাকি।

দেখতে খানিকটা বনমোরগের মত। তার ডাক থেকেই গাঁয়ের মানুষ বুঝতে পারে, ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পূবের আকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঠবে। রাশেং-এ মেয়েরা আড়মোড়া ভাঙবে। পাশে ঘুমন্ত রাত্রির সহচরকে জাগিয়ে দিয়ে নিজেও ঘরে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হবে। সূর্য ওঠার প্রাক্কালে তারা রাশেং ছেড়ে ঘরে ফিরে যায়।

এই পাখির ডাকে মসুপেও সকলের ঘুম ভাঙে। নেমু সাহেব বলেন, আমি তাই পাখিটার ইংরেজি নামকরণ করেছি অ্যালার্ম বার্ড। নামটা আপনার ভাল লাগছে না?

—চমৎকার। ওয়াণ্ডারফুল! পাখিটার স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নাম রেখেছেন। বনের পথে, যদি চেখে পড়ে, পাখিটাকে একবার দেখিয়ে দেবেন।

আবার মসুপ আর রাশেং-এর কথায় ফিরে আসেন নেমু সাহেব। বলেন, বার বছর বয়স হলেই যে কোনও ছেলে মোরাং-এর সদস্য হতে পারে। অবশ্য তাকে বয়োজ্যেষ্ঠদের অধীনে থাকতে হবে। যৌবনে পদার্পণ না করা পর্যন্ত তাদের শিক্ষানবিশী করতে হয়।

নেমু সাহেবের কথায় আমার মুড়িয়াদের ঘটুলের কথা মনে হয়। সেখানেও অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা বড়দের হেপাজতে থাকে। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়। জীবনের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যৌন-জীবনের রহস্যও তারা জেনে যায়।

নেমু সাহেব ঠিকই বলেছেন, উত্তরের উপজাতির সঙ্গে পূবের উপজাতির কোনওদিন দেখা হয়নি। অথচ সমাজ ব্যবস্থায় অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। ঘটুলে শৃঙ্খলা শিক্ষা ও রক্ষার আদেশ কেউ অমান্য করতে পারে না।

ছোটদের শিক্ষা শুরু হয় ফায়ার প্লেসের কাঠ সংগ্রহ করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বেড়ে যায়। সমাজের প্রতি কর্তব্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। প্রাপ্তবয়স্ক হলেই তাকে সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে গণ্য করা হয়। কেবাং বা ওয়াংচু-ওয়াংসা থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মসুপ বা মোরাং-এর ছেলেরা গভীর রাতে দল বেঁধে, গ্রামের মানুষকে তা চিৎকার করে জানিয়ে দেয়। সেরকমই একটা চিৎকার আপনি শুনেছিলেন, জেন্না! মানে ছুটি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে মনের যে সম্পর্ক—কেবাং-এর সঙ্গে মসুপ বা মোরাং-এর সম্পর্ক সেই রকম।

গ্রাম রক্ষা থেকে আরম্ভ করে পূজা পার্বণ ও উৎসবে মসুপ আর রাশেং-এর ছেলে মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেবাং-এ শুধু সিদ্ধান্ত হয়, সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করে মসুপ আর রাশেং-এর সদস্যরা। তাদের জীবনের জিজ্ঞাসার জন্ম হয় সেখানে। সেখান থেকেই তারা জিজ্ঞাসার জবাব পায়। সেই অমৃতের সন্ধানে মসুপ থেকে যুবকেরা চলে যায় রাশেং-এ। আর ভয় মিশ্রিত এক আনন্দের জোয়ারে ঘর থেকে যুবতীরা ভেসে আসে সেখানে।

নেমু সাহেব থামেন। রাতের শেষ প্রহরে তিনি অপাং পান করেন না। বোতলের তলানিটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন! সুবনসিড়ির জলে মিশে অপাং-এর অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়।

নেমু সাহেব বলেন, আমাদের গল্প শেষ হয়ে এসেছে। এবার আমরা শুধু রাশেং-এর কথা বলব। মাঝে মাঝে হয়ত মোরাং-এর সঙ্গে তুলনা এসে যেতে পারে।

নেমু সাহেব বলেন, রাশেংকে আপনি ইংরেজিতে বলতে পারেন, লেডিস ক্লাব। কোনও কোনও নৃতাত্ত্বিক নাম দিয়েছেন ভার্জিন হাউস।—বাংলায় কুমারী-নিলয় বললে কেমন হয়?

—টাকার এপিঠও টাকা, ওপিঠও টাকা। আপনার ভাষায় উপজাতিদের মধ্যে কুমারী-নিলয়ের প্রচলন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই। পৃথিবীর অনেক বিবর্তনের পরেও তাদের অস্তিত্বে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আসেনি।

—ভারতের সব উপজাতির মধ্যেই আলাদা কুমারী শয়নাগার-এর সংস্থান রয়েছে। কিছু রকমভেদ থাকলেও উদ্দেশ্যের মধ্যে বিশেষ কোনও বৈসাদৃশ্য নেই।

নেমু সাহেব বলেন, আপনি নিশ্চয়ই র‍্যাং ব্যাং-এর নাম শুনেছেন? নিশ্চয়ই আপনি সেনালি ডিঙ্গোর কথা জানেন?

অবাক হয়ে অজ্ঞের মত নেমু সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। এ দুটি শব্দই আমার অজানা। আমার অজ্ঞতা নেমু সাহেবের চোখ এড়ায় না। তিনি বলেন, র‍্যাং ব্যাং হল আলমোড়া-গাড়োয়াল এলাকার ভাটিয়াদের কুমারী-নিলয়। উড়িষ্যার বন্দোদের মধ্যে রয়েছে সেনালি ডিঙ্গো। এটাও কুমারী শয়নাগার। কুমারী শয়নাগার থেকেই প্রেমের উন্মেষ ঘটে। এখান থেকেই শুরু হয় মন দেয়া-নেয়ার পালা।

যৌন রহস্যের উন্মোচন হলেও যৌনতার বাড়াবাড়ি এখানে নিষিদ্ধ। রাশেং-এ একজন বয়স্কা পরিচালিকা থাকেন। তাকে সাহায্য করার জন্য থাকে কয়েকজন সহকারী। এই সহকারীগণ লক্ষ্য রাখেন, যৌন-জীবনের নিয়ম কানুন ও বিধি-নিষেধগুলো কেউ যেন না ভাঙে।

একটু চুপ করে থেকে নেমু সাহেব আবার বলেন, মাঝে মাঝে দু'একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটে। কোনও কোনও যুবতী অসাবধানতার ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়।

—সামাজিক প্রথা অনুযায়ী কি সেই ছেলে মেয়ের মধ্যে বিয়ে হয়?

—সেটাই নিয়ম এবং সামাজিক বিধি।

—কোনও ছেলে যদি বিয়ে করতে অস্বীকার করে।

—এরকম ঘটনা বিরল। যদি কেউ করে কেবাং-এ তার বিচার হয়। শাস্তিও সে পায়। এমন কি গ্রাম থেকে তাকে বহিষ্কারও করা হয়।

—সে সন্তান কি অবৈধ?

—আদিরা কোনও সন্তানকে অবৈধ মনে করে না। মেয়েটির উপরও কোনও সামাজিক বিড়ম্বনা নেমে আসে না। যে ছেলে তাকে বিয়ে করবে—সন্তানের পিতৃত্বের অধিকারী হবে সে।

নেমু সাহেব থামেন। অপাং এর প্রভাব কেটে গেছে। চোখ-মুখ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বলেন, আপনাকে আর একটা জিনিস বলা হয়নি।

—কি?

নেমু সাহেব বলেন, উঁচু এলাকায় যে সব অবরেরা থাকে তারা বলে রাশেং। নিম্নভূমিতে যারা বসবাস করে—সেই রাশেংকে তারাই বলে পুনাং। তবে নিয়ম কানুন আর উদ্দেশ্য এক। এই পুনাং-এ প্রতি অগাষ্ট-সেপ্টেম্বরে একটি উৎসব হয়। পাঁচদিন ব্যাপী এই উৎসবের নাম পুনা অর্থাৎ উর্বরা। অবিবাহিত যুবক যুবতীরা এই উৎসবে বড় বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

অরুণাচলের সব উপজাতির মধ্যে আলাদা কুমারী শয়নাগারের ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণে তিরাপে নক্‌টে ও ওয়ান্‌চোদের মধ্যে যেমন রয়েছে আলাদা কুমারী-নিলয়, তেমনি পূর্বে লোহিত জেলার খাম্পতি আর পশ্চিমে শেরডকুপেনদের মধ্যেও রয়েছে একই ব্যবস্থা। মহাকান্তারের যুগ থেকে সেই একই ধারা সমানভাবে চলেছে।

—খাম্পতিদের কুমারী-নিলয়ের কথা কিন্তু শোনা হল না। এবার যখন লোহিত জেলায় যাব, তখন কিন্তু খাম্পতিদের কুমারী-নিলয়ে নিয়ে যাবেন।

অপাং প্রভাবমুক্ত নেমু সাহেবের উজ্জ্বল চোখে-মুখে হঠাৎ বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসে। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। পূব আকাশে সূর্যের সোনালি রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে। রাশেং থেকে ঘরে ফিরে যাচ্ছে মেয়েরা। মসুপও খালি হয়ে যাবে। আবার পাহাড়ে ফিরে আসবে প্রাণের স্পন্দন। নারী-পুরুষ চলে যাবে জুমে। নারী-পুরুষের সুরেলা গান সুবনসিড়ির তরঙ্গের সঙ্গে তাল মেলাবে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হবে—

কা ল্যাং কেই,

এমি কা ল্যাং কেই,

মেতুং মেতে এম ক্যামপোপে,

হো হো হো।

অর্থাৎ আগুন থেকে সাবধান। জ্বলন্ত কাঠ থেকে নিজেকে যত্নে রেখ। শোন, শোন, শোন।

নেমু সাহেব আমার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে ধরেন। বুঝতে পারি, তার অন্তঃস্থলের কোনও এক নরম জায়গায় আঘাত লেগেছে।

—আপনাকে কি আমি দুঃখ দিলাম?

—না। দুঃখ আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। তা না হলে সুজুকি লোহিতের জলে ভেসে গেল কেমন করে? রাশেং-এ আমাদের পরিচয়, রাশেং-এ আমাদের প্রেম কিন্তু রাশেং-এ আমাদের পরিণয় হল না। সুজুকি নেই, আমি আর রাশেং-এ যাই না। রাশেং আমার কাছে এক বেদনা-বিধুর স্মৃতি।

আদি সমাজে বিধবা

বমথে-লা থেকে বমডি-লা। নামের রূপান্তর কবে ঘটেছে সে সন-তারিখ আজ আর কারও মনে নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের পরিবর্তিত উচ্চারণ এখন দেশে বিদেশে প্রচলিত। অরুণাচলের আদি উপজাতিরাও এখন বমডি-লাই বলে, বমথে-লা গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেছে।

সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত বমডি-লা। অরুণাচলের অন্যতম বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। স্বর্গের চেহারা কেমন জানা নেই। তবে পুরাণে বর্ণিত স্বর্গীয় সুষমার সঙ্গে বমডি-লার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

আপেল বাগিচার বাংলোয় বসে নামচুম বলেন, বমথে-লা হচ্ছে মোন্‌পা শব্দ। বমথে মানে, বৃষ্টির দেবতা। লা-মানে, আপনি জানেন।

গিরিপথ। অর্থাৎ বমথে-লার মানে হল, বৃষ্টি-দেবতার গিরিপথ।

বৃষ্টি-দেবতার গিরিপথকে আমরা বেছে নিয়েছি আদি-উপজাতি বিধবাদের জীবন কাব্য শুনব বলে। গ্যালংদের জীবনবেদ, ডাফলাদের জীবনের আলো-আঁধারের কাব্যের পর নামচুম আজ শোনাবেন আদি সমাজের বিধবাদের জীবন চরিত।

নামচুম বলেন, আপনাদের সমাজে বিধবা একটি সমস্যা আর উপজাতি সমাজে তারা সম্পত্তি ও সম্পদ। আপনাদের সমাজে বিধবা বিবাহ আইনসম্মত হলেও সমস্যার পুরো সমাধান এখনও হয় নি। বিশেষ করে সন্তানসহ বিধবাদের সমস্যার তারতম্য ঘটেনি। কখনও সন্তানসহ বিধবার পুনর্বিবাহ ঘটে বটে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাকে স্বামীর দয়া বা অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

বাংলোর অদূরে বৌদ্ধ-বিহারে সায়াহ্নিক বুদ্ধার্চনা শুরু হয়। আপেল বাগিচায় অন্ধকার নেমে আসে। কোনও এক সময় সবুজ পাহাড় কালো অন্ধকারে হারিয়ে যায়। দূরে পাহাড়ের কোলে বিক্ষিপ্ত বস্তিতে জোনাকির মত আলো জ্বলে। মাঝে মাঝে সমস্বরে বুদ্ধ স্তুতি 'ওঁম মণি পদ্মে হুম্' মনের গভীরে এক অনাস্বাদিত স্পন্দন তোলে। বৌদ্ধ স্তুতি পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আপেলের বাগিচায় অনুরণিত হয়। পাহড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি ওঠে মহাকারুণিকের স্তুতি হুম্-হু-ম-ম।

বুদ্ধ ভক্ত নামচুম ধ্যানস্থ হন। দূরে মোন্-পাদের কণ্ঠের সঙ্গে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে বলে ওঠেন 'ওঁম্ মণি পদ্মে হুম্'।

প্রতিটি স্তোত্রের মধ্যে মানুষকে নির্মোহ করে তোলার একটা শক্তি আছে। সেই শক্তি মুহূর্তের জন্য হলেও জাগতিক মালিন্য থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নেয়।

এই শক্তির চেহারার সঙ্গে আমরা কেউ পরিচিত নই। নামচুম এই শক্তির অবয়ব তৈরি করতে পারবেন না। আমার চিন্তায় কোনও ছবি ভেসে উঠবে না। কিন্তু দুজনেরই মন একটা অদৃশ্য আকর্ষণে বাংলোর চার দেওয়ালের বাইরে প্রকৃতির বিরাটত্বের মহিমা খুঁজতে এক অজানা পথে ধেয়ে যায়। ওঁম মণি পদ্মে হুম-এর আহ্বানে নিশি পাওয়া মানুষের মত আমাদের মন সেই ধ্বনি অনুসরণ করে।

রাতের বমডি-লা নির্জন। ঘুমন্ত। শুধু জেগে আছে দূরের অরণ্য। সেখানে নিশাচর শ্বাপদ আহারের সন্ধানে বিচরণশীল। মাঝে মাঝে দলবদ্ধ বন্য প্রাণীর সমস্বরে চিৎকারে অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেঙে যায়। হিমালয়ের হিমেল হাওয়ায়-অরণ্যানী শো শো শব্দে মুখর। পাহাড়কে প্রদক্ষিণ করে যে জলধারা কল্লোলিত ডিরাং-এর সঙ্গে মিশেছে, সেই জলপ্রবাহের সঙ্গীতলহরী শোনা যায়।

ধ্যান থেকে বাক্যে ফিরে আসেন তিনি। কোনও ভনিতা না করেই বলেন, আদি সমাজে পুনর্ভূ প্রথা সেই অনাদি কাল থেকে সমাজসিদ্ধ। আদিদের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সম্পত্তির মত বিধবারও উত্তরাধিকারী আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর সে অসহায় হয়ে পড়ে না। পরিবার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী বা দূর আত্মীয় সেই বিধবার উত্তরাধিকারী। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর, তার অবিবাহিত ছোট ভাই, অগ্রজ জায়ার প্রথম উত্তরাধিকারী। স্বামীর কোনও উপযুক্ত বিবাহিত ভাই নিজের স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে দাদার বিধবাকে ভার্যা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। গর্ভধারিণী ব্যতীত, যে কোনও উপযুক্ত পুত্রও পিতার বিধবাকে বিয়ে করতে পারে। তবে প্রথাটি দু'একটি উপজাতির মধ্যে প্রচলিত থাকলেও, কার্যক্ষেত্রে এই প্রথাকে উৎসাহিত করা হয় না। পরিবার ও জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যে তেমন কোনও উত্তরাধিকারী পাওয়া না গেলে দূর সম্পর্কের আত্মীয়েরা বৈধব্য বিমোচনে এগিয়ে আসে।

নামচুম বলেন, আদিদের সমাজে কোনও মেয়েকে বেশিদিন বৈধব্যের বেদনা সহ্য করতে হয় না। সব উপজাতি ও তাদের উপগোষ্ঠী যেমন, মিনিয়ং, গ্যালং, মিলাং, পানপি, আশিং, বোরি, রামো ও তাঙ্গাসদের মধ্যে পরিবার বা জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যেই বিধবাদের পুনরায় বিবাহ ঘটে থাকে।

নামচুমকে জিজ্ঞাসা করি, এই বিধবাদের বয়সের কোন মাপকাঠি নেই?

—হ্যাঁ বয়সের ব্যাপার অবশ্যই থাকে। সেই সব বিধবাদের পুনর্বিবাহ হয় যারা কর্মঠ এবং প্রজননশীলা।

আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন তোলার আগেই নামচুম বলেন, যারা এই দুটি শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের জন্যে আলাদা বিধি ও বিহিত আছে। নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে আদি সমাজ এড়িয়ে যায় না।

আপেল বাগিচার চারপাশে অন্ধকার ঘন হয়। গাছের পাতায় পাতায় শিশির পড়ার শব্দ। নামচুম বলেন, স্বামীর জীবদ্দশায় কোনও বধূ যদি অন্য কারও সঙ্গে যৌন সংসর্গে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে সে সমাজের চোখে 'অসতী'। কেবাং-এ তার বিচার হয়। স্বামীকে উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দিয়ে বিচ্ছেদও সে নিতে পারে। কিন্তু সারাজীবন তাকে অসতীর চিহ্ন বয়ে বেড়াতে হয়। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে সে আর অংশগ্রহণ করতে পারে না।

—অর্থাৎ তাকে 'একঘরে' করা হয়।

—যদিও এ সব ঘটনা আদিদের সমাজে খুবই বিরল। অসতীদের জীবনযাপন আমার কাছে অপরিচিত। দু'একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে। আমি তাদের খবর রাখি না।

—আমরা যাকে এয়োতির চিহ্ন বলি আদিদের সমাজে তেমন কিছু আছে?

নামচুম হেসে বলেন, ঠিক আপনাদের মত শাঁখা-সিঁদুর নেই। বিবাহিতা নারীর অবশ্যই একটা চিহ্ন আছে। ওয়ান্‌চোদের তো দেখেছেন বিবাহিতারা স্তনে উল্কি এঁকে রাখে। আপনি বুঝতে পারবেন না, বিবাহিতা ডাফলা রমণীদের পুঁতির মালায় আপনাদের ভাষায় এয়োতির চিহ্ন থাকে।

মৃত স্বামীর অবিবাহিত ভাই বিধবার প্রথম দাবিদার হলেও প্রথানুযায়ী অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করা হয়। আর এই সব বিচার বিবেচনা করে কেবাং বা আদিদের পঞ্চায়েত।

নামচুম বলেন, বিচার্য বিষয়গুলি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এর মধ্যেই আপনি আপনার অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন। আদিদের বিধবার জীবন কাব্যের অনেক কৌতূহল মিটবে।

উৎসুক দৃষ্টি মেলে নামচুমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

নামচুম বলেন, বিধবার উত্তরাধিকারীর বয়স, বিবাহিত অবস্থা, চরিত্র, শারীরিক ক্ষমতা ও মানসিক অবস্থার চুলচেরা বিচার অপরিহার্য।

মৃতের বিধবাকে তার বিবাহিত ভাই শর্তসাপেক্ষ বিয়ে করতে পারে। সে শর্ত হল— বিধবা যদি রাজি থাকে এবং সেই ব্যক্তির স্ত্রী যদি অমত না করে। বিধবার 'ইচ্ছা'কে অসম্মান জানানোর অধিকার কেবাং-এর নেই। বিধবা মৃত স্বামীর ঠিক পরবর্তী ভাইকেই যে বিয়ে করতে হবে—এমন কোনও ধরাবাধা নিয়ম নেই।

যদি কোনও পুরুষ মৃত্যুর পূর্বে ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, মৃত্যুর পর তার তৃতীয় বা চতুর্থ ভাই বিধবার উত্তরাধিকারী হবে—আদিরা সেই ইচ্ছার অপমান করে না।

জিজ্ঞাসা করি, যদি কোনও পুরুষ মৃত্যুর পূর্বে ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, তার স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হবে গোষ্ঠী বহির্ভূত অন্য কেউ!

নামচুম বলেন, সেই পুরুষকেও তার ইচ্ছাটিকে পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। পরিবার বা গোষ্ঠীর বাইরে তার ইচ্ছার গতিবিধি নিষিদ্ধ।

তবুও জিজ্ঞাসা করি, যদি কেউ করে, তাহলে কি হবে?

নামচুম হেসে বলেন, এসব বিষয়ে, আদিদের সমাজে 'যদি'র কোনও স্থান নেই। এ ধরনের ঘটনা আমি কোনও দিন শুনিনি।

পরিবারে উপযুক্ত কেউ না থাকলে-গোষ্ঠীর অন্য কেউ বিধবাকে বিয়ে করতে পারে। সেখানেও বিধবার কতগুলি শর্তকে সম্মান দেওয়া হয়। নামচুম বলেন, কোনও কিছু লেখার আগে শর্তগুলি মনে রাখবেন।

পরিবারের বাইরে গোষ্ঠীর অন্য কাউকে বিয়ে করতে চাইলে, কেবাং প্রথমে বিধবার আপত্তির কথা জানতে চাইবে। কেবাং খোঁজ নেবে—সে ক্রীত স্ত্রী কিনা। তার নৈতিক চরিত্র, শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ এবং বিধবাটি প্রজননশীলা কিনা।

এতগুলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর, সেই বিধবা গোষ্ঠী বহির্ভূত কাউকে বিয়ে করতে পারে।

শর্তের বাইরেও আদি সমাজে বিধবাদের কিছু স্বাধীনতা থাকে। তবে শর্ত পালনই হচ্ছে প্রথম কথা। সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু ব্যতিক্রম থাকে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকা অস্বাভাবিক নয়। দু'একজন শর্ত অবজ্ঞা করে পরিবার বহির্ভূত মনের মানুষের পিছনে ছোটে।

এই মুহূর্তে প্রশ্ন করার একটা সুযোগ এসে যায়। নামচুমকে জিজ্ঞাসা করি, এই ক্ষেত্রে কেবাং-এর ভূমিকা কি? সমাজই বা কি ব্যবস্থা নিয়ে থাকে?

নামচুম বলেন, আপনি প্রশ্ন না করলেও এসব কথা আমি নিজে থেকেই বলতাম।

পরিবার পরিত্যাগ করার শাস্তি কেবাং-এর বিধানে আছে। বিদ্রোহিনী বিধবাকে সেই শাস্তি দেওয়া হয়।

জিজ্ঞাসা করি, শাস্তিটা কি মানসিক না দৈহিক?

নামচুম বলেন, দুটোর একটাও নয়। দৈহিক শাস্তির কোনও প্রশ্ন আদিদের সমাজে নেই। 'নারী নির্যাতন' আদি সমাজের নীতিবিরুদ্ধ। কেবাং-এর আদেশে সেই বিধবাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। কারণ আদিরা নারীকে সম্পদ ও সম্পত্তি মনে করে। সম্পত্তি হাতছাড়া হলে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন অবশ্যই আসে। ক্ষতিপূরণ প্রদানে অপারগ বিধবাকে সন্তান-সন্ততির স্বত্ব ত্যাগ করে স্বামীর পরিবারে রেখে যেতে হয়। এটা এক ধরনের মানসিক শাস্তি। নিজের সন্তানের উপর মায়ের কোনও দাবি থাকবে না—এরকম

বেদনাদায়ক শাস্তিও কদাচিৎ কখনও কেবাংকে দিতে হয়। অবশ্য এ ঘটনা খুবই বিরল।

পরিবার থেকে পালিয়ে গেলে আর এক ধরনের চরম শাস্তি সেই বিধবার জন্য অপেক্ষা করে। কেবাং থেকে তাকে 'অসতী' বলে চিহ্নিত করা হয়। কোনও নারীর পক্ষে 'অসতী' চিহ্ন ধারণ করে সারা জীবন বেঁচে থাকা বড় কঠিন। অসতীর দুর্বিষহ জীবন সে বেশিদিন সহ্য করতে পারে না। কোনও না কোনও কারণে তার আয়ু সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। অনেক সময় অনিচ্ছাকে হজম করে পরিবারের কাউকে বিয়ে করতে হয়। পুনর্ভূ-ভার্যার আসন অলংকৃত করা ছাড়া তার কাছে বিকল্প আর কোনও পথ খোলা থাকে না।

কুয়াসার ঘন আস্তরনে বমডি-লা কখন যে ঢেকে গেছে আমরা জানি না। কয়েক গজ দূরে আপেল গাছ অদৃশ্য। পাহাড়ের অস্তিত্বও কুয়াসার অন্তরালে হারিয়ে যায়।

বমডি-লা ঘুমে অচেতন। বাংলোয় জেগে আমরা দু'জন। নামচুম বিশ্বাস করেন, তার জীবনে আগামীকাল আর নাও আসতে প.ৃরে। যতদূর সম্ভব কাজ শেষ করে রাখ-এই নীতিকে সামনে রেখে, নামচুমের জীবনতরী ভেসে চলে।

—পরিবারের মধ্যেই বিধবাকে পুনরায় ভার্যার মর্যাদা দেওয়া হয় কেন?

নামচুম বলেন, পরিবারের মধ্যে থাকলে, শুধু প্রথম স্বামী ছাড়া তার কিছু হারাবার থাকে না। দাদার বিধবা যদি ছোট ভাইয়ের বধূ হয়, পূর্ণ বধূর মর্যাদাই তাকে দেওয়া হয়। আদর যত্ন ও ব্যবহারের কোনও তারতম্য ঘটে না। তার মৃত স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সেই হবে। পূর্বের বিবাহিত জীবনের সন্তান-সন্ততি নিয়েও কোনও সমস্যা দেখা দেবে না। প্রথানুযায়ী সব সন্তান বর্তমান স্বামীর সন্তান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে। উপরন্তু, মৃত ও বর্তমান স্বামীর সম্পত্তি ভোগের অধিকার তার থাকবে।

আমাদের সমাজে এ ব্যবস্থা নেই। এই ব্যবস্থার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সন্তান সহ বিধবার বিবাহের ঘটনা আমাদের সমাজেও ঘটে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে মেনে নিলেও তার পূর্ব বিবাহজাত সন্তানকে মেনে নিতে পারে না। অনেক সময় আবার সেই সন্তান নূতন পিতাকে মেনে নেয় না। ফলে, পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

নামচুম বলেন, এ সব বিষয়ে আপনাদের সমাজ যতখানি স্পর্শকাতর, আমাদের সমাজ ঠিক ততখানি সহনশীল।

আদি রমণীরা সত্যিই সহনশীলা। তারা সর্বংসহা। পাঁচ সতীন নিয়ে নিশিরা হাসিমুখে ঘর করতে পারে, তেমনি গ্যালং রমণীরা পঞ্চ স্বামীর মন রক্ষা করেও চলতে পারে।

জিজ্ঞাসা করি, গর্ভাবস্থায় কোনও মহিলা যদি বিধবা হয়, সে ক্ষেত্রে কেবাং এর ভূমিকা কি? নামচুম বলেন, অনেকক্ষণ পরে, একটি ভাল প্রশ্ন করেছেন। মৃতদেহ সৎকারের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি জড়িত। গর্ভাবস্থায় কোনও রমণী বিধবা হলে, তাকে কিছুটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয় স্বজনেরা দেহ সৎকার করার অধিকারী। এ ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলাটি যদি পুত্র সন্তান প্রসব করে,

তাহলে মৃত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সেই হবে। কিন্তু মহিলাটি যদি মৃত সন্তান বা কন্যা সন্তান প্রসব করে, তাহলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যে সব নিকট আত্মীয়েরা সৎকারে অংশ গ্রহণ করেছিল—সম্পত্তির অধিকার তাদের উপর বর্তাবে। আদিদের সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী বিধবার পুনর্বার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পরিবারকেই পালন করতে হয়।

যদি কোনও আদি রমণীর পুত্র সন্তান না থাকে, তাহলে, মৃত্যুর পর সেই রমণীর স্বামীর দেহ সৎকার করার অধিকার তার ছোট ভাইয়ের। সম্পত্তির মালিকানা অবশ্য সকল ভাইয়ের মধ্যে বন্টিত হবে।

প্রশ্ন করি, তাহলে বিধবার কি হবে?

নামচুম বলেন, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পরিবাব নেবে এবং সে যদি পরিবারের কাউকে বিয়ে করে, তাহলে মৃত স্বামীর সম্পত্তির উপর অধিকার তার থাকবে।

—মূলত সম্পত্তির জন্যই পরিবারের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত, তাই না?

নামচুম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, কিছুটা তাই। তবে সবটা নয়।

নামচুমের কাছে জানতে চাই, যদি কোন সক্ষম বিধবা বিবাহযোগ্য দেবরকে বিয়ে না ক'রে, গোষ্ঠীর অন্য কাউকে বিয়ে করে, সেখানে সমাজের ভূমিকা কি?

নামচুম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, সেই বিধবাকে নানা রকম কষ্ট ভোগ করতে হয়। সেই কষ্টের তালিকাও আপনার সামনে তুলে ধরছি।

আদি সমাজের কোন বিধবা যদি পরিবার বহির্ভূত এবং গোষ্ঠীর দূরতম কোনও আত্মীয়কে পুনর্বার বিবাহ করে, তাকে মৃত স্বামীর গৃহ ত্যাগ করতে হয় এবং তার সম্পত্তির উপর বিধবার কোনও অধিকার থাকে না। 'লিসিক পুরে' একটি শব্দ আদিদের মধ্যে প্রচলিত। শব্দটির মানে হল জরিমানা। প্রথানুযায়ী জরিমানার তারতম্য ঘটে। কোন বিধবা নিজ বিবাহযোগ্য দেবরের ঘরনী না হয়ে গোষ্ঠীর নিকট আত্মীয়কে বিয়ে করে, সেক্ষেত্রে জরিমানা নিয়ে খুব বেশি চাপ দেওয়া হয় না। কিন্তু গোষ্ঠী বহির্ভূত অন্য কাউকে বিয়ে করলে, নূতন স্বামীকে 'লিসিক পুরে' দিতেই হয়। এই জন্য তিনটি মিথুন জরিমানা হিসাবে ধার্য্য হয়। তবে এ জরিমানা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। বিধবার মৃত স্বামীর যদি কোনও উত্তরাধিকার না থাকে এবং বিধবাটি যদি নিজের সন্তানদের গোষ্ঠীর হেপাজতে রেখে নূতন স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে যায়, সে ক্ষেত্রে 'ন্যামদুম' বা বিধবার মূল্য থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

অর্থাৎ, আপন সন্তানের বিনিময়ে, বিধবাটি দেহসুখের তাগিদে নূতন স্বামীর সঙ্গে ঘর বাঁধে, তাই না?

নামচুম একটু থমকে যান। ঘোলাটে কাঁচের মধ্য দিয়ে বাইরে কুয়াসার দিকে তাকিয়ে থাকেন। একটু পরে বলেন, আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমি ঠিকমত দিতে পারবনা। সব

সমাজেই 'সেক্সের' ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'সেক্সের' ছোবল থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন।

পরিবার বা গোষ্ঠীর কাউকে বিয়ে না করে জন্মসূত্রে আত্মীয়ের কাছে যাবার অধিকার আদি সমাজের বিধবাদের আছে। সে তার মামা বা অন্য কোনও আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় নিতে পারে, কিন্তু বাবা বা ভাইয়ের বাড়ি কখনই নয়। আদিরা মনে করে, মেয়ে বিধবা হয়ে পিত্রালয়ে বা ভ্রাতৃগৃহে ফিরে এলে তাদের পরিবারে অমঙ্গল ঘটবেই। তবুও যদি কাউকে পিত্রালয়ে যেতে হয়, তাহলে, বিধবার মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারের কাছ থেকে সাতক বা মিয়ুম-সুয়ুম দাবি করে। বিশেষ করে পাসি ও মিনিয়ং সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত।

নামচুম বলে, আপনাদের সমাজে ঠিক এর উল্টোটা ঘটে। বিধবার শ্বশুরালয়ে স্থান না হলে, সে আশ্রয়ের জন্য পিত্রালয়েই ফিরে যায়। মাতুলালয়ে স্থান পায় এমন ঘটনা খুবই বিরল।

বিয়ে না করে আত্মীয়ের ঘরে ফিরে গেলে বিধবা তার বিয়ের সময় প্রাপ্ত যৌতুক সঙ্গে নিয়ে যায়। সে সম্পত্তি থেকে তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। কিন্তু মৃত স্বামীর পৈতৃক সম্পদ ও সম্পত্তির উপর সে দাবি করতে পারে না এবং মৃত স্বামীর সম্পত্তির উপরও কোনও অধিকার থাকে না। কিন্তু বিয়ে না করেও এ সবই পেতে পারে, যদি সে তার মৃত স্বামীর পরিবারের একজন হয়ে থাকে।

আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকলেও আদি সমাজের নিয়ম অনুসারে, তার মৃত স্বামীর নিকটতম আত্মীয় তার দেখভাল ও মৃত্যুর পর সৎকারের ব্যবস্থা করতে বাধ্য। অনেক সময় মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তির কিছু অংশ বা নগদ কিছু টাকা বিধবার মদুম বা সৎকারের জন্য আলাদা করে রেখে দেয়। এটাও আদিদের প্রচলিত নিয়মের মধ্যেই পড়ে।

স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে যদি কোনও আদি রমণী পরপুরুষে উপগতা হয় এবং স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সেই পুরুষকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সেক্ষেত্রে দেবর বা অন্য কেউ কেবাং-এর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করতে পারে এবং ন্যামদুম (বিধবার মূল্য) দাবি করতে পারে। এই অপরাধের জন্য ন্যামদুমের মূল্য দ্বিগুণ হয়ে যায়। অর্থাৎ কমপক্ষে দুটি মিথুনের মূল্য তাকে দিতে হয়।

স্বামীর মৃত্যুর অনেকদিন পর যদি কোনও বিধবা পরিবার বহির্ভূত দ্বিতীয়বার কাউকে বিয়ে করে, সে ক্ষেত্রেও সে অপরাধী এবং নূতন স্বামীকে হাজার টাকা পর্যন্ত ন্যামদুম দিতে হয়।

—বিধবাদের তাহলে কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নেই। আইন ও প্রথার বেড়াজালে তাদের ঘিরে রাখা হয়েছে।

নামচুম বলেন, আপনার প্রশ্নের জবাব পরে দিচ্ছি। তার আগে আরও কিছু জানা দরকার।

যদি কোনও বিধবা গোষ্ঠী ও পরিবার বহির্ভূত অনাত্মীয়কে নিজের সন্তানের সামনে বিবাহ করে তাহলে মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীরা তিনগুণ ন্যামদুম এবং লিস্ক-আজেং আদায় করে নিতে পারে। যে পুরুষে সে উপগতা তার কাছ থেকেও মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীরা হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।

—দেখা যাচ্ছে, যেমন করেই হোক, বিধবাটিকে পরিবারের মধ্যেই বন্দী করে রাখতে হবে, তাই না? নামচুম বলেন, দয়া করে আর কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরুন। আদি সমাজের বিধবাদের আলো-আধাঁরের কাহিনী আমি শেষ করছি।

কোনও কিছুই বিধবাকে হারাতে হয় না। কোনও ক্ষতিপূরণ মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীরা দাবি অথবা আদায় করতে পারে না, যদি তারা তাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে রাখে এবং তার প্রতি মানবিক ব্যবহার করে। আর যদি গোষ্ঠীবহির্ভূত বিধবার সেই মনের মানুষ বিধবার বাড়ি চলে আসে এবং পূর্ব বিবাহজাত সন্তানদের আপন সন্তান বলে মেনে নেয়, তাহলে ন্যামদুম বা লিস্ক আজেং-এর প্রশ্ন কখনই উঠবে না।

আবার আমাকে প্রশ্ন করতে হয়। নামচুম বিরক্ত হবে জেনেও জিজ্ঞাসা করি, যদি কোনও বিধবা দ্বিতীয়বার বিবাহ না করে এবং মৃত স্বামীর পরিবারেই সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়, তাহলে, সমাজ তাকে কি চোখে দেখবে?

নামচুম বলেন, আপনার এই প্রশ্নের জবাব দিয়েই, আমি আদিদের বিধবার কাহিনী শেষ করব। অবশ্য তার আগে আর একটি বিষয় আপনার জানা দরকার।

শোনার আগ্রহ নিয়ে নামচুমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। নামচুম বলেন, প্রতিবন্ধী ও শারিরীক অক্ষম বিধবাদের প্রতি সমাজের চিন্তা-ভাবনা আপনার জানা উচিত।

দৈহিক অক্ষমতা অনেকেরই থাকতে পারে। বিয়ের পরেও কোনও রমণী প্রতিবন্ধী হতে পারে। এখানে আদিদের সমাজ ও কেবাং-এর আচরণ অত্যন্ত মানবিক। অন্ধ, খোঁড়া বা রোগে পঙ্গু এমন বিধবাদের সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে থাকে মৃত স্বামীর আপনজনেরা। সেই প্রতিবন্ধী বিধবার যদি কোনও পুত্র সন্তান না থকে, তাহলে তার মৃত্যুর পর আপনজনেরাই তার সৎকার করে।

প্রতিবন্ধী বিধবার ভরণ-পোষণ ও চিকিৎসার জন্য তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির আয়ের একটা অংশ নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। এবং মৃত স্বামীর অন্যান্য পরিজনের তত্ত্বাবধানে তাকে রাখা হয়।

শারিরীক ভাবে অক্ষম কোনও বিধবা তার স্বামীর মৃত্যুর পর যদি জন্মসূত্রের আত্মীয়ের কাছে ফিরে যেতে চায়, সেখানে পরিবারের সদস্যরা বাধা দেয় না। তার চিকিৎসা ও মৃত্যুর পর সৎকারেরর জন্য 'মাদুম' নগদ হাজার টাকা ও মৃত স্বামীর স্থাবর সম্পত্তি কিছু অংশ দেওয়া হয়।

অনেকক্ষণ পর নামচুম একটা মানবিক কথা শোনালেন। নামচুম বলেন, আপনি জানতে চেয়েছেন কোনও বিধবা যদি পরিবার বা গোষ্ঠীর কাউকে দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে স্বামীর সংসারেই থাকতে চায়—তাহলে সমাজ বা কেবাং তাকে কী চোখে দেখে?

এক কথায় সমাজ তাকে 'মহিয়সী' বলে আখ্যা দেয়।

—'মহিয়সী'!

নামচুম বলেন, হ্যাঁ। তাকে যথার্থ 'সতী' হিসাবে মানা হয়। মৃত স্বামীর পরিবার ও গোষ্ঠীর আপনজনেদের কাছে সে আমৃত্যু শ্রদ্ধেয়া হয়ে থাকে। তার ভাল-মন্দ, সুখ-সুবিধা, সব কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করে মৃত স্বামীর পরিবারের পরিজনেরা। আর সমাজ তাকে বিশেষ মর্য্যাদার অধিকারিনী হিসাবে গণ্য করে।

—শুধু এইটুকু?

নামচুম বলেন, আমি এখনও শেষ করিনি।

যে সব বিধবা মহিয়সীর মর্য্যাদা পায়, সমাজ তাকে কঠিন কাজ থেকে রেহাই দেয়। তাকে পশু পালন, সেতু নির্মাণ, জুমের চাষ, বা অন্যান্য কঠিন সামাজিক কাজ তাকে করতে হয় না। সে যদি নিজের ইচ্ছায় এই সব কাজে অংশ নেয়, সমাজের চোখে তার শ্রদ্ধার মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

একটু থামেন নামচুম। বমডি-লা-পাহাড়ে সূর্যের প্রথম আলোর রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে। আপেলের বাগিচা থেকে কুয়াসা সরে যায়। নাম-না জানা পাখি আপন মনে ডেকে চলে।

নামচুম বলেন, মৃত স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করার জন্য সমাজ সেই সতীকে বিশেষ অধিকার দেয়। আপনি জানেন আমার মা সেই অধিকার ভোগ করছেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতিদের করকমলে